শিবরাম চক্রবর্তী

শিব্রাম অমনিবাস

৬

বড়দের রচনাসংগ্রহ—৩



নবপত্র প্রকাশন □ কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট।
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

কম্পোজ : রঘুনাথ প্রেস
৮৩বি বিবেকানন্দ
রোড।
কলিকাতা- ৭০০
০০৬

মুদ্রক : লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯-এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : নন্দন সরকার



SIVRAM OMNIBUS
Volume-6

সূচিপত্র

উপন্যাস

ভালবাসার অ আ ক খ ৩

গল্পসংগ্রহ

ভালবাসার অনেক নাম ৫৩
একটি মেয়ের জন্য ৫৭
কণ্ঠলগ্ন ৬২
জীবন-জিজ্ঞাসা ৬৮
প্রায়োপবেশন ৭৬
চোখের ওপর ভোজবাজি ৮১
ইঁদুর ধরা কল ৮৭
ব্রজবিহারীর ধনুর্ভঙ্গ ৯২
গৃহিণী গৃহং মুছ্যতে ৯৭
একটি শ্লীলতাহানির কাহিনী ১০১
বন্ধুর মতন নেই আর! ১০৫
ঢং থাকলেই দমকল হয় না ১১১
যবনিকা পতন ১১৫
শূন্যমার্গ ১২১
পৃথিবী গোল ১২৭
খট্টাঙ্গপুরাণ ১৩২
নামডাকের বহর ১৩৬
বড়োদিনের বাড়ন্ত দিন ১৪২

গল্পসংগ্রহ

মেয়েরা হারাবেই ১৪৯
মরণবাঁচন প্রশ্ন ১৫৬
রাণীযোটক ১৬৪
সড়শীর টান ১৭১
বিকল্প নায়ক ১৭৭
বহুরূপী ১৮২
গোলাপী প্রলাপ ১৮৮
উল্টো উৎপত্তি ১৯৪
নূতন মুদ্রণ ১৯৮
শিক্ষার ষাঁড়ভাগ ২০৩
কার্যকারণ ২০৮
সুন্দর মুখের joy ২১৪
পর্বতপ্রমাণ প্রেম ২২০



ভালবাসার অ আ ক খ

এক

পা টিপে টিপে আমরা এগুই।

সিনেমা হাউসের আড়াল-করা আলোর—ন্যমমাত্র আলোর আওতা ছাড়াতেই—একেবারে ঘুট্‌ঘুট্টির মধ্যে এসে পড়লাম। শুনলাম, মিনিটখানেক আগেই নাকি এধারের লাইন ফিউজ হয়ে রাস্তার সব বিদ্যুৎ-বাতি নিবে গেছে। একেবারে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। একটুখানি ফিকে জ্যোৎস্নার আবছায়া থাকলে ভালো হতো,—এক কাস্তে চাঁদের আলো—চাঁদনির ফসল—পৃথিবীর পক্ষে নেহাত কম নয় (দুজনের পক্ষে তো খুবই বেশি!) কিন্তু এই আকস্মিক অমাবস্যায় একেবারেই মেরে দিয়েছে।

তবে এই অন্ধকারই ভালো! এমন ঘুট্‌ঘুট্টিই বা মন্দ কী? পা টিপে টিপে পাশাপাশি চলতে ভালোই লাগে। তবে পাশে নিতান্তই নিজের—কী বলে গিয়ে—ইয়ে, এই যা।

একটা খাসা ছবি—দুজনে মিলে উপভোগ করবার এই বেহালা পর্যন্ত আমাদের ঠেলে আসা! ছবিটার টানেই বিশেষ করে। নামজাদা ছবি, কিন্তু কলকাতার বড় বড় সিনেমায় যখন দেখানো হচ্ছিল, তখন ছোটখাটো নানা কাজে জড়িয়ে থেকে দেখা হয়ে ওঠেনি, তারপর আজ হঠাৎ কলকাতার উপকণ্ঠে এর পুনঃপ্রদর্শনীর ঘোষণা দেখে ভাবলুম এ-সুযোগ আর ফস্‌কানো না!

সুযোগই বলতে হয়! কলকাতায় বাস করে চাঁদের সঙ্গে আমাদের আড়ি। পূর্ণিমা আমাদের চোখে পড়ে না, অমাবস্যাও। চাঁদের বদলে আমরা পেয়েছি বিদ্যুতের চাঁদনি—সস্তার বাজার! হঠাৎ এই রাস্তা-জোড়া বৈদ্যুতিক বিকলতার দৌলতে, অমা-রজনীর রূপটা দেখতে পাওয়া গেল।

এইমাত্র সিনেমা ভেঙেছে, আর—আমরাও ভেঙে পড়েছি! যে অমা-রজনীর অপরূপ উপভোগ্যতা নিয়ে একটু আগেই উদ্বেল হয়ে উঠেছিলাম, এখন তার গর্ভে প্রবেশ করে তার চেহারা দেখেই চম্‌কে উঠতে হলো।

এই সূচীভেদ্য যবনিকা ভেদ করে আজ বাড়ি পৌঁছতে পারব তো? কল্পনাকে বল্লাম: 'আমার হাত ধরো, নইলে হারিয়ে যাবে।'

কল্পনার হাত আমার বাহুর আশ্রয় নেয়, এবং বলতে কি, নিজের ইয়ে হলেও আমার বেশ ইয়েই লাগে। আমি কল্পনাকে, মানে, কল্পনার সেই ভগ্নাংশকে বগলদাবা করে সন্তর্পণে পা বাড়াই। ফুটপাথটা কোন ধারে, ঠিক যে কোন্‌খানে, পা দিয়ে হাতড়াতে থাকি।

'উঃ, কী অন্ধকার!' কল্পনা দম নিয়ে বলে: 'বিচ্ছিরি!'

সিনেমার গহ্বর থেকে বার হবার তোড়ে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছল—ক্ষণেকের জন্যেই। কিন্তু সেই মুহূর্তের মধ্যেই চারিধারের এই আঁধার আরো ঘোরালো আরো ঘনীভূত

হয়ে উঠেছিল বুঝি। অনুভূতিটা, নানান দৃষ্টিকোণ থেকে, নানা ভাবে রোমন্থন করার আগেই কল্পনা আমার বগলে ফিরে এসেছে। ভালো করে হারাবার আগেই আবার আমরা পরস্পরের করতলগত ও কুক্ষিগত হয়ে পড়েছি।

এবং সেজন্যে তেমন দুঃখিত কি? অমাবস্যার অবশ্যম্ভাবী সুযোগে মাধুর্য-কণ্টকিত সম্ভাবনাটা নিতান্তই মাঠে মারা গেল হয়তো? পেয়ে হারাবার এবং হারিয়ে পাবার এই ফাঁকতালে, কল্পনার বদলে, আর একটি মেয়ে, (কল্পনার মতই সুন্দর আর মিষ্টি, কল্পনা করা যাক্ না!) অপর একটি মেয়ে হস্তগত হয়ে এলে নেহাত মন্দ ছিল না বোধ হয়।

যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলি। না, ঠিক ও-কথাটা বলি না। বলিঃ 'কতক্ষণ আর! এও সয়ে যাবে—সয়ে আসবে অচিরেই—কতক্ষণের দুর্যোগ।'

কিন্তু ওর মধ্যেও অনুশোচনার সুর বেজে ওঠে—ঘোরালো একটা প্যাঁচ যেন থেকে যায়। 'মানে, অন্ধকারটা আস্তে আস্তে আমাদের চোখে সয়ে যাবে! সেই কথাই বলছি।' অন্ধকারকে পরিষ্কার করে দিতে হয়।

এবং অন্ধকারের অরণ্য ভেদ করে আমরা দুজনে দুঃসাহসের দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়ি।

'ওমা—।' অকস্মাৎ আমি চেঁচিয়ে উঠি: 'চারধারেই জল যে। এবার যে গঙ্গা পেরুতে হয়।'

'য়্যাঁ? কী বলছ? গঙ্গায় এসে পড়লাম নাকি?' কল্পনাও আঁৎকে ওঠে।

'প্রায় তাই।' জলমগ্ন পা-টাকে ফুটপাথের উপকূলে টেনে তুলি: 'কলকলধ্বনি শুনছ না-? এখন সাঁতরে পেরুতে হবে।'

ইতস্ততঃ-প্রজ্জ্বলিত জোনাকি পোকার আলোয় যতদূর দৃষ্টি চলে, চারিধার জলে জলময়। এই অন্ধকারের অজুহাতে কোন্ এক রসিক রাস্তার ঘোলাটে জলের উৎস-মুখটা মজা করে খুলে রেখে গেছেন, (সারা কলকাতাকেই তাঁর জলাঞ্জলি দেবার মৎলবে কিনা কে জানে!) তাইতেই এই কলোচ্ছ্বাসিত জলোৎসব!

'তাহলে কী হবে?' কল্পনা আর পা বাড়ায় না।

'কী আবার হবে! যুগে যুগে কারা গন্ধমাদন বহন করেছে? আমরাই। চলে এসো।'

'উঁহু।' সাদর অভ্যর্থনার বিজ্ঞাপনেও ও অবিচলিত।

'তবে সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকা যাক! সেই ভালো।'

'এই দ্বীপে?'

'দ্বীপে!'

'বাঃ, দ্বীপ কাকে বলে তাও জানো না?'

'জানি বইকি। দ্বীপ হচ্ছে, ফুটপাথের অংশবিশেষ, এমন একটি স্থলভাগ যার চারিধারে জলবেষ্টিত হয়েও—'

'হয়তো এটা ব-দ্বীপও হতে পারে।' কল্পনা ক্রমেই নিজেকে ফাঁপিয়ে তোলে।

'তাও হতে পারে। আবার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে রাতারাতি যেসব দ্বীপ গজিয়ে ওঠে তার একটা হওয়াও বিচিত্র না! খুব অসম্ভব নয়।' আমিও কল্পনার রাশ ছেড়ে দিই। রাশ ছেড়ে দেয়া খুব শক্ত ছিল না। এই সুপরিচিত শহরতলীও অন্ধকারের

অপরিচয়-সূত্রে এমন অবাস্তব আর রহস্যময় হয়ে উঠেছিল যে এহেন জগতে এই মুহূর্তে সব কিছুই সম্ভব বলে বোধ হতে থাকে।

'আচ্ছা, এই রকম একটা দ্বীপে উৎক্ষিপ্ত হবার বাসনা তুমি মনে মনে কখনো পোষণ করোনি, ঠিক করে বলো তো?'

'কক্‌খনো না।' কল্পনার সুদৃঢ় কণ্ঠ: 'আমার ভারী ঠাণ্ডা লাগছে। আমি বাড়ি যেতে চাই।'

ঠাণ্ডা লাগার অপরাধ কি? সাড়ে এগারোটায় সিনেমা ভেঙেছে—এমনিতেই তো অর্ধেক রাত। তার ওপরে অন্ধকারাচ্ছন্ন এই নির্জনতা ফাঁক পেয়ে মানুষের পাঁজরার ভেতরে ঢুকে হাড় কাঁপিয়ে দিতে চায়।

'বাড়ি যেতে চাইবে, সে আর আশ্চর্য কি?' আমি ওকে উত্তপ্ত করার প্রয়াস পাই: 'যারাই কিনা মরুদ্বীপে উৎক্ষিপ্ত হয় তারাই বাড়ি ফিরে যেতে চায়। কিন্তু কদিন আর? অভ্যেস হয়ে যেতে আর কদিন? প্রথম প্রথম ওইরকম একটু মন কেমন করে। তারপর কিছুদিন গেলে আর কিছুতেই তাদের সেখান থেকে—সেই মরুদ্বীপের স্বর্গোদ্যান থেকে সরানো যায় না। রবিন্সন্ ক্রুসো পড়েছ তো?'

কল্পনা বলে, 'তুমি একটা ক্ষ্যাপা।'

'কেন, এমন হতে পারে না কি?—' আমি ওকে বোঝাতে চাই: 'অঘটন কি ঘটে না পৃথিবীতে?—'

বাস্তবিক, যেখানে চিরকাল এত আলোর ঝলমলানি দেখে এসেছি, চাঁদের জ্যোৎস্নাটুকুও যে-পথে কদাচ পড়তে পায়নি, যেখানে পথঘাটের কোনোদিন অন্যরূপ দেখব এমন প্রত্যাশা ছিল না, সেখানে এই বিপুল—অদ্ভুত—অপরূপ অন্ধকার, এই অপরিমেয় রহস্যঘনতা, যা ভাবতেই, আপনিই যত অসম্ভব কল্পনা মনের বলগা-মুক্ত হয়ে এলোপাথাড়ি ছুটোছুটি লাগিয়ে দ্যায়।

'...মিরাকল কি ঘটে না পৃথিবীতে?...' আমি বলে চলি: 'এইমাত্র সিনেমার এক অবাস্তব জগৎ থেকে আমরা উঠে আসছি; আবার সেই আমাদের পুরনো পরিচিত পচা একঘেয়ে জীবনে ফিরে যাবার প্রত্যাশা নিয়ে, কিন্তু এর মধ্যে কী অঘটন ঘটে গেছে, না জানি কী যাদুবলে কলকাতার মায়া কাটিয়ে কোন্ এক সুদূর আদিম দ্বীপের উপকূলে, আমরা উৎক্ষিপ্ত এখন—যেখানে সভ্যতা নেই, ভদ্রতা নেই, অশান্তি নেই, যুদ্ধবিগ্রহ-মারামারি কাটাকাটি কিছু নেই, নিত্য নবযুগ, নিত্য নব নব হুজুগ নেই—কেবল চারিধারে নীলাম্বুরাশি আর তালীবন, আর শুধু তুমি আছো আর আমি আছি—এমন কি হতে পারে না নাকি?'

'তুমি একটা ক্ষ্যাপা।' কল্পনার কণ্ঠে পুরাতন ঘোষণা।

'এটা কি একটা জবাব হলো?'

'তুমি একটা আস্ত—।' কথাটা সম্পূর্ণ না করেই, আমার কবল থেকে সবলে তার হাত ছাড়িয়ে নেয়: 'হ্যাঁ, তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে। আমি বাড়ি যেতে চাই।' সে বলে।

'যাবে বই কি। নিশ্চয়ই যাবে।' আমি ওকে ভরসা দিই: 'যথাসময়েই যেতে পারে। আশ-পাশ দিয়ে একটা জাহাজ গেলে হোলো! আর জাহাজরা তো গিয়েই থাকে, কালেভদ্রে যায় বই কি! তখন আগুন জেলে নিশানা দাও কিম্বা তোমার পাঞ্জাবী খুলে নিশান ওড়াও। দ্যাখো, ঐ দ্যাখো, কী একটা যাচ্ছে যেন।—'

রক্তচক্ষু অতিকায় জাহাজপ্রতিম কী একটা, ভোঁসভোঁস গর্জনে, দারুণ আওয়াজ ছেড়ে, বঙ্কিম দৃষ্টিতে আমাদের দিকে বারেক মাত্র কটাক্ষ করেই তীরবেগে অন্ধকারের মধ্যে তিরোহিত হয়ে গেল।

'বাস গেল না?' কল্পনা আর্তনাদ করে উঠল: 'বাজে বক্‌বক্ করে বাসখানা হারালুম। থামালে কাজ দিত। থামালে না কেন?'

'কি করে থামাবো?' আমি বিস্মিত হই: 'পাঞ্জাবী খুলে ওড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া, সময় পেলাম কই? আর, কলকাতার পথে আগুন জ্বালালে, বুঝতেই পারছো, পেনাল কোডে পাক্কা ছ'মাস।—'

'পরের বাস আসতে আবার সেই আধ ঘণ্টা।' কল্পনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফ্যালে: 'আর আসবেই কিনা কে জানে।'

'নাই বা এলো।' আমি ওকে সান্ত্বনা দিই: 'মরুদ্বীপে সময় হু হু করে কেটে যায়। টেরই পাওয়া যায় না। আর এমন আরামে কাটে। এমন কি, সেখানে বসে এক-আধটু রোমান্সও করা যায় না যে তা নয়।'

'ছবিতে দেখেছি বটে।' কল্পনার শুষ্ক কণ্ঠ।

'দেখলেই বা, রোমান্সে কোনো দোষ নেই—' আমি ওকে বুঝিয়ে দিই: 'আর তাছাড়া রোমান্স করতে হলে মরুদ্বীপে নিক্ষিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তারও কোনো মানে নেই। রমণীয় যা, জো পেলেই জোগাড় করো—বাগে পেলেই বাগিয়ে নাও। রোমান্সের চুলের টিকি পাকড়ে আনো। অনেক বছর আগে, এমন একটা চমৎকার আঁধার রাত পেলে তুমি কী উচ্ছ্বসিতই না হতে।—'

'অনেক বছর আগে, তার মানে?' কল্পনা প্রতিবাদ করে।

'না, তত বেশি বছর আগে নয়।' আমি ক্ষতিপূরণ করে দিই: 'কেন, তোমার গলার সুরে তো বোধ হচ্ছে যেন এই সেদিনের কথা। মনে হচ্ছে, সেই তুমি, সেই তরুণবয়সী তুমি, অনেক বছর—মানে, অল্প কিছুদিন আগের সেই তুমিই—'

আমার গলার রেশ আমার কানে এসে লাগে। বেশ লাগে। নিজের স্ত্রীকে কেমন যেন পরস্ত্রী বলে মনে হয়।

'এখনো তুমি ঢের কাঁচা, ঢের কচি। এখনো তোমাকে নিয়ে রোমান্স করা চলে।...' আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলি। আমার আত্মপরভেদ লোপ পায়,—নিজের স্ত্রীর প্রতিই কেমন একটা অদ্ভুত টান অনুভব করি—কেমন যেন পরস্ত্রীকাতরের মতো হয়ে পড়তে থাকি ক্রমশঃ।

'...এমন চমৎকার রাত...এহেন মোহিনী অন্ধকার...তুমি আর আমি এত পাশাপাশি...'

নিজের গলা শুনে নিজেই বিগলিত হই। আমার মধ্যে এত মাধুর্য আছে "তাহলে না তো! এমন মধুর কণ্ঠ যে আমিও কখনো শুনিনি।

'...এসো, আরো কাছে এসো। আমায় একটা চুমু দাও।' এই বলে কস্তুরীমৃগ আপনগন্ধে আপনি মাতোয়ারা হয়ে ওকে কাছে টেনে একটা চুমু খেয়ে নিই।

এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেয়সী, আমার গালে এক চড় বসিয়ে দ্যান। বেশ মজবুত হাতের যুতসই এক চড়।

'কী সাহস তোমার।' কল্পনা হাঁপায়ঃ 'এতদূর আস্পর্দ্ধা।'

'বা রে, নিজের বৌকে যদি চুমু খেতে না পারো,—' আহত গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলিঃ 'তাহলে কার বৌকে চুমু খেতে যাবো, শুনি?'

'য়্যাঁ? তার ওপরে আবার একটা বউ আছে বাড়িতে? বটে?' কল্পনা ফোঁপাতে থাকেঃ 'আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার।'

এই বলে কল্পনা, আর একটি কথাও না বলে অশ্রুপ্লুত আবহাওয়ায়, মরুদ্বীপ ত্যাগ করে জলে নেমে পড়ল এবং টলতে টলতে জলাশয় পার হয়ে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

দোর গোড়াতেই কল্পনার সঙ্গে দেখা।

'উঃ, আজ খুব একটা ফাঁড়া গ্যাছে।' কল্পনা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলেঃ 'বলছি, ভেতরে চলো।'

'ফাঁড়া—? য়্যা? বলো কী?'

'যখন ছবি দেখে আমরা বেরুলুম, তুমি বল্লে না যে, আমার হাত ধরো,—তোমার মনে নেই?'

'আছে বইকি।' আমাকে স্বীকার করতে হয়।

'আমি ধরেও ছিলাম, কিন্তু অন্ধকারে প্রত্যেক হাতই প্রায় এক রকম। আমি তোমার হাত মনে করে আরেক জনের—লোকটা কিন্তু ভারী রোমাণ্টিক, যাই বলো। বিয়ের আগে তুমি যেমনটা ছিলে, অনেকটা তেমনি আর কি।'

'বুঝেছি, অন্ধকারের সুযোগে বেহাত হয়ে—' আমি কঠোর ভাষায় আরেক হাত নিইঃ 'তুমি বেশ একটু পরস্মৈপদী ফুর্তি লুটে নিয়েছ। ...ভালো করোনি। ছিঃ।'

'বাঃ, কী করে জানব আমি? আমি ভেবেছিলাম, তুমিই। অনেকটা তোমার মতই গলা। অবশ্যি, কেমন একটু ক্ষ্যাপা মনে হচ্ছিল, তবুও যতক্ষণ না লোকটা আমায় চুমু খেল আমি সন্দেহই করতে পারিনি। তারপরই তো আমি টের পেলুম যে তুমি নয়। তুমি কখনো চুমু খাবার কথা ভাবতেই পারো না। নিজের বউকে কি কেউ চুমু খায়—মানে, বিয়ের এই এতদিন পরে?'

'যাক্‌গে, যেতে দাও," বলে কথাটা আমি উড়িয়ে দিইঃ 'যে কাজটা ফেলে রেখে গেছি মনে আছে? কাল সকালেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। পূজো তো এসে পড়ল। কাকে কী উপহার দেওয়া যায় আজ রাত্রেই তার ফয়সলা করার দরকার।'

'কাল সকালে আমার সময় হবে না।' আমি জানাই। 'এবার টাকাকড়ির যা

টান—আত্মীয়তার টানাটানিটা একটু কমালে কী হয়? এবার পূজোয় ধরো কাউকে কিছু যদি না দিই?'

এবারে শারদীয়ায় কাকে কী তত্ত্ব দেয়া যায়, সেই সমস্যায় পড়া গেছল। সারা বছর কেউ কারো তত্ত্ব নেব না এবং পূজোর সময় সে-সমস্তর প্রতিশোধ নেব, এই আমাদের চিরাচরিত পারিবারিক প্রথা। পূজোর তত্ত্বকথা। এই দারুণ দুর্বৎসরে উক্ত প্রথার কোনোরূপ ইতরবিশেষ করা যায় কিনা ঠাওর করছিলাম।

'উঁহু। তা হয় না।' ঘাড় নাড়ল কল্পনা। পরিবারের কাছ থেকেই বাধা এল প্রথম।

'তাহলে উপহার-দ্রব্য নিয়েও মাথা ঘামানোর দরকার নেই।' আমি বলি: 'মঞ্জুকে একটা সিল্কের রুমাল, মামাকে এক কৌটো সিগ্রেট, সৌম্যকে একখানা ভালো বই, আমারই বই একখানা, আর রঞ্জনকে একটি ছড়ি—এই দেয়া যাক্। এই—এই দিয়েই এবারকার হাঙ্গামা চুকিয়ে দিলে কী ক্ষতি?'

'ক্ষতি নেই?' কল্পনা জিজ্ঞেস করে।

'খতিয়ে দেখলে ক্ষতিই অবশ্যি। উপহারের ছড়াছড়ি করার আমিও পক্ষপাতী নই। কিন্তু তুমি আবার বলছো—'

'আমি মোটেই ওই দিতে বলছিনে।' কল্পনা বাধা দিয়ে বলে: 'উপযুক্ত উপহার কী দেয়া যায় তাই আমি ভেবে দেখতে বলেছি।'

'ভেবে দেখতে আমি নারাজ নই।' আমি স্বীকার করি। —"কিন্তু আমার কেমন ভয় হচ্ছে যে ভাবতে গেলেই আরো বেশি খরচেব ধাক্কায় পড়ে যাব।'

'উপহার তো দিতেই হবে। কিন্তু তা যাতে দেবার মতো হয় তা কি ভাবতে হবে না? আহা, কে যে কী চায়, সেইটে যদি কোনো উপায়ে জানা যেত—'

'রক্ষে করো। আমরা বাঞ্ছাকল্পতরু হতে পারব না।' আমি ককিয়ে উঠি।

'কল্পতরু না হই, তাদের ইচ্ছার একটুও তো পুরণ করতে পারি। চেষ্টা করলে করা যায় না কি?'

'একটুখানির মধ্যে নিজেদের ইচ্ছা সীমাবদ্ধ রাখার মানুষ কিনা তারা? আত্মীয়দের ভালোমতই আমার জানা আছে—চিনতে আর বাকী নেই। তাদের মনের মধ্যে হানা দিতে গিয়ে—'

'সোজাসুজি তাদের জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি না কি? আমার বাপের বাড়িতে এরকম ব্যাপারে কী করা হয়ে থাকে জানো?' জিজ্ঞেস করে কল্পনা।

কল্পনার পিত্রালয়ের রহস্য আমার কল্পনাতীত। আমি ঘাড় নেড়ে আমার অজ্ঞতা জানাই। উপহারের স্থলে সেখানে প্রহার দেওয়া হয় কি না, তাই ওদের পৈতৃক পদ্ধতি কি না, জানবার আমার কৌতূহল হয়।

'ইচ্ছাময়ের লীলা ব'লে একরকমের খেলা আমরা খেলি। পূজোর কিছুদিন আগে আত্মীয়বন্ধুদের ডেকে একটা পার্টি দিই। সেই আসরেই খেলাটা ফাঁদা হয়। কার কী কী জিনিস পাবার কামনা, প্রত্যেককে তার তালিকা বানাতে বলা হয়। তারপরে যে কী হয় আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

'দিস্তা দিস্তা কাগজ আনার দরকার পড়ে বোধ হয় ?' আমি অনুমান করি। —"তাহলে বলো, রিমখানেক কাগজের জন্যে ভোলানাথ দত্তে অর্ডার দেয়া যাক ?'

'বাজে বোকো না।' ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে ওঃ 'মনে হচ্ছে ছ'টা ইঞ্চের মধ্যেই তালিকা সম্পূর্ণ করতে বলা হোতো। আমরাও ওদের নেমন্তন্নের আসরে ডেকে এনে তাই বলবো। তাহলেই ল্যাঠা চুকে যাবে। তাহলেই তো ফর্দ আর বাড়তে পাবে না।'

'বেশ, তারপর ?'

'তারপরে, ইচ্ছা পুরণের জন্য একজন করে আসর থেকে উঠে পাশের ঘরে যাবে—'

'যেমন ধরা যাক মঞ্জুলিকা।' আমি উদাহরণের পক্ষপাতী। দৃষ্টান্তের স্বরূপছাড়া কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ করা—সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা আমার পক্ষে সুকঠিন।

'বেশ, মঞ্জুই হলো না হয়।'

'তাহলে আরেকজনকেও তো যেতে হবে তার সঙ্গে।' বলি আমি।

'কেন ? আরেকজন কেন ?'

'বাঃ, আর কেউ না গেলে তার ইচ্ছা পূর্ণ হবে কী ক'রে ?'

'এ তোমার—যতো—ইয়ের খেলা নয়।' কল্পনা ঝাঁঝিয়ে ওঠেঃ 'একেবারে আলাদা জিনিস।'

'কিন্তু মঞ্জুর মন যা চায় তাইতো যোগাতে হবে ? মনে মনে সর্বদাই সে পরমুখাপেক্ষী। তার মুখ্য ইচ্ছে হলো—'

'চুমু খাবার ? তুমিই ভালো জানো ! কিন্তু সেসব এখানে চলবে না।'

'তাহলে সেরকম নিরামিষ ইচ্ছাপুরণে মঞ্জুর বিশেষ উৎসাহ হবে বলে মনে হয় না।' আমিও জানাতে বাধ্য হই।

'না হলো বয়েই গেল ! আমাদের তালিকা পাওয়া নিয়ে কথা। তাদের মনের ইচ্ছাটা শুধু জানার দরকার। কাগজ পেন্সিল নিয়ে না হয় দুজন করেই পাশের ঘরে যাবে—'

'কিন্তু জোড়া গেঁথে যদি আমরা পাশের ঘরে পাঠাই তাহলে তা. কখন ফিরবে তার কি কিছু ইয়ত্তা আছে ? কোন্ ঘরে শেষ পর্যন্ত তাদের পাওয়া যাবে তাও বলা মুস্কিল। এমন কি,—' বলতে গিয়ে আমি চেপে যাই।

'মুস্কিল কিসের ?' ও জিজ্ঞেস করে।

'মানে, আদৌ ফিরবে কিনা, কোনো ঘরেই পাওয়া যাবে কি না তাই বা কে জানে !' আমার উপসংহার। আত্মীয়রা এবং আত্মীয়তা স্বভাবতই আমার কাছে রহস্যময়।

'তাহলে—তাহলে না হয় এক একজন করেই ছাড়া যাবে।' কল্পনা বলেঃ 'তারপরে আর কি, তালিকার ছ'টা আইটেমের মধ্যে যেগুলো বেশ ব্যয়সাধ্য সেগুলো ছেঁটে বাদ দিলেই হবে। তখন খুব সহজেই আমাদের দেবার জিনিস আমরা বেছে নিতে পারবো।'

'যেমন—ধরা যাক—' আবার আমার উদাহরণের প্রতি টানঃ 'আমাদের মামাবাবু চান—

১। ল্যান্ড মাস্টার গাড়ি,

২। বিমানপথে ভূ-ভারত-ভ্রমণ,

৩। বালিগঞ্জে বাড়ি,

৪। বাঘ শিকার করতে,

৫। কোনো বিশেষ চিত্রতারকার সৌখ্য, এবং ৬। ভালো এক কৌটো সিগ্রেট, তাহলে তিনি খালি সিগ্রেটই উপহার পাবেন। কেমন, এই তো?'

'ঠিক তাই। তালিকার কোথাও না কোথাও তাঁর মনের তাল পাওয়া যাবেই। যে তাল আমাদের মনের মানের সঙ্গে খাপ খাবে।'

কল্পনার ইচ্ছামতো, অভিলাষ-আসর জমানো গেল। তালিকাও পাওয়া গেল যথারীতি। কিন্তু পেয়ে দেখা গেল, না পেলেই ছিল ভালো! আমাদের আত্মীয়দের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কাঞ্চনজঙ্ঘাকেও হার মানায়। মানুষকে আত্মহারা করে দেয়। মুক্তকচ্ছ করে মহাপ্রস্থানের পথে টানতে থাকে।

মঞ্জু, তার ইচ্ছা-তালিকায় চেয়েছে দেখলাম—এক, একখানা বাড়ি; সিমলাশৈলে হলেই ভালো হয়, নেহাতপক্ষে সিমলা স্ট্রিটে হলেও ক্ষতি নেই; দুই, অভিনেত্রী জীবন (বলাবাহুল্য, চিত্রনায়িকারূপে); তিন, কাশ্মীর বেড়ানো; চার, লাখখানেক টাকা (অনেক কমসম করেই); পাঁচ, নতুন ডিজাইনের ডজন খানেক শাড়ি; আর ছ' নম্বরে, দেশবিখ্যাত স্বামী।

তালিকাটি আগাগোড়া চষে গেলাম—ওর কটুকষায় উপসমাপ্তি অবধি। ওর শেষ প্রার্থনাটা আমার দ্বারা পূর্ণ হবার নয়। খোঁচাটা লাগলো। কিন্তু আমার অভাবে, ওর এই অপূরণীয় ক্ষতি কোনোদিন পূর্ণ হবে কিনা কে জানে।

'সিল্কের রুমাল।' সাব্যস্ত করল কল্পনা।

'সিল্কের রুমালের কথা কোথাও কিন্তু নেই ওর।' আমি আপত্তি করি।

'তাই চেয়েছে পাকে প্রকারে।' কল্পনা গর্জে ওঠে: 'ওকরম চালচলনে সিল্কের রুমাল না হলে মানায় না। উঁচু নজরটা দেখেছ?'

'আহা, তোমারই তো বোন—' আমি বলতে যাই।

'আমাদের আজে-বাজে স্বামী হলে চলে যায়, আর ওর চাই কি না—' কল্পনা গজরাতে থাকে।

'সত্যি। সন্দেশ-বিখ্যাত স্বামী চাইলেও না হয় একটা গতি করতে পারা যেত। কিন্তু—' ভীম নাগও এহেন নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসের আওতায় আসতে চাইবেন কি না ভাবতে গিয়ে আমায় থামতে হয়।

আমাদের মামাবাবুর চাহিদাটা একটু রাজনৈতিক। তিনি কলকাতার মেয়র হতে চেয়েছেন। মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে একজন হতেও তাঁর অনিচ্ছা নেই। ওই দুইয়ের একটাও যদি ঘটে যায় তাহলে কলকাতায় বাড়ি পাবার আকাঙ্ক্ষাকে তিনি তিন নম্বরের মধ্যে আনতেই রাজি নন্; কেননা পূর্বোক্তরূপ বাড়াবাড়ি তাঁর ভাগ্যে ঘটলে ঘরবাড়ি ইত্যাদি অবলীলাক্রমে আপনা থেকেই এসে যাবে। চতুর্থতঃ, রাজপ্রমুখ উপাধি লাভ করা। রাজত্ব না থাকলে যে রাজপ্রমুখ হওয়া যায় না একথা মানতে তিনি নারাজ। পঞ্চমতঃ, বাংলাদেশের

মুখ্যমন্ত্রী হওয়া, নিতান্ত না হতে পারলে তার বদলে—সেইটাই তাঁর শেষ ইচ্ছা—খাদ্য মন্ত্রীর দপ্তরে কোনো পদ (সেজন্য যেকোনো অপদস্থতা মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন)।

তাঁকে এক কৌটো সিগ্রেট দিলেই হবে, আমরা বিবেচনা করে দেখলুম। কেননা যদ্দুর অবধি দৃষ্টি যায়, তাঁর রাজনৈতিক জীবন ধোঁয়াতেই পরিসমাপ্ত হতে বাধ্য, দেখা গেল।

সৌম্য চেয়েছে (১) একটা মোটর সাইকেল, (২) কোডাকের ক্যামেরা, (৩) রানিং শু, (৪) সাঁতার কাটবার নিজস্ব একটা পুকুর, (৫) একখানা ভালো ডিটেকটিভ বই, (৬) আস্ত একটা এরোপ্লেন।

ওর ইচ্ছামত, একখানা গোয়েন্দাকাহিনী ওকে দিতে আমাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হোলো না। ব্ল্যাক গার্লস সার্চ ফর গড—বার্নার্ড শ'র সেই বইখানা পড়ে ছিল—দিয়ে দেয়া গেল।

রঞ্জনের অভিলাষ একটু বিচিত্র রকমের। বন্দুক, পিস্তল, রিভলবার, হাতবোমা ইত্যাদি মারাত্মক যত অস্ত্রশস্ত্রেই তার অভিরুচি।

এছাড়াও রঞ্জনের একটা পুনশ্চ ছিলো, একশো গজ লাল রঙের শালু, কেন যে তা কে জানে। তার এই লালসার মধ্যে একটু কমরেড-কমরেড-গন্ধ মিলতে লাগল। লাল নিশান উড়িয়ে কেরলের দিকে ধাওয়া করবে কি না ওই জানে। আন্দাজটা ব্যক্ত করলাম।

'কিন্তু এই বাজারে একখানা রুমাল কেনা দায়, কালোবাজারে আর লালবাজারে রেষারেষি,—এর মাঝে শালু আমি পাই কোথায়?'

'তাও আবার একশো গজ।' কল্পনা মুখ বাঁকালো।

'একশো গজের কথা থাক, একটা ইঁদুরের পরবার মতো কাপড় কেনার পয়সা জোটে না।' আমি বল্লাম: 'অবশ্যি এক কাজ করলে হয়। ওর বিয়ের ব্যবস্থা করলে হয়। আমাদের মঞ্জুর সঙ্গেই—'

'আর মঞ্জুকে একটা শালুর ব্লাউজ দিলেই চলে যাবে।'

কল্পনাই উভয় সঙ্কটের সমাধান করে দেয়।

'লাল শালুর ব্লাউজ। এক গজেই হবে তো?' সায় দিই আমি: 'তাহলে একরকম একশ গজই দেয়া হবে। মঞ্জু আমাদের একাই একশ।'

দুই

'ভালোবাসিলে ভালো যারে বাসিতে হয়, সে যেন পারে ভালোবাসিতে...' নিজমনেই গুনগুন করছিলাম।

বৃন্দাবনে কুরুক্ষেত্র কিম্বা কুরুক্ষেত্রে বৃন্দাবন, চুলচেরা বিচারে বলা কঠিন, কিন্তু তাহলেও অঘটনটার ল্যাজামুড়ো মিলিয়ে সম্রাট শালীবাহনের তেমন ভালো লাগবার কথা নয়। এবং লাগছিলও না। সে যুগের সম্রাট এ-অবস্থায় পড়লে কী করতেন কে

জানে, কিন্তু একালে তাঁর দরাজ সংস্করণ হয়েও এই লঘুভার বহনে যেন আমার ঘাড় ভাঙছিল। সত্যি, ব্যাপারটা যেন সহনশক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যায়...

শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লব সব নিয়ে নিজগুণেই মর্মরিত হচ্ছি.....

এমন সময়ে সেই গুঞ্জরণের মাঝখানে কল্পনা হাওয়ার মতই বয়ে এলো।—

'দ্যাখো, এই ব্যাপারটায় আমিও ভারী অবাক হয়েছি। ব্যাজ্-আঁটা সেই গোঁফালো অফিসারটির মোটর সাতদিনের মধ্যে চারবার আমাদেরই দোরগোড়ায় এসে বেগড়ালো, এটা যেন একটু কেমন-কেমন না? তুমি কী বলো?' কল্পনার কপালে একাধিক রেখা পড়তে দেখা যায়।

'আমি আবার কী বলব।' তিক্তকণ্ঠে আমি বলি, কালকে লেকের ধারে বেড়াবার সময় দেখলে না? মাটি ফুঁড়ে কোথ্থেকে রেগুলার একদল কুচকাওয়াজ বেরিযে পড়লো—দ্যাখোনি?'

'দেখেছি।' কল্পনা একটু মুচকি হাসেঃ 'তা—শোভনা আমাদেব তো দেখতে মন্দ নয়।'

বা রে! দেখতে কেউ অমন্দ হলেই বুঝি আপামব সবাই বিশ্বগ্রাসী দৃষ্টি মেলে তাকে গিলতে থাকবে? বেশ কথা আর কি! লক্ষ্য কবে দেখলে এর চেয়ে অশোভন দৃশ্য আর কিছুই হতে পারে না। বিশেষ কবে শোভনা আমার শালী বলে তার বেলায একথা তো আমি ভাবতেই পারি না। কেমন যেন শালীনতায় বাধে! ওকে দেখবার ভাব—যদি দেখতেই হয়—আপাততঃ তা কেবল আমার একলারই থাকা উচিত। স্পষ্টবাক্যে এই কথা ওঁর কাছে ব্যক্ত করব কি না ভাবছি, উনি আমার চিন্তাধারায় বাধা দিলেন—'আমি মেসোমশায়ের কথাই ভাবছি।'

হ্যাঁ, সে-ই আরেক ভাবনা! সে দিকটাও ভাবতে হয় বইকি। শোভনার বাবা, জনৈক বাঙালী মেজর, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশে যাবার আগে শোভনাকে আমাদের হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন। ভেবে দেখলে কতো বড়ো দায় আমার ঘাড়ে। আমার—আমার না হোক্, কল্পনারই হলো—আমার সেই কাল্পনিক মেসোমশাই তাঁর পরম স্নেহের একমাত্র কন্যারত্নকে—মাতৃহীনা (এবং কে জানে, এতদিনে পিতৃহারাও কি না!) মেয়েটিকে আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন—আর এদিকে তাঁর আদরের দুলালী তাঁর মেজর-শিপ্‌কেও টেক্কা মেরে সারা সৈন্যবাহিনীর মেয়ে-কম্যাণ্ডার হতে চলেছে। রীতিমতো কুইক্‌মার্চ করেই চলেছে বলা চলে।

এখন আমার মনে পড়ে। শোভনাকে রেখে যাবার সময় কী যেন তিনি বিশেষ করে বলতে চেয়েছিলেন। কী যেন একটা কথা বলি-বলি করেও বলতে পারছিলেন না।

আত্মজার জন্যে পিতৃসুলভ উৎকণ্ঠা অনুমান করে আমি তাঁকে অভয়-দানের চেষ্টা করেছি।

বলতে গেছি আমাদের দিক দিয়ে এবং আমোদের দিক দিয়ে কোনো কিছুর অভাব ঘটতে দেব না।

'না, না, ভয়ের কিছু নেই, তেমন ভয়ের কিছু না—' ব'লে উঠেছেন তিনি—'তবে মেজরের মেয়ে কি না, এই যা।'

এই কথা ব'লে একটা কথা যেন তিনি চেপে গেলেন বলেই আমার মনে হয়েছিল তখন। এখন দেখছি সেই এক কথার মধ্যেই সমস্ত কথা তিনি খোলসা করে বলে গেছেন। মেজরের মেয়ে—এই একটি কথাই খুব—লাখ কথার এক কথা। মেজরের মেয়েকে আপাতদর্শনে মেজার করা যায় না।

এবং মেজরের মেয়ের কাছে থাকা যে যুদ্ধের কাছাকাছি থাকা, একথাই বা কে তখন ভাবতে পেরেছিলো ? কিন্তু ভ্রমেও না ভাবলেও ক্রমেই তা'অভাবিতভাবে প্রত্যক্ষ হতে লাগলো।

এই শহরেই কোথাও একটা ট্রেনিং ক্যাম্প্ খোলা হয়েছে শুনেছিলাম। ঐ ক্যাম্পের হবু (এবং গবু) সৈন্যবাহিনীর তিনশো পঁয়তাল্লিশ জনের ভেতরে তিনশো তেতাল্লিশ জনাই আমাদের শোভনাকে জানে একথা জানা ছিল না। ক্রমশঃ জানা গেল।

'তোমার মেসোমশাই কেন যে এই জাঁদরেল মেয়েটিকে এখানে ছেড়ে গেলেন এখন টের পাচ্ছি।' কল্পনাকে আমি জানাই : 'আমাদের হোম্ ফ্রণ্ট্ সামলানোর জন্যেই, বোঝা যাচ্ছে এখন।'

খুক্ করে একটু কেশে ড্রইংরুমের দ্বার ভেদ করতেই খসখসে আওয়াজ কানে এল। সামান্য তাড়াহুড়ার শব্দ ! ঘরের ভেতর অকস্মাৎ কী যেন একটা ঘটে গেল। কিছু একটা ইতরবিশেষ। একটু ইতস্ততি। সড়াৎ করে জানালা-পথে তীরবেগে কে যেন তরোহিত হয়ে গেল বলে মনে হয়।

চক্ষুকর্ণের ভ্রম হওয়াই সম্ভব। কেননা, দ্বারপথে যা ধারণা হয়েছিল আরেকটু ভ্রমণ করে ঘরের ভেতর এসে তার সমর্থনে কিছুই পেলাম না। সব কিছুই যথাযথ। অ্যাজ্ ইট্ ইজ্। যেখানকার যা সেখানেই আছে। ওলোট-পালটের চিহ্নমাত্র নেই। শোভনা পিয়োনোর টুলে বসে একখানা গৎ বাজাচ্ছে—ঠিক বাজাচ্ছে না—বাজাতে যাচ্ছে। রবিবাবুর গান কিন্তু স্বরলিপির খাতাটা উল্টো করে' ধরা, এইটুকুই যা ব্যতিক্রম দেখা গেল। তার বাহাদুরি।

'জানালা দিয়ে গেল—ওটা কে ? 'আমি জিগেস করলাম।

'বেড়াল।' অম্লানমুখে ও জানায়।

'তুমি আসবার পর থেকে এ বাড়িতে বেড়ালের উপদ্রবটা যেন বড্ড বেড়েছে মনে হয়।'

'আমাকে কি আপনি মৎস্যকন্যা বলে সন্দেহ করেন নাকি ?' শাণিত চাহনির সঙ্গে শোভনার শানানো জবাব।

না না, তা বলছিনে। তবে কি না—' বলতে বলতে আমি স্পষ্টবক্তা হই : 'শোভনা, তুমি এখনো 'মাইনর' তা জানো ? এখন আর ছোট্ট মেয়েটি নও।'

কথাটা পরস্পর বিরোধী হোল বুঝতে পারি। কিন্তু রাগের ভাষা অনুরাগের ভাষণের

মতই—মুখর হয়ে উঠলে নিজের তালজ্ঞান হারায়। কী বলতে কী বলা হয়ে যায়। কিন্তু তাহলেও সতের বছরের মেয়েকে বালিকা বলতে পারি না, নাবালিকাই বলতে হয়।

'আপনিই বা কী এমন মেজর যে গায়ে পড়ে উপদেশ দিতে এসেচেন?' শোভনাও একদম অস্পষ্ট না।

'আর যাই হই আমি তোমার মতো নাবালক নই এটা তো মানো? আর সাবালক মানেই তো মেজর।'

'মোট্টেই না।' শোভনা এক ফুৎকারে আমার সমস্ত ওজোর উড়িয়ে দেয়ঃ 'মোটেই আপনি মেজর নন্।'

যুদ্ধে না গিয়েও, স্রেফ আঠারো বছরে পা দিয়ে—ঘরে বসে—শুয়ে ঘুমিয়ে শুদ্ধমাত্র এই পদার্পণের কৌশলেই যে বেমালুম মেজর হওয়া যায়, মেজরিটির এই ধারণা ও টলিয়ে দিতে চায়। ওর মতে, সামান্য পদাতিক হয়ে সৈন্যদলে ঢুকে, যুদ্ধে এবং বিনাযুদ্ধে, হাত-পা অটুট রেখে এবং নিজে বজায় থেকে, ক্রমাগত পদোন্নতির ফলে কদাচ যা লভ্য হয়—একটু আগে পাদচারণার সাহায্যে গবাক্ষপথে সদ্যপলাতক তজ্জাতীয় তথাকথিত বেড়ালদের ভাগ্যেও যে সুদুর্লভ গৌরব দৈবাৎ কখনো শিকে ছিঁড়ে থাকে—সেই মহামহিমাই, এক কথায়, মেজর। এবং তা কেবল তার বাবাই হতে পেরেছেন। এবং আমি কোনোদিন পারব না, একথাও মুক্তকণ্ঠে জানাতে সে কুণ্ঠিত নয়।

'বেশ, মেজর আমি না-হয় নাই হলুম, তুমি যে মাইনর তার তো আর ভুল নেই। তোমার ভালমন্দের দায়িত্ব এখন আমাদের তো।'

'কক্ষনো না। মেজরের মেয়ে কক্ষনো মাইনর হতে পারে না।'

ক্ষুরধারকণ্ঠে ও বলে। সেই ধারালো ক্ষুরের সামনে গলা বাড়াবো—এমন সাহস আমার হয় না। দরজা দিয়ে গলে আসি ফের।

সেদিন বিকেলে ড্রইংরুমে বসে স্বরলিপির বইটার পাতা ওল্টাচ্ছি, এমন সময় শোভনা খাকি পরিচ্ছদের অন্তর্গত একটি ভাবী মেজরের সাথে ঘরের মধ্যে সঞ্চারিত হলো।

'নমস্—কার্।' আমাকে সম্মুখে দেখে সেই খাকি পরিচ্ছদ সশব্দে অ্যাটেন্শন্ হয়ে দাঁড়ালেন।

'ডিট্টো।' শুষ্ককণ্ঠে প্রতিনমস্কার জানালাম।

'এই, আজ্ঞে—' আমার বিজাতীয় সম্ভাষণে যুবকটি যেন একটু দমেই গেল।—'এধার দিয়ে যাচ্ছিলাম, শোভনা দেবী দয়া করে আমাকে চা-পানের জন্য ডাকলেন।'

'ইনি—ইনি হাবিলদার পট্টনায়ক।' শোভনা দেবী দয়া করে সামরিক শোভাটির পরিচয় প্রদান করেন।

'ও তাই নাকি?' আমি ভয়ানক খুশি হয়ে উঠিঃ 'তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ হলে এত আনন্দ হয় আমার কী বলবো? আপনিই শ্রীমান্ পট্টনায়ক? আপনাদের অনেকগুলি নায়কের সঙ্গেই ইতিমধ্যে আমার জানাশোনা হয়েছে—অবশ্যি, আপনাদের শ্রীমতী শোভনা দেবীর সৌজন্যেই—বলাই বাহুল্য! এই যেমন, মিঃ চট্টরাজ, ক্যাপ্টেন

চাঘ্‌তাই, কর্ণেল খোন্দকার, শ্রীযুত বাজপেয়ী কিম্বা বাজপাই যাই বলুন—লেফ্‌টেনেন্ট লাট্টু নারায়ণ—সিপাহি বিঠল সিং তেওয়ারি—ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যি, এমন প্লিজিং কোম্পানি—কী বলব—যারপরনাই!'

'অ্যাঁ—আজ্ঞে—?' বেচারী থতমত খায়। আহত নেত্রে শোভনার দিকে চেয়ে থাকে। আর শোভনা? শোভনার দিকে আমি চাইতেই পারি না। মেজর শোভনার দুচোখে দুই বেয়নেট্‌।

'আমি—আমি তাহলে এখন আসি।' ঢোঁক গিলে যুবকটি বলে।

'না না, এখনই যাবেন কী?' আমি আরো উৎসাহিত হই: 'এখনো তো চারটে বাজেনি। চারটের মধ্যেই আপনার সহযোগীদের সবার দেখা পাবেন—এখানেই পাবেন। মিষ্টার বেঙ্কটরমন্‌, মিষ্টার ভেঙ্কটপ্পা এবং মিঃ বালাজী বাজীরাও—ঐতিহাসিক ক্রমানুগতিতে নম্বর তিন কিম্বা চার কী হবেন তা বলতে পারব না—একে একে সবাই আসবেন। তৃতীয় বালাজী বাজীরাও তো চারটে বাজলেই চায়ের ঝোঁকে এসে পড়েন।'

পট্টনায়ক কী যেন বলবার চেষ্টা করেন, তাঁর গলার ভেতর ঘড়ঘড় করে ওঠে—ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চারটে বাজতে দেড় মিনিট দেরি আছে টের পান—তখন, সেই ঘর্ঘর-ধ্বনির সাথেই দ্রুত বিদায়বাণী উচ্চারণ করে—শুভসন্ধ্যা জানিয়ে—তিনটে সোফা টপ্‌কে—পরপর পার হয়ে—টিপয় টেবিল দেরাজ পরম্পরা জানালার ধারে গিয়ে পৌঁছন। তারপরে আর একটুও ইতস্ততঃ না করে বেড়ালদের যাতায়াতের সেই রাজপথকেই সোজাপথ ভেবে তার ফাঁক দিয়ে এক লাফে নেপথ্যে অন্তর্হিত হন। এক মুহূর্ত আর দাঁড়ান না।...

'আজকের গাড়িতেই আমরা কলকাতা ছাড়চি।' কল্পনাকে গিয়ে বললাম।

'অ্যাঁ?' সে চম্‌কে ওঠে।

'হ্যাঁ। না গেলে কী সর্বনাশ হবে তার কিছু তুমি বুঝতে পারছো? এহেন সামরিক আবহাওয়ায়—এই যুদ্ধকালীন কলকাতায় শোভনাকে রাখার মত বিপজ্জনক আর কিছু হতে পারে না। এই ছোঁয়াচে আওতা থেকে দূরে নিয়ে ওকে বাঁচাতে হবে। ভেবে দ্যাখো—পরের কন্যাদায় আমরা নিজের ঘাড়ে নিয়েছি—'

'কিন্তু যাবো কোথায়?' কল্পনা জিজ্ঞেস করে।

'সুদূর কোনো গণ্ডগ্রামে। কেন, মাটিয়ারিতে গেলে কেমন হয়?'

'মাটিয়ারি?'

মাটিয়ারির নামে কল্পনা কেঁপে ওঠে—তার কল্পনাও বুঝি ছাড়িয়ে যায়। এক বন্ধুর আমন্ত্রণে একবার সেখানে আমরা গেছলাম। গণ্ডগ্রামের মধ্যে অপোগণ্ড যদি কিছু থাকে তো সে মাটিয়ারি। গণ্ডগোলের গ-পর্যন্ত নাস্তি! মানুষ এবং অমানুষ—মোট জড়িয়ে সেখানে মাটি ছাড়া আর কিছুই নেই। জনপ্রাণী কাউকে প্রাণীজন বলে বোধ হয় না। জীবনের লক্ষণ কেবল দুটি দেখেছিলাম সেখানে—মহাস্থবির হাড়পাঁজরা-সার ঝরঝরে গাঁয়ের গা ঘেঁসে ঝিরঝিরে এক নদী—আর—আরেকজন—লঝ্‌ঝড় এক ডাকহরকরা। এই দুইজনাই প্রাণের চাঞ্চল্য পরিস্ফুট করতে যা একটু ছুটোছুটি করত—ওছাড়া আর কোথাও একটুখানি বাড়াবাড়ি ছিল না।

মাটিয়ারিতে এসে দিন সাতেক শোভনা মনমরা হয়ে থাকলো। অতগুলো ভাব মাটি করে—অমন মহা মহা প্রাদুর্ভাবের মহামারি থেকে এখানকার একঘেয়ে আড়ির মধ্যে এসে—মন ভারী হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু ক্রমেই ওর আগ্রহ দেখা দিলো—ফেরারী উৎসাহ যেন ফিরে এলো আবার। মাটিয়ারি গ্রামের তৃতীয় জীবনের লক্ষণ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম।

এমনকি, একদিন সে মুখ ফুটে বলেই ফেলল: 'নাঃ, জায়গাটা তত খারাপ না। যতটা মনে হয়েছিলো তা নয়। এমন স্থানেরও সম্ভাবনা আছে। বেশ সম্ভাবনা আছে।'

পার্বত্য ত্রিপুরার কুক্ষিগত এই দ্বিতীয় (এবং অদ্বিতীয়) শান্তিনিকেতনের আবার কী সম্ভাবনা সে দেখেছে সেই জানে! নৈঋত কোণ অবধি চারধার বেশ করে খুঁটিয়ে দেখেও অশান্তির কোনো খুঁটিনাটি আমার নজরে পড়লো না।

যাক্ তবু যে এখানকার মাটিতে ওর মন বসেছে সেই ঢের। বনহরিণীসুলভ ওর মনোহারিণী লীলা আবার আমাদের চোখে পড়ছে, এই আমাদের সৌভাগ্য।

'বিধি ডাগর আঁখি
যদি দিয়েছিলো
সে কি আমার পানে
ভুলে পড়িবে না?...'

সেদিনকার স্বরলিপির পাতায় দেখা গানের এই কলিটা নিজের মনে গুন গুনিয়ে গাঁয়ের পথে বেরিয়ে পড়লাম...

পোষ্টাফিসের অভিসারেই বেরিয়েছিলাম...

পোষ্টাফিসের নামান্তর—স্থানীয় মুদি ওরফে পোষ্টমাষ্টারের ভাঙা কেরোসিন কাঠের বাক্স থেকে হাতড়ে মাতড়ে যদি পাওয়া যায়—তেলচটা একখানা পোষ্টকার্ড বাগিয়ে আনার চেষ্টা করব।

পোষ্টমাষ্টারের দাঁড়িপাল্লায় শোভমান খর্বাকার একটা খবরের কাগজ দেখা গেল—ত্রিপুরা-বার্তাবহ না কি! এই আকারের একখানা শোভনার হাতেও কালকে না কবে যেন দেখেছিলাম মনে হচ্ছে। আরো দেখলাম—কৌতূহল চরিতার্থ করতে গিয়ে আরো দ্রষ্টব্য দেখা দিলো—উক্ত সাপ্তাহিকের এক কোণে—বড় বড় না হলেও মেজ মেজ হরফে ছাপা রয়েছে—একটি ইস্তাহার!...

'বিশেষ সংবাদ। ভারতবর্ষের সবকয়টি ট্রেনিং ক্যাম্পের সামরিক রিক্রুটেরা আগামী সপ্তাহে আমাদের পার্বত্য ত্রিপুরায় সম্মিলিত হইতেছেন। শান্তিপূর্ণ মাটিয়ারি অঞ্চলেই তাঁহাদের ছাউনি পড়িবে...'

তিন

কল্পনা টেলিগ্রামের থেকে চোখ তুলে আমার মুখে তাকালো এবং আমার থেকে চোখ নামিয়ে ফের টেলিগ্রামের দিকে।

'এক্ষুনি চলে এসো—পিসিমা।' বিড় বিড় করলো সে: 'পিসিমা কেন ডেকেছেন আঁচ পাচ্ছো কিছু?'

বিশেষ করে ভেবে অবশেষে আমি বলি, গম্ভীর মুখেই বলি—'আমার যা মনে হয়—হয়তো খুব অদ্ভুত শোনাবে, তবু এরমকটাও হওয়া সম্ভব—এর মানে হচ্ছে, 'চলে এসো চটপট। তাই কী?'

'তোমার মুণ্ডু!' কল্পনার মুখঝামটা শোনা যায়: 'পিসীমার ভালোমন্দ কিছু হওয়া তো সম্ভব নয়—কী বলো?'

এক হিসেবে সেকথা সত্যি। শ্রীশ্রীপিসীমা ভালোমন্দের অতীত। অপর পক্ষে, যাঁরা নিরপেক্ষ বিচারক তাঁদের মতে পিসীমার ভালো কিছুই নেই—হতেও পারে না; বরং মন্দ বলতে যাকিছু আছে সমস্তই তাঁতে বর্তমান। এবং আরো আরো বহুৎ মন্দ তাঁর আবশ্যম্ভাবী। অবশ্যি, এটা দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য মাত্র।

'কী করবে ভাবছো?' কল্পনা জিজ্ঞেস করে। —"যাবে?'

'ক্ষেপেছো! এই দারুণ বর্ষায় শিলং-এর কথা ভাবতেই আমার হৃৎকম্প হচ্ছে—সেখানে না গিয়েই। ওকথা ভুলে যাও।'

এবং আমরা ভুলে গেলাম। সন্ধ্যে পর্যন্তই। ইতিমধ্যে বাংলা মুলুকের টেলিগ্রাফের তার আরেকবার মোচড় খেয়েচে—আর তার আর্তনাদ আরেকটি খাকি রঙের খামে সন্ধ্যের মুখে আমাদের শান্তিকুঞ্জে ভেসে এসেছে।

'জবাব নেই কেন দাঁড়ি চলে এসো এক্ষুনি দাঁড়ি নাটকটা এনো দাঁড়ি জরুরী পিসিমা।' এতগুলি দাঁড়ি তারবার্তা থেকে পাওয়া গেল—পিসিমার তারস্বরের সঙ্গে। হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেলাম।

'ওঃ!' চেঁচিয়ে ওঠে কল্পনা: 'তাই তো! ঠিকই তো!'

'য়্যাঁহ?'

'পিসিমার বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে মেলামেশার চিরকেলে বাতিক, ভুলে গেছ?' সে মনে করিয়ে দেয়: 'বোঝা যাচ্ছে, পিসিমার বাড়িতে—মানে, পিসিমা সম্প্রতি—কোনো পায়াভারী কাউকে—মানে হোমরা চোমরা কেউ সেখানে অতিথি হয়ে এসেছেন!'

'এসেছেন তো কী হলো?'

কল্পনা আমাকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দেয়: 'বোকো না, যাও। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও গে। নাটকটাও নিয়ো। পিসিমা, কোনো থিয়েটারওয়ালা কি ফিল্‌ম-ডিরেক্টর কাউকে গেরেপ্তার করেছেন, টের পাচ্ছো না?'

আমি লাফিয়ে উঠলাম তৎক্ষণাৎ। এরকমটা হলে অবশ্যি আলাদা কথা—এবং তাহলে এপর্যন্ত পিসিমা সম্বন্ধে যা বক্রোক্তি করেছি তার প্রত্যেকটি কথা প্রত্যাহার করতে আমি প্রস্তুত। পিসিমা যদি কল-কৌশলে কোনো হোমরা চোমরাকে পাকড়ে আমার নাট্যকারু

সম্পর্কে থিয়েটার ও সিনেমাজগতের এতাবৎ শোচনীয় মন্তব্য পালটে দিতে পারেন, তাহ্‌লে এত খরচ করে কষ্ট স্বীকার করে শিলং যাওয়ার মজুরি পুষিয়ে যায়—নিঃসন্দেহেই।

শিলংয়ের সুশোভন দৃশ্যপট দেখতে দেখতে বিকেল নাগাদ তো পিসিমার আবাসে পৌঁছানো গেল। দরজায় পৌঁছে, নিজেদের আমরা টান করে নিলাম, কৃষ্টিসুলভ দৃষ্টি এবং কৃচ্ছ্রসাধ্য উজ্জ্বল এক প্রস্থ হাসি উভয়ের মুখে জোর করে ফুটিয়ে তুললাম। বৈকালিক চা-পানে নিযুক্ত হোমরাও চোমরাও লোকের সামনে ঝোড়ো কাকের মত অনাথ আতুররূপে উপস্থিত হয়ে তো কোনো লাভ নেই।

কিন্তু হোমরাও চোমরাও কেউ ছিল না সেখানে। আরো খারাপ, চায়ের কোনো ব্যবস্থাও না। তবু পিসিমা সেখানে ছিলেন। এবং দর্শনমাত্র প্রথম কথাই তিনি পাড়লেন:

'নাটকটা এনেছো ?'

'নিশ্চয়, কিন্তু কোথায় তোমার—'

'পড়ো, শুনি আগাগোড়া।' হুকুম হোলো তাঁর।—'পড়ে শোনাও আগে।'

অগত্যা, আমি পড়ে গেলুম—মায়, প্রস্তাবনা সমেত তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ, অসংখ্য দৃশ্য-উপদৃশ্যে বিভক্ত, পেল্লায় নাটকটা এক নিঃশ্বাসে আগাগোড়া পড়ে যেতে হোলো।

বইটা পড়বার সময়ে দু একটা চাপা হাসি আমার কানে এসেছিল—পিসিমার হাসিই—তৎক্ষণাৎ আমি চোখ তুলে তাকিয়েছি। কিন্তু পিসিমার বক্র হাস্য নজরে ঠেকতেই ব্রীড়ায় চোখ নামিয়ে নিতে হয়েছে।

অবশেষে নাটকের যবনিকা পডলো। কষ্টদায়ক একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতে থাকলো ঘরের মধ্যে। এই নিস্তব্ধতা স্বভাবতই যে কোনো নাট্যকারের পক্ষে নিরুৎসাহজনক।

'আমি ভেবেছিলাম নাটকটা খুব গুরুগম্ভীর হবে।' পিসিমাই স্তব্ধতা ভাঙলেন: 'আদর্শমূলক কিছু হবে। তা নয়। নেহাতই হালকা ব্যাপার।'

'আমি ইচ্ছে করেই এটা হাস্যকর করেছি।' বললাম আমি: 'যাতে মানুষ তাব এত দুঃখের মধ্যেও একটু হাসতে পায, হালকা হতে পারে, স্ফূর্তি পায় খানিক—সেই জন্যেই।'

'তাতে লাভ ?'

'মনের আনন্দে লিখেছি—অপরকে আনন্দ দেবার জন্যেই! লাভালাভ খতিয়ে টাকার জন্য লেখা নয়তো।'

'সেকথা ভালো।'

পিসীমার কণ্ঠস্বরে এবার যেন একটু আশ্বাস মিললো। মনে হোলো বইটা নিতান্তই ব্যর্থ হবে না। বাংলার সুরুচিসম্মত আর কৃষ্টিসম্পন্ন দর্শকদের পাতে পড়বে হয়ত বা। এবং অর্থভাগ্য তেমন যদি নাও থাকে, যশের ভাগ জুটলেই আমার যথেষ্ট।

'টাকা না পাই না পাবো। আমার নাম হলেই হলো।' বললাম পিসিমাকে।

'হতে পারত নাম, কিন্তু হালকা জিনিস হয়েই মাটি করেছে।' বললেন পিসিমাঃ 'প্রথমতঃ, এর ইংরিজি অনুবাদ করা, শক্ত হবে,—'

'কেন, অনুবাদ আবার কিসের জন্যে ?'

'সৈন্যদের জন্যই। সম্প্রতি এখানে-আসা আমেরিকান সৈন্যদের আমোদিত করার জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে একটা ছোটখাট অভিনয়ের আয়োজন করেছি, বলিনি তোমায় ?'

'না তো!' আমি আকাশ থেকে পড়লাম—একেবারে হতাশ হয়ে।

'বলবার সময় পেলাম কই? তোমরা আসা অবধি তো বসে বসে এই ছাই পাঁশ শুনছি। এর মধ্যে ফাঁক পেয়েছি বলবার ?' উল্টে পিসিমারই অভিযোগ শুনতে হলো।

নাট্যকার-জীবনে এহেন কঠোর সমালোচনা অলভ্য নয়, ঘরে-বাইরে চার ধার থেকে কতোই শুনতে হয়েছে, —নাটকের প্রতি আঘাত নিজের প্রতি আঘাত বিবেচনা করলেও একেবারে ভেঙে পড়লাম না। কেবল নাট্যকারেরাই এই অদ্ভুত ক্ষমতা রাখে—ভেঙে না পড়বার ক্ষমতা। তাহলেও বেশ একটু মচকে যেতে হলোঃ 'তা হলে তুমি বলছো সৈন্যদের জন্য এটা চলতে পারে ?'

সৈন্য সৈন্যই সই। যেখানে হোক, যেকেউ হোক—আমেরিকান, চীনেম্যান, নিগ্রো যেই হোক, কারো না কারো চক্ষুকর্ণে এই পরমাশ্চর্য জিনিস লাগুক্ এই আমার আকাঙ্ক্ষা।

'ভেবে দেখি। আমার ধারণা ছিল আদর্শমূলক হবে তোমার বইটা—যার ছত্রে ছত্রে ভারতের নিজস্ব ভাবধারা তর তর বেগে বয়ে গেছে—এমন কিছু। বিদেশী সৈনিকদের কাছে তা ছাড়া কী আমরা দেখাতে পারি ? আমাদের কাছে আর কী পাবার ওরা প্রত্যাশা রাখে ?'

'বেশ, আমি এটাকে শুধবে গুরুগম্ভীর বানিয়ে দিচ্ছি। ভারতেব যত মৌলিক ভাবধারা এনে ফেল্‌ব—একেবারে মূল উপড়ে—যার মূল্য হয় না। উপনিষদের থেকেও হ্যাঁচকা টান দেব, রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীর থেকেও নেব কিছু। তারপর আমাদের বিবেকানন্দ তো পড়েই আছেন। সবার নিয়ে, সব মিলিয়ে একটা জগা-খিচুড়ি পাকাতে কতক্ষণ ? তবে আমাকে সময় দিতে হবে। এটা লিখতে ছ হপ্তা লেগেছিল ; মাস খানেক অন্ততঃ দিতে হবে আমায়। তবে লেখার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি অনুবাদ করে যেতে পারো।'

'পাগল ! তা হয় না। অত সময় হাতে নেই। আমেরিকান সৈন্যরা কি তোমার নাটকেব জন্যে বসে থাকবে এখানে? তারা সবে এসেছে—কয়েকদিন থেকেই কোথায় ফের চলে যাবে, তার কিছু ঠিক নেই। কাল থেকেই আমাদের রিহার্সাল শুরু।'

'তাহলে জানাশোনার মধ্যে যে সব মারাত্মক নাটক রয়েছে—বঙ্গে বর্গী কি চন্দ্রগুপ্ত কি মিসরকুমারী—ওরই একটা নিয়ে—লাগিয়ে দাওনা ?'

'অসম্ভব। সত্যিকারের লেখকরা বইয়ের অভিনয়ের জন্য টাকা চেয়ে থাকে—তাদের রয়্যাল্‌টি দিতে হয়।' পিসিমা দ্বিতীয়বার আমার হৃদয়ে আঘাত হানলেন।

'সৈন্যদের জন্যেই হবে যদি গ্যারাণ্টি দাও তাহলে হয়তো না চাইতেও পারে।'

'আমি কিছু গ্যারাণ্টি দিতে রাজি নই। দাঁড়াও না, আগে তো পার্টগুলো কাকে কী দেয়া যায় ঠিক হোক। তারপরেই টের পাবে।'

পরদিন প্রভাতে স্থানীয় অভিনয় শিল্পীরা পিসিমার কুটিরে সমবেত হলেন। যে সময়ে নেপথ্যে দাঁড়িয়ে নাট্যকার-সুলভ লজ্জায় আমি লাল হয়ে উঠছি, পিসিমা তাদের কাছে আমার নাটকটির পরিচয় দিতে লেগেছেন। বইটার অখাদ্যতার জন্য যথেষ্ট মার্জনা ভিক্ষা করে অবশেষে বললেনঃ 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। এইটেকেই কোনো রকমে কেটে-ছেঁটে খাড়া করতে হবে। নাট্যকার বলেছেন নিজেই সেসব ঠিক-ঠাক করে দেবেন—আজে বাজে সবকিছু বাদ দেবার সাথে সাথে একটা আদর্শমূলক মতবাদও এনে ফেলবেন ভরসা দিয়েছেন।'

তারপর পিসিমা—তাঁর স্বভাবসুলভ দক্ষতায়—নিজেকেই প্রযোজক, রঙ্গমঞ্চেব কর্তা, অভিনয়-শিক্ষক, সর্বাধ্যক্ষ এবং কার্যকরী-সমিতি নিযুক্ত করে—স্বয়ং একাধারে সমস্ত হয়ে উপস্থিত প্রতিভাদের ভেতর থেকে অভিনেতা নির্বাচনে অগ্রসর হলেন।

সমস্তদিন ধরে বিদ্যুৎবেগে কাজ চলল। আমি বইটার হাস্যকর খোসালো অংশ বাদ দিয়ে জিনিসটাকে শাঁসালো করতে থাকি, পিসিমা সঙ্গে সঙ্গে বিলিতি বাক্যে রূপান্তরিত করেন আর কল্পনা তক্ষুনি তক্ষুনি টাইপ রাইটারে একসাথে একাধিক কপি বানিযে চলে। সন্ধ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ বইটা দাঁড়িয়ে গেল—হাত-পা-মাথাকাটা কোমরভাঙা কোনো কিছুর পক্ষে যতটা দাঁড়ানো সম্ভব।

নাট্যকাররূপে আমার গৌরবলাভের আশা যখন রইল না, তখন অভিনেতারূপে চেষ্টা দেখলে কেমন হয়? অভিনয়ও আমি করতে পারি, আমার ধারণা [illegible] পাবেন। কিছু তাঁদের অসাধ্য নয়। আমি একবার এক নাট্যকারকে এক গ্রীনরুমে এক অভিনেত্রীর পা টিপতে দেখেছিলাম—সেটা তখন তিনি অভিনয়ই করছিলেন। কল্পনার কাছ থেকে একটা কপি হাতিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি।

'কী! মৎলব কী?' জানতে চান পিসিমা।

'আমি ভাবছি নায়কের ভূমিকাটা আমিই নেব।'

'অন্য কিছুর চেষ্টা দ্যাখো।' বললেন পিসিমা। 'স্থানীয় লোকদের উৎসাহিত করাই আমার উদ্দেশ্য—নিজের ঘরের লোকদের না। এটাকে আমি ঘরোয়া ব্যাপার বানাতে রাজি নই। তাছাড়া, তোমাকে সিন্‌সিফটারের কাজে আমার দরকার।'

এবারে আমি ভেঙে পড়লাম। নাটকের উরু ভেঙ্গেও আমার গুরুতর হানি হয়নি কিন্তু এবার—নাঃ, এই হচ্ছে উটের বোঝার ওপর খড়েব শেষ আঁটি—খরতর আঘাত। এবং নিজের পিসিমার নির্দয় হাত থেকে। ভাবতেও দুর্বিসহ। একবার এক অ্যামেচারী পালায় সিন্‌সিফটার সেজেছিলাম, ও কাজ যে কতো ঝক্‌মারির তা আমার অজানা না—কাজেই আবার সে পাল্লায় পড়তে হবে ভাবতেই আমি উটমুখো হয়ে উঠি।

আমাকে বাতিল করে দিয়ে পিসিমা স্থানীয় সজ্জনদের একজনকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'আপনি কোন্ পার্টটা নিতে চান বনমালীবাবু?'

'বিদূষক।' বনমালীবাবু বললেন।

'কিন্তু এ বইয়ে তো কোনো বিদূষক নেই।' কাতরকণ্ঠে আমি প্রতিবাদ করি।

'আমার বিদূষকের পার্ট আমার নিজেরই বানানো আছে।' সগর্বে জানালেন বনমালীবাবু : 'মুখস্তই রয়েছে আমার। ইস্‌টেজে দাঁড়িয়ে তাই গড় গড় করে আউড়ে যাব।'

'বেশ, বিদূষকের পার্টই রইলো আপনার। প্রত্যেক দৃশ্যের আরম্ভে বিদূষক হয়ে আপনি সেইটে স্বগতোক্তি করবেন। ইংরেজিতে করবেন। ভালোই হবে বেশ।' বললেন পিসিমা।

এবং তারপরে আরো ভালোও হলো, হতে থাকলো। অভিনেতাদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বইটাকে আরো যতদূর বেখাপ্পা করা যায় করা গেল। উচ্চাঙ্গের নাট্যকারিতা এবং সূক্ষ্ম কলাজ্ঞান নিয়ে এই আমাকেই করতে হলো সেই সব। কেবল বিদূষকই নয়, সকলের সখই মেটালাম। একজোড়া বাদশা-বেগমকেও ঝম্‌ঝমাঝম করে বইয়ের মধ্যে এনে ফেললাম। এবং সেই দ্বৈত সঙ্গীতেও কূল পাওয়া গেল না, চন্দ্রগুপ্ত থেকে চাণক্যের একটা দৃশ্যও টেনে আনতে হলো। নতুন ম্যারপ্যাঁচেই। (পিসিমা সকলের ঐক্য চান কি না! এবং) সেখানেই ফুরোলো না, একটি ছোট মেয়ের সুবিধার জন্য 'ছোটিসে দুনিয়ারে!' বলে বেশ মোটাসোটা একটা হিন্দি গান ধরে পাকড়ে নিয়ে এসে নাটকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো।

এবং ঠিক হলো সাদা বাংলাতে অভিনয় করাই সিধে হবে। বিদেশী সৈনিকরা যত বুঝতে পারবে না ততই বেশি আপ্যায়িত হবে, আর ততই আমাদের উচ্চ আদর্শ তাদের অভিভূত করবে। অতএব, সমস্ত বইটা আবার নতুন করে বাংলায় অনুবাদ করার ভার পড়লো আমার উপর।

করে দিলাম। অনুবাদ করতে গিয়ে আনকোরা আরেক নাটক হয়ে দাঁড়াল—তা হোক্! এদেশী বেড়ালই কাবুলে বেড়াতে গেলে কাবুলিবেড়াল হয়ে যায়, তারপর ঘুরে ফিরে ফের বাংলায় এলে ম্যালেরিয়ায় ভুগে কাঠবেড়াল হয়ে পড়ে কে না জানে? নাটকের পরাকাষ্ঠা দেখে আমাকেও কাঠ হয়ে যেতে হলো।

তারপর কয়েকদিন ধরে রিহার্সাল চলবার পর কৃষ্ণকান্তি বাবু বললেন: 'আচ্ছা বইটা কোথায় আমরা ষ্টেজ করব, শুনি?'

একটা কাজের কথাই তিনি বল্লেন, এতদিনে।

'কেন, এখানকার টাউন হলে।' বল্লেন পিসিমা : 'তাছাড়া আর কোথায় হবে?'

'তাহলে টাউন হলটা রিজার্ভ করে' ফেলুন আগে। প্রত্যহই যেরকম সভা সমিতির হিড়িক চলেছে তাতে সহজে ও জায়গা খালি পাওয়া যায় না। একটা তারিখ নিয়ে রাখুন আগের থেকে।'

আমি দেখলাম এই সুযোগ। সিন্‌সিফ্‌টারের দায় থেকে রেহাই পাবার এই ফাঁক। অমনি বেঁকে দাঁড়ালাম : 'কবে তোমাদের টাউন হল পাওয়া যাবে তদ্দিন এখানে বসে থাকা আমার পক্ষে পোষাবে না। আমার অনেক কাজ কলকাতায়। জরুরী কাজ যত। এই শনিবারই আমায় যেতে হবে।' বলে দিলাম পিসিমাকে।

'তাহলে এই শুক্রবারটাই ঠিক করে ফ্যালো। যাও, এক্ষুনি টাউন হলের কর্তাদের সঙ্গে কথা কয়ে ঠিকঠাক করে এসো গে।'

আমার ওপরেই পিসিমা ভার চাপান, বিশ্বের যত ভার—ভারবাহী এই একমাত্র কাঁধের ওপর।

কথা কইলাম গিয়ে। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গেই কথা কইতে হলো। শুনতে না শুনতেই ভয়ঙ্কর ঘাড় নাড়তে লাগলেন তিনি।

'অসম্ভব। একেবারে অসম্ভব। আমি ভারী দুঃখিত। এই শুক্রবার তো হয় না। শুক্রবার কেন, সারা সপ্তাহে এবং আগামী সপ্তাহেও একদিনের জন্যেও টাউন হল খালি নেই। এবং বলতে কি, সৈন্যরাই এই শুক্রবার ওটা নিয়ে রেখেছে।'

'বটে?'

'আমেরিকান সোলজারদের একদল ছেলে আমোদ প্রমোদের পক্ষপাতী। স্থানীয় লোকদের আনন্দ দেবার জন্যে 'আমেরিকান তামাসা' বলে কী একটা পালা তারা দেখাবে। একটা খুব চটুল, হালকা, হাসির জিনিস—যদ্দুর আমি টের পেয়েছি—'

এবার আমার হাসি পায়। হাসি পায়। হাসি পায় সত্যিই। আমার প্রাক্তন নাটকের সমস্ত হাসি আমাকে পায়।

'ভালো কথা, একটা কথা মনে পড়লো—' চেয়ারম্যানের চেহারা মুহূর্তের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেঃ 'আপনারাও সৈন্যদের আনন্দ দিতে চান, তাই বল্লেন না? ওরা আনন্দ চায় না। যথেষ্ট আনন্দেই আছে, তবে এই অভিনয়ের ব্যাপারে একজন ওস্তাদ লোকের দরকার ছিল ওদের, বলছিল ওরা। সেদিক দিয়ে সম্ভব হলে আপনি ওদের একটু সাহায্য করুন না? করবেন? আঃ, বড় খুশি হলুম। না, না, অভিনয় নয়, সে সব না, এই সিন্‌সিফটারের কাজ শুধু। সামান্য কাজ, এমন কিছু কষ্টকর না, দুঃসাধ্যও নয়, কিন্তু এর জন্যে লোক পাওয়া মুস্কিল। কী বলে আপনাকে যে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো। আমার একান্ত আন্তরিক ধন্যবাদ।'

চার

দশশালা বন্দোবস্তে বাংলাদেশের যে বেজায় ক্ষতি হয়েচে তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না, আমার এক শালার ব্যবহারেই তা বোঝা যায়। শালা যে কী চীজ আমি তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। একজনের ধাক্কায় আমার একলার যা দুর্দশা করেছে তার পরিমাণকে দশগুণ বাড়িয়ে দশজনার পরিণাম খতিয়ে বার করা খুব কঠিন নয়। এমন কিছু শক্ত আঁক না।

তাহলে, গোড়া থেকেই শুরু করা যাক্—

'এই যে, সুচিত্র যে! এমন হঠাৎ?—' আমার উচ্চস্বরে অভ্যর্থনা অথবা অভিযোগ, কী প্রকাশ পায় বলতে পারিনেঃ 'আপিসের ছুটি-টুটি না কি?'

এই সকালে আর এমন অকালে বিনা নোটিশে সুচিত্রব আবির্ভাব আমার বিচিত্র বলেই মনে হয়।

ওর আসা-যাওয়া, প্রায় ধূমকেতুর মতই, এতই কখনো কদাচ যে, কল্পনাকেও একটু ভাবিত না করে পারে না।

'বাড়ির খবর সব ভালো তো দাদা?' জিজ্ঞেস করে ও।

'বাড়ি? বাড়ির খবর? যদ্দুর ভাল হতে হয়।' সুচিত্রব একমুখ উত্তর ঃ 'সত্যি বলতে, বাড়ির কোনো খবর নেই। বহুদিন ধরে' পাইনি। তার মানে অবশ্যই যে, খবর ভালোই; খারাপ কিছু হলেই খবর আসতো, কিন্তু সেকথা না—'

বলতে বলতে সুচিত্র, আমাদের মাঝখানে, আমাদের প্রান্তরাশেব মধ্যস্থলে নিজেকে স্থাপিত করে। রাশীকৃত হয়।

'আমার সময় বেশি নেই। তোমরা যদি খাওয়া দাওয়ার জন্যে খুব বেশি পীড়াপীড়ি লাগাও তাহলে এক্ষুনি আমায় উঠে পড়তে হবে। ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়েছি। সাড়ে আটটার ট্রেন ধরতে হবে আমায়'—বলতে বলতে ও জাঁকিয়ে বসে।

ওর কথায় ভরসা পেয়ে, কিঞ্চিৎ আশ্বস্তিতে, দুখানা টোস্টের অন্দরে একখানা পোচকে সুবিন্যস্ত করে' প্রায় মুখে তুলবার মত পরিপাটি করে' তুলেচি, সুচিত্র চকিতের মধ্যে হাত বাড়িয়ে সেই টোস্ট আর পোচের হরিহরাত্মাকে আয়ত্তে এনে নিজের অম্লানবদনে পুরে দ্যায়—

'বাঃ, তোমার টেষ্ট আছে হে, চকর্‌ববৃতি! বাঃ!' রোমন্থনের সাথে সাথে সে জানায়ঃ 'বাস্তাবিক, চক্কোত্তিদের যে রান্নাঘবের সম্রাট বলে সে কি সাধে? চক্কোত্তিরা মুসলমান হলে খাসা বাবুর্চি হতে পারে।' এবং এই বলে' সে অপরাপর টোস্ট-পোচদের ওপর পরের পর আক্রমণ চালায়। আর বলে যায় ঃ 'একটা চক্কোত্তি কাটলে দুটো বাবুর্চি বেরয়, কথাটা মিথ্যে নয়।'

'তোমার সাড়ে আটটার ট্রেন ধরা চাই—বল্লে না—?' সুচিত্র এবং দেয়ালঘড়ির দিকে যুগপৎ দৃষ্টি রেখে আমি মনে করিয়ে দিই। স্মরণ না করিয়ে পারিনে।

'তার বদলে সাড়ে দশটার ধরলেও ক্ষতি নেই।' সুচিত্র বলে।

'তবে—আর কি!' আমার হতাশ কণ্ঠস্বরে যদ্দুব সাধ্য আনন্দের অভিব্যক্তিদানের প্রয়াস থাকে।

'হ্যাঁ, যেজন্যে এসেছি আসল কথাই বলা হয়নি এখনো।' সুরু করে সুচিত্রঃ 'আপিসের ছুটির কথা জিজ্ঞেস করছিলে না? সেই ছুটির সম্পর্কেই আমার আসা।'

'তবে যে বল্লে ছুটি পাওনি?' পৃষ্ঠদেশের শেষ তৃণ-খণ্ডের জন্য অকাতরে অপেক্ষমান উটের মত আমি ওর উত্তরের প্রতীক্ষা করি। উটমুখের মতন।

'এখনো পাইনি বটে, তবে পাবো শীগগিরই। হপ্তাখানেকের ছুটি নেব ভাবছি—এই সামনের হপ্তায়।' সুচিত্র অচিরাৎ সব বিশদ করে দেয় ঃ 'আর সেই কারণেই তোমার কাছে এলাম।'

'আমার কাছে? আমার কাছে এসে ভুল করেছ ভায়া। আমি ডাক্তার কি কবরেজ

নই যে তোমাকে রেডিমেড-সার্টিফিকেট দিতে পারব। মেডিকেল সার্টিফিকেট-বিতরণকারী কোনো ডাক্তার কব্‌রেজের সাথে আলাপও নেই আমার। আমার কাছ এসে লাভ?'

বিতৃষ্ণ নেত্রে আমার প্রতি দৃকপাত করে' ও বলে—কল্পনাকেই বলে : 'এটা দিনকের দিন এমন হাঁদা হয়ে যাচ্ছে কেন রে? এটাকে তুই এতদিনেও মানুষ করতে পারিসনি দেখছি! একে কাটলে দুটো বোকা হয়। এমন কি, তেমন কায়দা করে' কাটতে পারলে তিনখানাও বার করা যায়।'

কল্পনা হাসতে থাকে, আমি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি।

অবিশ্যি, ঘোঁৎকারের চেয়েও, কঠোরতর ভাষায় আমি প্রতিবাদ করতে পারতাম, সুচিত্রর সঙ্গে আমার তথাকথিত মধুর সম্বন্ধ কটু-তিক্ত-কষায়ের যে-কোনোটায় রূপান্তরিত করতেও বিশেষ কোনো বাধা ছিল না, উক্ত রসান্তরণে যৎসামান্যই আমার যেত আসত কিন্তু কল্পনার হাসিতে আমাকে কাহিল করে দেয়। অগ্রপশ্চাৎ উভয় প্রদেশ থেকে অতর্কিতভাবে পরের দ্বারা আক্রান্ত হলে খুব পরাক্রান্ত লোকও বেসামাল হয়ে পড়ে।

'ছুটি আমার মঞ্জুর হয়েই আছে, সেজন্য কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না।' বিবস কণ্ঠে ও জানায় : 'সেজন্যে আমি ভাবছিনে। আমি ভাবছি যে ছুটিটা কাটানো যায় কোথায়। সবাই মিলে এই কটা দিন ফুর্তি করে' এক সাথে কাটালে কেমন হয় রে খুকি?'

'খুব ভালো হয় দাদা!' কল্পনা উল্লসিত হয়ে ওঠে : 'উঃ কী আমোদ যে হয় তাহলে!'

'কি বলগো, মজা হয় না খুব?' কল্পনা আমার দিকে তাকায়।

'তা—তা একটু হয় বৈকি।' আমি চেষ্টা করে' বলি : 'সুচিত্র যে মজাতে অদ্বিতীয়—কে না জানে?'

'কিন্তু তোমাদের এখানে এসে কাটাতে আমি চাচ্ছি নে তো।'

এখানে না? এতক্ষণে মজ্জমান আমার একটু আমেজ লাগে,—পিঠের তৃণদণ্ড অগাধ জলের তৃণখণ্ড হয়ে দেখা দেয়। অথই জলে ডুবে যাবার মুখে সেই তৃণটি ধরে আমি বলি : 'দুঃখের কথা! খুবই দুঃখের কথা! তোমার সঙ্গলাভ আমাদের পক্ষে যে কতটা প্রীতিকর তা তুমি জানো, কিন্তু তাহলেও অন্যায় আসঙ্গলিপ্সা ভালো না। ছুটির এই কটা দিন জোর করে' আর সবার আলিঙ্গন থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমরা উপভোগ করতে চাইনে। না, কল্পনা, না, ও যখন আমাদের এখানে এসে ছুটিটা কাটাতে রাজি নয়, তখন ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে উপরোধ কোরো না। স্বার্থপরের মত সেটা সত্যিই জবরদস্তি করা হবে।'

'আমাকে আধখানা কথাও কি কইতে দেবে আগে?' বিরূপ চক্ষের বিষাক্ত চাহনিতে সুচিত্র আমাকে বিদ্ধ করে : 'আমি কী মৎলব এঁটেছি তোমাদের বলি তাহলে। আমি বলছিলাম কি, আমরা সবাই মিলে ভবেশদের রিশড়ের ওইখেনে গিয়ে ছুটিটা কাটালে কেমন হয়?'

'হ্যাঁ, এটা মন্দ আইডিয়া না।' কল্পনা সায় দেয়।

ভবেশ আমাদের প্রতিবেশী এবং পরিচিত। রিশড়ের বাড়িটাও আমাদের অচেনা নয়। জানাশোনার মধ্যে বেশ লোক বেছে বেছে ভবেশরা বাগান-বাড়িটা ভাড়া দিয়ে

থাকে—অবশ্যি এক আধ হপ্তার কড়ারেই। আমরাও কয়েকবার সেখানে গিয়ে ফূর্তি করে' কাটিয়ে এসেছি।

'হুম্।' আমিও মাথা নাড়ি—'ভবেশকে বলে' দেখব। কী বলে শুনি। আমার ধারণা, আগামী সপ্তাহে ওরা নিজেরাই সেখানে বেড়াতে যাচ্ছে।'

'যাচ্ছে না। এখানে আসবার পথে ওদের বাড়ি হয়েই এলাম তো। ওকে বাজিয়ে এসেছি।'

সুচিত্রর কার্যপ্রণালী এই রকমই। সম্পূর্ণ নিখুঁৎ। ওস্তাদী হাতের সূচী-শিল্পের মতই সুচারু—সব কিছুই এফোঁড় ওফোঁড় করে' চলে যায়—তার সূচীভেদ্যতার ভেতর কোথাও ফাঁক রাখে না।

'প্রথম হিম পড়ছে, ঋতু পরিবর্তনের মুখে এই সময়ে কলকাতার বাইরে পা বাড়ানো কি ঠিক হবে?' আমি ইতস্তত করিঃ 'তার ওপরে আমার আবার সর্দির ধাত।'

'বেশ, এই শনিবারই আমাদের রিশড়েয় যাওয়া ঠিক হলো দাদা।' কল্পনা বলে। হাকিম যেমন হুকুম দিতে বসে আসামীর মুখাপেক্ষা করে না তেমনি অনায়াসে আমার মুখের দিকে না তাকিয়ে অম্লানবদনে বলে দ্যায়।

'বাঃ, লক্ষী মেয়ে, খাসা মেয়ে! চমৎকার মেয়ে তো একেই বলে—বাঃ!' সুচিত্রর কলকলধ্বনি শুনিঃ 'বেশ ভালোই হলো। ঐ সাথে তোমরা যদি তরফদারকেও সঙ্গে নাও, আরো ভালো হয় তাহলে। গোবিন্দ আমার প্রাণের বন্ধু, জানো তো? তরফদারকে নিমন্ত্রণ করতে কি তোমাদের কোনো আপত্তি আছে?'

'না, না, আপত্তি কিসের? তোমার বন্ধু আসবেন—সে তো সুখের কথাই।' কল্পনাই জবাব দেয়।

'কিন্তু তাঁর তো আর ছুটি হয়নি—তাঁর কি নিজের কাজকর্ম নেই?' আমিই মৃদু আপত্তি জানাই, অবিশ্যি তরফদারের তরফ থেকেই।

'গোবিন্দ? সে ক্যাজুয়াল লীভ নিয়ে বাড়িতে বসে আছে। টেলিফোন ক'রে খবর নিয়েছি আমি। এখানে আসবার মুখে একটু আগেই ওকে বাজিয়ে এসেছি।'

'আহা, যখন এত লোককেই গায়ে পড়ে বাজিয়ে এসেছ, বাদ দাওনি কারুক্কেই, তখন একটু কষ্ট ক'রে ঐ সাথে আমার ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকেও কেন বাজিয়ে এলে না? দয়া ক'রে আগামী সপ্তাহে যদি কিছু ওভারড্রাফট দিতো আমায়?' এতক্ষণে আমারো একটু ঝাঁঝ দেখা দেয়।

'তোমার মেজাজটা আজকাল এমন তিরিক্ষে মেরে যাচ্ছে কেন হে? মনে হচ্ছে হাওয়া বদলানোর দরকার। রিশড়েয় কটা দিন কাটিয়ে এলে তোমার উপকার হবে।' বলতে বলতে সুচিত্র উঠে পড়েঃ "আমি চললুম এখন। সেই রিশড়েতেই মিশব তোমাদের সঙ্গে। কেমন?'

ঘূর্ণি হাওয়া চলে যাবার পর, ধ্বংসস্তূপে বিমূঢ় হয়ে পড়লেও মানুষ যেমন একটা অবর্ণনীয় স্বস্তি পায়, চারিধারের নষ্টাবশেষের থেকে অবশিষ্ট নিজেকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা

করে, আমি সেই মানসিক প্রয়াসে লিপ্ত, কল্পনা আমার তন্ময়তায় বাধা দিয়ে বলে ওঠে :

'আচ্ছা, হ্যাঁগা, দাদা তটিনীর কোন কথা তুলল না যে ? এটা যেমন একটু কেমন-কেমন না ?'

'হয়তো অন্য তটিনীতে পাড়ি জমাচ্ছে আজকাল। আর কোথাও খেয়া বাইছে! দিলেই হলো, খেয়ালী তো!'

'উঁহু, তটিনী বলতে দাদা অজ্ঞান। এ হতেই পারে না। তটিনীকেও তাহলে নেমন্তন্ন করা যাক, কী বলো ? তাক লাগিয়ে দেয়া যাবে দাদার, কেমন না ?'

'সে কথা মন্দ নয়।' আমি বলি। নিস্পৃহ কণ্ঠেই বলি।

ওর বেশি জোরালো সায় দিতে সাহস হয় না আমার, তবু এতক্ষণে, বলতে কি, সত্যিই আমার মন্দ লাগে না। ঊষর মরুভূমির মাঝখান দিয়ে তটিনী প্রবাহিত হওয়াটা মন্দ কী? অবগাহনের তেমন আশা না থাকলেও—পাড়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতেই—এমন কী খারাপ ? মিশকালো মেঘের রূপালী পাড়রা দেখা দিতে থাকে একে একে—এতক্ষণে।

অবশেষে আগামী সপ্তাহ এল। আমরা এলাম রিশড়েয়। ভবেশের বাগান বাড়িতে। হিমেল হাওয়া এল, হিম আসতে লাগল, ভয়ানক ঠাণ্ডা এসে পড়ল—কিন্তু সুচিত্রব আর দেখা নেই।

হিমেল হাওয়ার হাত ধ'রে সর্দি এল, কাশি এল, আমার পুরাতন হাঁচিরা এসে পড়ল, আধিব্যাধিদের যারা যারা আসবার এই সুযোগে একে একে এসে গেল, কেবল সুচিত্র এল না। অবশেষে 'আগামী সপ্তাহ' কাবার হয়ে আরেক শনিবার ঘুরে এল।

'সুচিত্রর একি লীলা ? বুঝতে পারছিনে তো।' কল্পনাকে আমি প্রশ্ন করি। আমার পায়ের কাছে তিন তিনটে গরম জলের বোতল, গলাগলি করে আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। গলায় উলের কম্ফর্টার, আর গায়ে জড়াজড়ি যত রাজ্যের লেপ। লেপের ওপরে লেপের প্রলেপ।

'ছুটি পায়নি বোধ হয়।' কল্পনা সাফাই দিতে চেষ্টা করে।

'তাহলেও তার করে জানানো উচিত ছিল তার। জলপাইগুড়িতে জলপাই আছে কি না জানিনে, তবে টেলিগ্রাফ অফিস আছে, যদ্দুব আমার জানা।'

'এখনো তো রয়েছে একটা দিন। কাল হয়ত আসতে পারে। দেখা যাক না।'

কিন্তু না, কালও সে এল না। আবার আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। সর্দি কাশি হাঁচিরা সাথে সাথে এল, সেই সাথে আরো ঢের খাঁটি জিনিস আমদানির সম্ভাবনা দেখা গেল। আজ্ঞে হ্যাঁ, নিউমোনিয়া পর্যন্ত প্রায় এসে পৌঁছল, কিন্তু আমাদের ওল্ড্ ম্যানিয়া—সেই আমার শ্যালকরত্ন এল না।

আদা-গোলমরিচ-তেজপাতা-মিশ্রির গরম ক্বাথ পান করছি, সন্ধ্যে হব-হব—এমন সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল।

গেলাসটা নামিয়ে, কম্বল জড়িয়ে, দুই ঘাড়ে দুই বালিশ সম্বল করে' স্খলিত পদে টেলিফোনের জবাব দিতে গেলাম।

'কি হে, বোকচন্দর!' সুচিত্রর গলা: 'বলি, আছো কেমন?'

'কে? সুচিত্র নাকি? কিরকম তোমার ব্যাভার বলো তো? সাত দিন ধরে' আমরা সেখানে—আর তোমার দেখা নেই?'

'আমার দেখা? তার মানে? আমি যে দেখা দেব সে কথা কখন বললুম?—' সুচিত্রও বিস্মিত গলা বাড়ায়: "ওখানে যে আমি যাব কক্ষনো তা তো আমি বলিনি। ঘুণাক্ষরেও না। আমার মতলবটা নিশ্চয়ই তোমরা—তুমি অন্ততঃ—আঁচ করতে পেরেছিলে?'

জবাবের ছলে কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম, বলতে গিয়ে হেঁচে দিলাম। হাঁচিরা পরম্পরায় এসে আমার বাক্যব্যয়ে বাধা দিল—কিন্তু ওর পক্ষে সবই সমান। আমার বক্তব্য বুঝতে তাতে ওর কিছু অসুবিধা হলো না।

ও বললে: 'বুঝেছি। আর বলতে হবে না। গোবিন্দটা গিয়েছিল?'

'তরুণদার! নিশ্চয়! সে তো অবাক হয়ে গেছে। তুমিই তাকে আহ্বান করে এনে এভাবে বিসর্জন দেবে সে ভাবতে পারেনি। মতলবটা কী ছিল তোমার শুনি।'

'একদম তুমি আঁচতে পারোনি? বলো কী? বিন্দু-বিসর্গও না? আচ্ছা আহম্মক্ তো! তোমরা কি ভেবেছিলে যে জলপাইগুড়ির জোয়াল থেকে এক হপ্তার এই মুক্তি রিশড়ের মাঠে মারবার জন্যেই আমি ক্ষেপে রয়েছি? যেকালে কি না নিষ্প্রদীপের স্বল্প আলোকে কলিকাতা মহানগরী আরো ঢের রহস্যময়ী হয়ে বাহু বাড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন? তুমি দেখছি একটি নির্জলা বোক্‌চৈতন!'

'তাহলে এত কাণ্ড ক'রে এই সব বাগানপার্টির মানে? এসব ঠিকঠাক করার উদ্দেশ্য?'

'উদ্দেশ্য আছে বইকি বন্ধু! গোবিন্দকে আমার পথ থেকে সরানো। যাতে আমি অবাধে তটিনীকে নিয়ে বয়ে যেতে পারি। একটু বোকা যদিও, গোবিন্দটা লোক মন্দ না। কিন্তু একটা ওর মহদ্দোষ, তটিনীর ওপরে ঝোঁক। ওরও ঝোঁক। এইটেতেই ওকে মাটি করছে। এই হপ্তাখানেকের ছুটির সুযোগে ওর আড়ালে তটিনীর সঙ্গে একটা পাকাপাকি ক'রে ফেলার আমার মতলব ছিল। ভেবেছিলাম, গোবিন্দটা যখন তোমাদের সঙ্গে রিশড়ের মাটি চষবে, সেই ফাঁকে আমি তটিনীকে নিয়ে, চাই কি, গোধূলি লগ্নে একেবারে অটস্থ হয়েও যেতে পারি। এই সব কারণেই, গোবিন্দকে সরানোর দরকার ছিল আমার। তোমরা যে আমার এত বড় একটা উপকার করেছ তার জন্য আমি চরিতার্থ—চিরকৃতজ্ঞ। গোবিন্দকে হটাবার জন্যে তোমাদের অজস্র—অজস্র—'

টেলিফোনের পরপার থেকে ওর ধন্যবাদমুখরতা উদ্বেল হয়ে ভেসে আসে। সমস্তটা আমি নীরবে হজম করি, জীর্ণ করতে বেশ একটু লাগে বৈ কি! তারপরে ঢেঁকুর তুলে বলি:

'তাহলে এই কটা দিন বেশ ফুর্তিতেই কেটেছে, কী বলো? মতলবও হাসিল নিশ্চয়?

তটিনী, তুমি আর গোধূলি—তিনজনে মিলে ত্র্যহস্পর্শে ত্রিবেণীসঙ্গম বাধিয়ে ফেলেছ, আশা করি?'

'নাঃ, দুঃখের কথা বলব কী ভাই!' দুঃখের সঙ্গে সুচিত্র জানায়ঃ "ট্রেন্ থেকে শেয়ালদায় নেমেই, ফোন করে খবর পেলাম, তটিনী কোথায় নাকি কয়েকদিনের জন্যে উধাও হয়েছে—ওর কোন মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গেছে নাকি কোথায়! ওর বাড়ি থেকেই বললে। কিন্তু কোথায় যে গেছে বাড়ির কারু জানা নেই। বন্ধু মেয়েটার নামও কেউ বলতে পারল না। কী করি, কোথায় কোথায় আর কার কার সঙ্গে যে ও যেতে পারে তার তালিকা নিয়ে খোঁজাখুঁজি করে ওকে খুঁজে বার করতেই গোটা হপ্তাটা আমার হাওয়া হয়ে গেল।'

'বার করতে পেরেছো তো?' আমি বলিঃ 'গোধূলিকেও শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাতে পেরেছ নিশ্চয়?'

'উঁহঃ!' বিদীর্ণ কণ্ঠস্বর সুচিত্রর। —'গোধূলির কথাটা বার বার বোলো না, প্রাণে ব্যথা পাচ্ছি।' অনেক মাইল লম্বা ওর দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার কানে লাগে।

'আহা, আমাদের রিশড়ের বাগানবাড়িতে ভুলক্রমেও আসতে যদি একবার—' আমিও সখেদে বলিঃ '—এসে পড়তে যদি!'

'য়্যাঁ? তার মানে?'

'অবিশ্যি, তুমি না আসায় গোবিন্দ আর তটিনীর যে বিশেষ অসুবিধা হয়েছে একথা আমি বলতে পারব না—'

'বলছ কী তুমি?' সুচিত্র বাধা দিয়ে বলে। ওর সূচীভেদ্য স্বর যেন বিঁধতে থাকে আমায়।

'তটিনীর প্রতি তোমার টানের কথা তো কল্পনা জানে। ওকে নেমন্তন্ন করাব কথা বলতে তুমি হয়ত ভুলে গেছ এই ভেবে সে নিজের থেকেই তটিনীকে ডাকিয়ে এনেছিল। এবং তারপরে এই দিন সাতেক—এতগুলি দিনের একান্ত আওতায়—তটিনী কোন খাতে যে বয়ে গেছেন,—যাক্ গে,—যেতে দাও, পরচর্চায় লাভ কী? ওসব পরেব কথায় পরীর কথায় আমাদের কাজ কি ভায়া—'

রিসিভার নামিয়ে রেখে, বালিস্ ঘাড়ে, কম্বল গায়ে, নড়বড় করতে করতে, আমাব ইজিচেয়ারে, গরম জলের বোতলদের পাশে, গেলাসের সেই ক্বাথের কাছে আবার এসে কাত্ হই।

ভেবে দেখলে, প্রেমের ফাঁদ তো চারধারেই পাতা—ভূমণ্ডলের কোথায় নেই? যথাস্থানে আর উপস্থিত মুহূর্তে, বোকার মত, ধরা দিলেই হয়। তা না করে বিধাতার ওপরে টেক্কা মেরে নিজের চেষ্টায় বিশেষ করে সেই ফাঁদ পাততে গেলে যা হয় তা কোন কাজের হয় না। মাঝখান থেকে উক্ত পাতানো ফাঁদে অবাঞ্ছনীয় লোকেরা অযাচিতভাবে জড়িত হয়ে, সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়া এবং মানসী ইত্যাদির অভাবিত মিলনে জর্জরিত হয়ে পড়ে। ইজিচেয়ারে তেরছা হয়ে শুয়ে কঠোপনিষদের এই সব কঠিন তত্ত্ব মানসচক্ষে দর্শন করি।

তবু, তাহলেও, এতক্ষণে অনেকটা ভালো লাগে। ঢের সুস্থ বোধ করি। ঠাণ্ডা যেন বহুৎ কমে গেছে—নিউমোনিয়ার উপসর্গগুলোও যেন এর মধ্যেই উপে যাচ্ছে মনে হয়। আরাম পাই, ক্রমশই চাঙ্গা হতে থাকি।

পাঁচ

সমুদ্রের তীরে, এমন একটি অপরাহ্নে অপর এবং অন্যের কথা মনে ঠাঁই পাই না। প্রত্যহের কোলাহল—প্রতিদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে এখন আমি হাজার হাজার মাইল দূরে। মাইল না বলে কিলোমিটার বললেই ঠিক হবে বোধ করি—ছুটির অবকাশ জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রের প্রাত্যহিক অপমৃত্যু থেকে পলায়ন ছাড়া আর কী?

আমার সামনে অনতিদূরে ওই উত্তাল সমুদ্র—আর চারিধারে ধূসর বালুর ধূ ধূ বিস্তার! তার মাঝখানে আমার ডেক্ চেয়ারে আমি আরামে সমাধিস্থ—কল্পনা কখন ফিরবে সেই কল্পনাতেই বিভোর হয়ে রয়েছি মনে হয়।

স্বর্গদ্বারে তার এক সখীর সঙ্গে আলাপ করতে সেই যে উনি গেছেন, এখনো ওঁর দেখা নেই। অগত্যা আমি বেচারী কী আর করি? বিরহ-দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে মুহ্যমান হয়ে মশগুল হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছি।

সূর্যের ডুব দেবার খুব দেরি নেই। আমিও খবরের-কাগজের মধ্যে ডুবে। সমুদ্রে সূর্যাস্ত ওরফে সূর্যাস্তের সমুদ্র শুনেছি দেখবার মতো একটা জিনিস,—দৃশ্যাহিসাবে অতিশয় বিরল বলে নাকি! প্রকৃতি-রসিকরাই বলে থাকেন।

কিন্তু কেন বলা যায় না, কাঁচা পেয়ারা থেকে শুরু করে পৃথিবীর অনেক ভালো জিনিসই আমার কাছে তেমন পেয়ারের নয়! ধাতে কেমন বরদাস্ত হয় না, কোথায় গিয়ে যেন কামড়ায়! অস্তাচলগামী সূর্যের পরাক্রমে পরাস্ত হয়ে, আত্মরক্ষার খাতিরে সমুদ্রকে আড়াল করে খবরের কাগজের আড়ালে আমাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে।

এই একটু আগে, এক জোড়া তরুণ-তরুণী আমার কাছাকাছি এসে কলহ জুড়ে দিয়েছিল—সূর্যাস্ত-দর্শনে তাদেরও সমান অরুচি দেখতে পেলাম—বকতে বকতে তাদের আলোচনার এবং আমার সীমান্তে এসে তারা পৌঁচেছিল। মুখে কাগজ চাপা দিয়ে আমি অকাতরে ঘুমোচ্চি তারা ধরে নিয়েছিল মনে হয়। ঘুমের ভাণ করে তাদের তর্ক করতে দেব, না, নড়ে চড়ে তাদের সতর্ক করে দেব—কোন্‌টা ঠিক হবে সেই কথাই আমি ভাবছিলাম।

'আবার তুমি 'না' করচ! আমার নিজের চোখে দেখা।' মেয়েটি বলছিল।

'কিছুতেই তুমি দেখতে পারো না!' প্রতিবাদ করে ছেলেটিঃ 'আমি ছিলামই না সে তল্লাটে! তোমার দিব্যি, তার ত্রিসীমানায় আমি ছিলাম না।'

'আমি নিজের চোখে দেখেছি! বল্‌চি আমি।' মেয়েটির ধারালো অনু-যোগ! —'আমি কি মিথ্যে বলছি?'

'দ্যাখো হেনা, আমার মনে হয় ডাক্তারকে দিয়ে তোমার চোখটা একবার দেখানো দরকার ভালো ক'রে। তুমি আরেকবার এইরকম ভুল করেছিলে মনে আছে বোধহয়? সেই যেবার তুমি এমনি নিজের চোখে দেখেছিলে তোমার কোন্ এক বন্ধুকে নিয়ে আমি লাইটহাউসে ঢুক্‌ছি। মিনতি না কি যেন তার নাম! নিউ মার্কেট থেকে ফেরার পথে এমনি নিজের চোখেই দেখেছিলে তো! অথচ তুমি বেশ ভালোই জানতে, একটা প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে সারা দুপুর সেদিন আমি মিউজিয়ামেই কাটিয়েছিলাম। তবুও লাইটহাউসে আমাদের প্রবেশলাভ দেখতে তোমার একটুও বাধা হয়নি!'

'হয়ই নি তো। সেদিনও আমি ভুল দেখিনি!' হেনার বরফ-জমানো গলা: 'সেদিনের কথাও আমি ভুলব না কোনো দিন!'

মিনতির সুরে আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিল ছেলেটি, কিন্তু হেনার এহেন জবাবের বর্‌ফি-পাহাড়ে আটকে গিয়ে তার তুষার-গলানো আবেদন গলার মধ্যেই জমাট বেঁধে যায়।

খবরের কাগজের ম্যাজিনো-লাইন একটু ফাঁক করে যুধ্যমান দম্পতির দিকে একবার আমি উঁকি মারলাম। অগ্নিবর্ষিণী মেয়েটি দেখতে মন্দ নয়—তন্বীও বটে, বহ্নিও বটে! রোষকষায়িত হওয়ায় আরো যেন সুন্দরীই দেখাচ্ছিল ওকে। শানানো ছুরিব মত চকচকে আর ধারালো! যে কোনো মেষশাবকই ওর তলায় গলা পাততে দ্বিধা করবে না। কাগজের আড়াল দিয়ে আড় চোখে সেই আরক্তিম শোভার দিকে তাকাচ্ছিলাম—রঙদার আকাশকে উপেক্ষা করে—সামুদ্রিক সূর্যাস্তের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে। সত্যি, অস্তায়মান সূর্যের ওপরেও টেক্কা মেরেছিলো মেয়েটা।

স্বামী হতভাগ্যের আর কী বর্ণনা দেব? রস, কষ, বর্ণ, গন্ধ যাওবা ছিল বেচাবীর, এই অভাবিত আকস্মিক আক্রমণে সমস্তই হাওয়া—কোন্ দিক দিয়ে যে এই ব্লিৎসক্রিগ ঠেকাবে, কোণঠেসা হয়ে খেই পাচ্ছে না! বিপন্ন বিপর্যস্ত জীবটির প্রতি অযাচিতই আমার সহানুভূতির উদ্রেক হতে থাকে।

'তুমি সুমুদ্দুরে স্নান করতে গেছ সেজন্যে তোমাকে আমি কিছু বলছি না, আমাকে ফেলে একলা যাওয়ার জন্যেও না, কিন্তু—কিন্তু অমন করে মিথ্যে কথা বানিয়ে আমাকে ঠকাতে চাওয়ার মানে?...''

হেনার ভেতর থেকে চাড়ে-ভাঙা বরফের টুকরোগুলো ঠিকরে ঠিকরে বেরয়।

'আমি তোমাকে একশো বার বলেছি, আবার বলছি, আজ আমি সমুদ্রের ধারে কাছেও যাইনি। স্নানই করিনি আজ! শপথ করে বলচি, সারা সকালটা আজ আমি শ্রীমন্দিরের কারুকার্য দেখে কাটিয়েছি,—তোমার—তোমার শ্রীজগন্নাথের শপথ!'

মনে মনে হাসলাম। সত্যি বলতে, আমি নিজেই আজ সমুদয় প্রাতঃকালটা মন্দির-গাত্রের সুচারু কার্যে নিবিষ্ট ছিলাম এবং আমাদের—আমার এবং মন্দিরের এক মাইলের মধ্যেও এই মিথ্যাবাদীর টিকি আমার নজরে পড়েনি। অবশ্যি, মন্দির-পৃষ্ঠের কারু ভাস্কর্যের প্রতি ছেলেটির অরুচি থাকবার কথা নয়। ওই সব পৌরাণিক চারু-শিল্প

থেকে আধুনিক কলানৈপুণ্য লাভের সুযোগ আছে। এমনকি, উভয়ের অদ্ভুত মিলও দেখা যায়। আধুনিকতা আর পৌরাণিকতা এই শ্রীক্ষেত্রে একই সঙ্গমে এসে অক্লেশে যেন মিশ খেয়েছে! এই কারণে পুরী এলে আর সুযোগ পেলে অনেকে আগে মন্দিরদর্শন করে, এমনকি মন্দির দেখলে জগন্নাথদর্শন পর্যন্ত ভুলে যায়। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব আর যত্নতত্ত্বের সেই মিলনক্ষেত্রে এই গরমিলের নায়কের শ্রীমুখ আমি দেখিনি।

'তুমি বলচ যে সমুদ্রের ধারে-কাছেও যাওনি আজ! বেশ, এই চুপ করলুম, আর আমি জীবনে তোমার সঙ্গে কথা বলব না' বলতে বলতে ভাবাবেগে আপনা থেকেই হেনার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে।

'দ্যাখো হেনা, সারা দুপুর আজ তুমি আমার সঙ্গে কথা কওনি, সমস্তক্ষণ মুখ ভার করেছিলে তাতে আমি প্রাণে কী ব্যথা পেয়েছি, তুমি জানো না। তারপর সেই তখন থেকে, বিকেল থেকে, তুমি আমাকে কী না বলছ,—যা নয় তাই বলছ কিন্তু সব আমি সহ্য করেছি। এরপর ফের যদি তুমি এ-জীবনে আমার সঙ্গে কথা না বলো—জীবনের মতো কথা বলা বন্ধ করে দাও—তাহলে আমি কতদূর মর্মাহত হবো—কিরকম ঘাবড়ে যাবো— তা কি তুমি ভাবতে পেরেচ? হেনা, তোমার পায়ে পড়ি, অতটা নিষ্ঠুর তুমি হয়ো না।'

স্বামীর সকাতর প্রার্থনায় হেনা তক্ষুণি তক্ষুণি প্রতিজ্ঞা ভাঙ্‌লো:

'আমি তাহলে বানিয়ে বানিয়ে বলচি এই কথাই তুমি বলতে চাও?'

হেনার মুখে ঘুরে ফিরে সেই এক কথা—শব্দভেদী একাগ্নী! ছেলেটির কপালে পর পর অনেকগুলি রেখা পড়ে: 'তুমি খালি খালি আমায় অবিশ্বাস করচ, হেনা! এই সমুদ্রের সামনে আমি দিব্যি গেলে বলচি, কক্ষণো আজ আমি ওর জলস্পর্শও করিনি, তোমার ওই সমুদ্দুর সাক্ষী!'

কিন্তু এত বড়ো সাক্ষ্যেও হেনা অটল,—হেনা হেলে না: "তুমি কী বলতে চাও শুনি? পোস্টাফিসের ফেরতা এই পথে যেতে যেতে নিজের চোখে আমি কী দেখলাম তাহলে? ঠিক ওইখানটায়, ওই অতো দূরে, উঁচু ঐ বালির গাদাটার কাছে—তুমি, আর তোমার চার পাশে একপাল—কী বলবো? একপাল জন্তু!'

'ছিঃ, হেনা, নিজের স্বজাতির নিন্দে কোরো না।' ছেলেটি একটু ক্ষুণ্ণ হয়: 'নারীজাতির অবমাননা করতে নেই।'

'জন্তু না তো কী! কী বলব তাদের? বেহায়া মেয়ে যতো। হি হি হি শুনেই আমি থমকে দাঁড়িয়েছি! দেখলাম গুচ্ছের ছুঁড়ির মাঝখানে স্বয়ং আমাদের মূর্তিমান! আর কী দাপাদাপি বাপ্‌রে। কী লাগিয়েছিল ওরা? নটির পূজা, না, ঘোড়ার নাচ!'

'এখান থেকে ওই বালির গাদাটা কতোটা দূর! এখান থেকে দেখলে কিছুতেই তুমি আমাকে চিনতে পারতে না আর আমিও তোমাকে দেখতে পেতুম—মানে—যদি সত্যি সত্যিই ওখানে আমি থাকতুম সেই কথাই বলচি—'

'সেটা ভগবানের দয়া, কাছেই এখানে একটি ভদ্রলোক দূরবীণ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন,—সমুদ্রের সুষমা দেখছিলেন তাই যেন বল্লেন,—তাঁর হাত থেকে যন্তরটা

একটুখানির জন্যে চেয়ে নিয়ে তার ভেতর দিয়ে তাকালুম। দেখতে আর কিছুই বাকী রইলো না। বলি, সুষমা বলে কেউ ছিল না কি ওদের মধ্যে? যে মেয়েটিকে তুমি হাত কলমে সাঁতার শেখাচ্ছিলে তিনিই সেই সামুদ্রিক সুষমা নন্ তো!'

'জীবনে আমি কক্ষনো কোনো সুষমাকে সাঁতার শেখাইনি।' ছেলেটি প্রতিবাদ না করে পারে না। "মেয়েদের নিয়ে সাঁতার কাটা আমার অভ্যেস নয়!'

'উঃ, কী বাহাদুরী মাইরি! তুমি নিজে গায়ে পড়ে মেয়েটাকে সাঁতার শেখাতে গেলে! আর শেখানো বলে, শেখানো! ইস্!—'

'সাঁতারেব আমি কী জানি যে শেখাবো!' ছেলেটি বাধা দিয়ে বলে! অসঙ্কোচে নিজের অজ্ঞতা জাহির করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না।

'তাই তো বলচি, আশ্চর্যি! আর শেখাতে গেলে সেই ধিঙ্গিকে যে তোমাকেই শিখিয়ে দিতে পারে! যে তার একটু আগেই আধখানা সমুদ্দুর সাঁতরে এসেছে!—"

'আমি বার বার বলচি আমি নই, আর কেউ।' ছেলেটি মুখ চুণ করে জানায়ঃ "তুমি কি বলতে চাও যে আমি ছাড়া আমার মতো লোক আর একটিও এই পৃথিবীতে নেই?'

"তোমার মতো আর একটা—হ্যাঁ! তোমার জোড়া আর একটি মিললে হয়!'

এক বাক্যে মেয়েটি ওকে উড়িয়ে দেয়। ওর সুচিন্তিত প্রস্তাব সমেত ওকে।

'বেশ বুঝতে পারছি আমি আর অদ্বিতীয় নই! যেমন, আমাদের হিটলারের থাকে তেমনি আমারও হয়েছে। আমারও জীবন্ত প্রতিমূর্তি—হুবহু প্রতিচ্ছবি, এই পুবীবই কোনোখানে ঘাপটি মেরে আছে নিশ্চয়। সেই হতভাগাই আমার সর্বনাশ সাধন করেছে, আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি!—' ছেলেটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের সাথে সাথে অবশেষে পরিত্যাগ করেঃ 'তাকে দেখতে পেলে একবার আমি দেখে নিতাম।'

'তাই নাকি?' হেনাও চলকে ওঠেঃ 'আমিও দেখতুম একবার।'

হেনার বারংবার ছেলেটিকে হেনস্থা আমার হৃদয়ে—আমার অ্যানাটমির সব চেয়ে দুর্বল জায়গায় আঘাত হানছিল। স্বামীজাতিসুলভ সমবেদনায় আমি কানায় কানায ভবে উঠেছিলাম। ভাবো দিকি, এই ছেলেটি না হয়ে যদি আমি স্বয়ং কল্পনার খপ্পরে এভাবে ধরা পড়তুম—কী হতো তাহলে? কল্পনা করতেই আমি শিউরে উঠি।

জীবনে কদাচ কাউকে উদ্ধার করার সুযোগ পাইনি। আমার সামনে কেউ জলে ডুবে মরেনি, আমার কাছাকাছি বাড়িতে আগুন লাগেনি কখনো—আমার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। স্ত্রী-পীড়িত এই অসহায় গোবেচারিকে বাঁচানো যায় কিনা, ভেবে দেখি।

ওদের অলক্ষ্যে উঠে যাই। তারপর হাওয়া খাওয়ার ছলনায় এধারে ওধারে ঘুরে ফিরে বেড়াতে বেড়াতে, পায়চারির ফাঁকতালে ওদের কাছাকাছি এসে পড়ি—তখনো দুজনের মধ্যে ঘোরতর লড়াই।

সাহস সঞ্চয় ক'রে নিই আমি। তারপর সহাস্য মুখ তুলিঃ

'এই যে, এই যে। দিগম্বরবাবু যে!' আমি উছলে উঠি অকস্মাৎ: 'ফের আজকের দেখা হলো, য়্যাঁ?'—বলতে না বলতে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে পড়ি আমি—'আজকেই আরেকবার। কী ভাগ্যি।'

দিগম্বরের গলার ভেতরটা ঘড় ঘড় করে ওঠে।

'আজ্ঞে—আজ্ঞে, মাপ করবেন।' ছেলেটি বলে: 'আমি—আমি তো আপনাকে—আমার নাম দিগম্বর নয়।'

'দিগম্বর নয়? সে কি মশাই, আজ সকালেই আপনি বললেন, আপনার নাম দিগম্বর? আর এর মধ্যেই নিজের নাম ভুলে গেলেন?'

'সকালে কখন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হলো?' দিগম্বর যেন দিগন্ত থেকে পড়লো।

'আলবৎ হয়েছে। ঐ যে ঐখানে—ঐ—ঐ বালির গাদাটার পাশে? মনে পড়ছে না আপনার?'

'একদম না। ঐ বিচ্ছিরি গাদাটার ত্রিসীমানায় আমি ছিলাম না।' দিগম্বর বিরসমুখে জবাব দেয়।

'সে কি মশাই? এ-বেলায় ও-বেলায় ভুলে যাচ্ছেন। আমি সে-সময় মেয়েদেব সাঁতার শেখাচ্ছিলাম, আপনি অযাচিতভাবে এগিয়ে এসে আমার কাজে কতখানি সাহায্য করলেন। কেন মশাই, সেই মেয়েটিকে—সমুদ্রের সুষমাকে—আপনিই তো স্বহস্তে সাঁতার শেখালেন, বলতে গেলে।—'

বলতে বলতে আমি আরো কাছে এগিয়ে যাই, আরো তীব্র দৃষ্টিতে তাকাই, আরো তীক্ষ্ণতর কটাক্ষে ভদ্রলোকের আগাপাশতলা বিদ্ধ করি।

'হ্যাঁ, আপনিই তো। সুষমার সমুদ্রে আপনাকেই তো তলিয়ে যেতে দেখেছি।' ভালো ক'রে অবলোকন ক'রে অবশেষে বিহ্বল হতে হয়: 'আশ্চর্য।' ...আমার বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রের সঙ্গে আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ় কণ্ঠ সমান তালে পাল্লা দ্যায় ' "তাই তো। আপনি তো দিগম্বর নন। উঁহু, দিগম্বরবাবু তো নন আপনি! এখন দেখতে পাচ্ছি! স্পষ্টই দেখছি এখন! কিন্তু কী অদ্ভুত মিল মশাই! এমন বিস্ময়কর সৌসাদৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। আশ্চর্য!'

দিগম্বর—না, কী ওর নাম—ওকে দেখলে মনে হয়, ও যেন দৈববাণী শুনছে। স্বকর্ণেই শ্রবণ করছে! ফেরারী সত্য যুগ ফিরে এল নাকি ফের? সেই যে-যুগ—যে কালে, 'আপনি আসিয়া ভক্তরণস্থলে সংগ্রাম করিত দেবতাগণ!'—পুনরায় দেখা দিল নাকি আবার?

আর হেনাকে দেখলে মনে হয়, অপ্রত্যাশিত এই আবির্ভাবে, এহেন অভাবিত সাক্ষীর অভ্যুদয়ে, ও যেন আস্তে আস্তে স্বামীর ওপরে আস্থা স্থাপন করতে শুরু করেছে।

'ওঁর মতো একটি লোককে ঐ বালির গাদাটার পাশে আপনি দেখেছিলেন, আজ সকালে?' হেনা জিজ্ঞেস করে আমায়।

'অবিকল। আর, দেখা মানে? আমরা দুজনে একই সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়েছি। একই

সুষমাময় সমুদ্রে। সত্যিই, অবাক কাণ্ড। দুজনে একেবারে হুবহু। একটু দূর থেকে দেখলে আলাদা করার উপায় নেই। যাক্, কিছু মনে করবেন না মশাই, সামুদ্রিক সুষমায় যিনি মত্ত হয়েছিলেন, তিনি আপনি নন। তিনি অপর কেউ। এখন দয়া ক'রে নিজগুণে আমায় মার্জনা করুন।'

ছেলেটি আমায় মার্জনা ক'রে দিল অম্লানবদনে, তৎক্ষণাৎ! তার মুখ দেখেই আমি টের পেলাম।

'হোলো তো। দেখলে তো। বলছিলুম না যে আমি নই—সে যেই হোক্, সে কখনো তোমার স্বামী নয়—'

চলে যায় ওরা, মেয়েটিকে কাটা কাটা কথা শোনাতে শোনাতে যায় ছেলেটি :

'সেই লোকটাই আসল বদ। সেই হচ্ছে আসামী। আর দূরবীনধারী সমুদ্রের সেই সুষমাদর্শনকারী হতচ্ছাড়াটা হচ্ছে তার মাস্তুত ভাই। সে লোকটাও কম পাজি না। সেই তো যতো নষ্টের গোড়া। সেই হতভাগাটা যদি না তোমাকে দূরবীন দিতো—যাক্ গে, দিক্ গে, তাকে কী। এখন, তাকে কি, তার মাস্তুত ভাই সেই সন্তরণবিলাসীকে তোমার স্বামী বলতে চাও? ইচ্ছে হয়, বলতে পারো।...' বলতে বলতে চলে যায় ওরা।

আমি হাসি। একখানা স্বর্গীয় হাসি হেসে দিই। দুঃখজর্জর পার্থিব কোনো জীবের একটুও উপকারে লেগেছি,—একটাও ক্ষণভঙ্গুর সুখনীড়কে ভগ্নদশা থেকে বাঁচাতে পেরেছি—অকিঞ্চিৎকর এই জীবনের যৎকিঞ্চিৎ যাতনাও দূর করতে পারা গেছে—এই ভেবে বিজাতীয় আনন্দ হতে থাকে।

ফেরা যাক্ এবার।

ফিরতেই দেখি, আমার পেছনে দাঁড়িয়ে কল্পনা। মূর্তিমতী শ্রীময়ী স্বয়ং—

ঠোঁটে ঠোঁটে জমাট লেগে সারা মুখ সুকঠিন—দুই চোখে ওর গন্‌গনে আগুন। একটু আগে হেনার মুখে যে-ছবি দেখেছিলাম তারই পুনর্মুদ্রণ। কিন্তু তার চেয়ে আরো ভয়াবহ।

'এই বুঝি তোমার মন্দির দেখতে যাওয়া? আজ সকালে—সারা বেলাটা—এই—এই বুঝি— ?...এই করেই বুঝি... ?'

দলিতা ফণিনীর মতো কল্পনা ফোঁস ফোঁস করে। গর্জে গর্জে উঠতে থাকে ক্ষণে ক্ষণে।

আর আমি ?...

কল্পনার কাছে এখনো কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে।...

ছয়

'একটু চা না হলে তো বাঁচিনে!' কল্পনা দীর্ঘনিঃশ্বাসের দ্বারা বক্তব্যটা বিশদ করল।

'চা-বিহনে মারা যাচ্ছি এমন কথা আমি বলতে পারিনে' —'সত্যনিষ্ঠার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে বলতে হয় : 'তবে এক কাপ পেলে এখন মন্দ হোতো না নেহাত!'

'চায়ের একটা দোকান কাছাকাছি আছে কোথাও নিশ্চয়।'

'আমারও তাই ধারণা। চায়ের গন্ধ পাচ্ছি যেন! মিনিট খানেকের মধ্যেই কোনো চায়ের আড্ডার ওপরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারি মনে হচ্ছে!'

কিন্তু মিনিটের পর মিনিট কেটে যায়, অগুনতি মিনিট, এবং হোঁচটও বড়ো কম খাইনে, কিন্তু কোনো চাখানার চৌকাঠে নয়। আমি হতাশ হয়ে পড়ি এবং কল্পনা গেঁয়ো লোকের বোকামি আর ব্যবসাবুদ্ধিহীনতার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত না ক'রে পারে না।

বাস্তবিক, গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছি অথচ চায়ের নামগন্ধ নেই। কেন, গাঁয়ে গাঁয়ে চায়ের দোকান খুললে কী ক্ষতি ছিল? ফলাও কারবারে দু পয়সা উপায় হতো বইতো নয়! এই তো, আমরাই তো দু কাপ খেতাম। ডবল দামেই খেতে পারতাম। এমনকি, চারগুণ দাম দিতেও পেছপা ছিলাম না—চা-র এমনি গুণ।

কিন্তু এই গেঁয়ো লোকগুলো—একালে বাস করেও সেকেলে—সেসব কিছু বোঝে কি? যাতে দু পয়সা সাশ্রয় নগদা-নগদি আমদানি, তাতেই ওরা নারাজ।

'নাঃ, এখানকার কারু দূরদৃষ্টি নেই। কেন যে লোক মরতে আসে এখানে? বেড়াবার কি আর—'

কথাটা কল্পনাকে কটাক্ষ করেই বলা। পল্লী অঞ্চলে, পল্লী মায়ের আঁচলে হাওয়া খাবার সখ ওরই উথলে উঠেছিল হঠাৎ। এবং বলতে কি, যে-আমি এমন কলকাতাসক্ত, যাকে কলকাতার বাইরে টানা ভারী শক্ত ব্যাপার, প্রাণ গেলেও পাড়াগাঁর দিকে পা বাড়াইনে—সেই আমাকে একরকম তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে য়্যাদ্দুরে।

'—আর জায়গা পায় না?' বাক্যটাকে উপসংহারে নিয়ে আসি। এবং বলতে, বলতে, পাড়াগাঁ-সুলভ—আরেক নম্বরের দূরদৃষ্টিহীনতা—পথভ্রষ্ট এক গাদা গোবরের ওপর পদক্ষেপ ক'রে বসি। ঠিক বসিনি—তবে আরেকটু হলেই বসে প-ত হতো, চাইকি ধরাশায়ী হওয়াও বিচিত্র ছিল না, কিন্তু হাতের কাছাকাছি কল্পনাকে পেয়ে—পেয়ে গিয়ে, তক্ষুনি তাকে পাকড়ে, নড়বোড় ক'রে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে গেছি।

'তোমার যে বাপু অদূরদৃষ্টিও নেই।' বিরস-বদনে কল্পনা বলে। স্বামীর আশ্রয়স্থল হয়েও সে সুখী নয়। তার ব্লাউজের একটা ধার নাকি ফ্যা—স ক'রে গেছে।

ব্লাউজ উদ্ভিন্ন হওয়ার দুঃখ আমার মনে স্থান পায় না। আমার আত্মরক্ষাতেই আমি খুশি। তাছাড়া ভেবে দেখলে, কে কার? ব্লাউজ তো আমার নয়। এবং ব্লাউজ ইত্যাদি বিসর্জন দিয়েও স্বামীরত্নদের যদি অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচানো যায় (সাধ্বীদের অসাধ্যি কী আছে?) তা কি স্ত্রীজাতির কর্তব্য না?

'বা রে। তুমি কি বলতে চাও যে আমি ইচ্ছে ক'রে পড়তে গেছি? মানে, ঐ গোবরটার সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে—?' স্তব্ধ কণ্ঠে আমি বলি: 'এই কথা তুমি বলতে চাও?'

'যাও। এদিকে চায়ের তেষ্টায় প্রাণ যাচ্চে—তোমার ইয়ার্কি আমার ভালো লাগে না।'

'বাস্। আমি তো নেমেই চায়ের কথা তুলেছি। রেলওয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই যাচ্ছিলাম—তুমিই বাধা দিলে।'

'আমাদের আগে আগে রেস্তোরাঁয় সেই মেয়েগুলো ঢুকলো না ? মনে নেই তোমার ?'

'হ্যাঁ, সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েরা ? তাতে কী ?'

'কী সব খাটো খাটো ফ্রক-পরা তাদের—দেখেছিলে তো ?

'দেখেছিলাম।'

'তুমি যে দেখেছিলে সেটা আমিও দেখেছি। লক্ষ্য করতে আমার দেরি হয়নি। —আর সেই কারণেই ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না আমরা স্থির করলাম।'

আহা ? আহা। কল্পনার এই স্ব-গৌরবে বহুবচন—আমার ন্যায় নেহাৎ আ-স্বামীর পক্ষে এর জবাব আর কী আছে ? তবুও আমতা আমতা ক'রে বলতে যাইঃ 'কিন্তু ওরা তো বাঙালী নয় ? মেম তো ?'

'কিন্তু তা হলেও—তবুও তো অসময়ে চায়ের পিপাসা জেগে উঠতে তোমার কোন বাধা হয়নি।'

'তোমার ভারী সন্দিগ্ধ মন। আমার বিশ্বাস, দার্জিলিঙে গেলে তুমি আমাকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকেও চোখ মেলে চাইতে দেবে না। আমাকে দেখছি সব সময়েই এভারেস্টের দিকে হা ক'রে তাকিয়ে থাকতে হবে।'

বলার সাথে সাথে, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, (দার্জিলিঙে না গিয়েই) এভারেস্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করি। আমার চিরতমার আগা-পাশতলা বারেক পর্যবেক্ষণ ক'বে নিই—এমনকি, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ (সম্প্রতি কুজ্ঝটিকামুক্ত) অব্দি বাদ যায় না। আগার দিক থেকেই আগাই—গোড়ায়।

'ইয়ার্কি কোরো না, যাও!' কল্পনা রাগ করে।

'ইয়ার্কি হলো কোনখানে ? ভেবে দেখলে তুমিই তো আমার, একাধারে, ইভ্ এবং রেস্ট্,—আর দ্বিধামুক্ত হলেই—এক কথায় ঐ! ব্যাকরণমতে দাঁড়ায় এভারের সুপার্লেটিভ! তাই নও কি ? সাদা বাংলায় যাকে চিরন্তনী বলে গো!'

কল্পনা কোনো জবাব দেয় না। কথাটা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করে হয়ত বা।

'অবশ্যি কবিতা করেও বলা যায় কথাটা। সাদা বাংলাতেই আজকাল কবিতা লেখা হচ্ছে কিনা!' আমি দৃষ্টান্তের দ্বারা আরো প্রাঞ্জল করিঃ 'সুধীন দত্তের লেখা পড়েছো তো ? পড়োনি ?'

'খুব হয়েছে! আর ব্যাখ্যানায় কাজ নেই! এখন কোথায় চাখানা আছে একটু দয়া ক'রে দেখবেন মশাই ?'

এভারেস্টের উচ্চতম চূড়া থেকে এভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলে বাক্যস্ফূর্তি কেন, সব ফুর্তিই লোপ পায়! আমিও আর উচ্চবাচ্য না ক'রে চুপটি ক'রে চলতে থাকি। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত গোবরদের সন্তর্পণে বাঁচিয়ে, ছোটখাট খানাখন্দ, উঁচু-নীচু নীরবে অতিক্রম ক'রে চলি।

একটু পরে কল্পনাই নিজের থেকে পাড়েঃ 'তখন আমি এইজন্যেই বলেছিলাম যে টিফিন ক্যারিয়ার সাথে নিই। তুমিই তো না করলে। আনতে দিলে না আমায়।'

আমিও না ব'লে পারি নাঃ 'যত দোষ নন্দ ঘোষ!'

এক বাক্যে, ঐ একটি মাত্র প্রবচনে, আমাদের অসন্তোষ ব্যক্ত করি—আমার আর নন্দ ঘোষের।

এবার ও গম্ভীর হয়ে যায়। বহুক্ষণ গুম্—কোন কথাবার্তা নেই। আমাকে ব্যস্ত হতে হয় অগত্যা। আমার কি রকম যে স্বভাব—অপর কেউ গুম্ হলেই আমি যেন খুন্ হয়ে যাই। কোথায় আমার খুন্সুটি লাগে, বুকের মধ্যে গুম্রে ওঠে। ডিজিটালিস খেয়ে, এমন কি, গীতার সেই মারাত্মক শ্লোক আউড়েও কোনো ফল হয় না—কিছুতেই এই ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বলং কাটিয়ে উঠতে পারি না দেখা গেছে। মার্জনা-প্রার্থনার সুরে, মার্জিত স্বরে অনুতাপের আর্জি পেশ করিঃ

'খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করাই ভুল হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম যে কী বড়লোকের অট্টালিকায় আর কী ছোটলোকের হট্টমন্দিরে—রাজপ্রাসাদেই কী আর পর্ণ কুটিরেই বা কী, বাংলার ঘরে ঘরে ভারতীয় চা আজকাল সমাদৃত হচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে তা নয়—অন্তত ঠিক ততটা নয়।'

'টিফিন ক্যারিয়ারটা আনতে দিতে কী হয়েছিল?' কল্পনার সেই এক কথা—প্রাচীন পরিকল্পনা।

'থার্মোফ্লাসকে চাও আনা যেত। এখন তাহলে যেখানে হয় ব'সে প'ড়ে মজা ক'রে পিক্‌নিক্ করা যেত কেমন!'

'আনতে দিতে আর আপত্তি কী ছিল, কেবল বইতে তোমার কষ্ট হতো বই তো না—তাইতো বারণ করলুম। মানে—মানে আমারই হাত ব্যথা হয়ে যেত কি না শেষটায়,—কল্পনার বহন-নৈপুণ্যে আমি অতীব নাস্তিক্যবাদী।

টিফিন-ক্যারিয়ারের প্রস্তাবটা একধারে যেমন মুখরোচক, দূরদৃষ্টি আর বিচক্ষণতা-সহকারে চিন্তা করে দেখলে, অপরদিকে তেমনই ঘর্মাক্তকর—দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে এই মর্মান্তিক ভবিষ্যৎ, পা বাড়াবার আগেই আমি পরিষ্কার দেখেছিলাম, কল্পনার কাছে এই অপরাধ এখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

'তুমি ভারী স্বার্থপর!' ও বলেঃ 'নিজের হাত পার ওপর এত দরদ তোমার?'

'তা স্বার্থপর আমি একটু বইকি।' ভূতপূর্ব আমার সেই ভবিষ্যৎ-দর্শন এবার আরো একটু স্পষ্ট করিঃ 'ভেবে দেখলাম এও তো হতে পারে, তুমি নিজেই অচল হয়ে পড়লে! হাঁটাহাঁটির বালাই তো নেই আমাদের। তখন এক হাতে টিফিন ক্যারিয়ার আরেক হাতে তুমি—কোন্‌টা সামলাই? আর, গ্রাম্য দৃষ্টিতেও সেটা খুব সুদৃশ্য নয়! এমনিতে হয়ত একটা বোঝা তত বেশি না—কিন্তু তার ওপরে শাকের আঁটি চাপালেই মাটি! ঐতিহাসিক উটের পিঠে চূড়ান্ত তৃণখণ্ডের মতোই দুঃসহ কাণ্ড! তা ছাড়া—তা ছাড়া—' বিষয়টা আমি আরো খোলসা করিঃ 'দুটো বোঝা থাকলে হয়ত আমি দোনামোনায় পড়ে যেতাম। ওরকম অবস্থায় মানুষ অপেক্ষাকৃত হাল্‌কাটাকেই বেছে নেয় কিনা!'

'জানি জানি, আর বলতে হবে না।—' কল্পনা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেঃ 'তুমি টিফিন ক্যারিয়ারটাই হাতে নিয়ে ট্যাং ট্যাং করে' বাড়ি ফিরে যেতে আমি খুব জানি।'

'মোটেই না।' আমি গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িঃ 'আমি তোমাকেই নিতাম। টিফিন্ ক্যারিয়ারের চেয়ে মাউন্ট এভারেস্টই আমার কাছে বেশি হাল্কা মনে হতো। তাছাড়া, পর্বতচূড়া বইবার ভাগ্য কজনের হয়? হলে কজন সে সুযোগ ছাড়তে পারে? পুরাকালে সেই একদা শ্রীমান্ হনুমান এই মোকা পেয়েছিলেন—গন্ধমাদন-বহনের সময়—কিন্তু তিনি—তিনিও যতই বোকা হন, হাতছাড়া করতে পারেননি।'

'হয়েছে হয়েছে, খুব হয়েছে। যেমন পুরাণ, তেমনি ইতিহাস, সবই তোমার নখদর্পণে—টের পেয়েছি বেশ। এখন কোথায় গেলে একটু চা পাওয়া যায় তা যে কেন তোমার মাথায় আসছে না, তাতেই আমি ভারী অবাক হচ্ছি।'

'দাঁড়াও না। এক্ষুনি একজন সদাশয় অতিথি-বৎসল আদর্শ গ্রাম্য লোকের দেখা পেলুম বলে'। আমাদের দেখেই তিনিই আপ্যায়িত হয়ে অভ্যর্থনা করবেন—চা-তো খাওয়াবেনই, সেই সঙ্গে চিঁড়েমুড়কি—ঘোরো গোরুর খোড়ো দুধ—সমস্ত মিলিয়ে মিষ্টি একটা ফলারও বাদ যাবে না। শুনেছি পাড়াগাঁর ওরা নিরাশ্রয় বিদেশী লোক দেখলেই কোন কথা শোনে না, ধরে বেঁধে খাইয়ে দ্যায়।'

'সেসব দিন গেছে।' কল্পনার হাহুতাশ শুনিঃ 'এসব দৈত্য নহে তেমন।' দুঃখের চোটে, হেমচন্দ্র থেকে পঙ্কোদ্ধার করতেও সে বাকী রাখে না।

'আচ্ছা, এইবার কাউকে দেখতে পেলে জিগেস করব।' আমি বলি। মরিয়া হয়ে বলি।

'দেখতে পেলে তো।' কল্পনা বিশেষ সান্ত্বনা পায় না।

বাস্তবিক, এতক্ষণ ধরে, এতখানি পথ—এত গণ্ডা চষা এবং না-চষা মাঠ পার হয়ে এলাম, দু-একটা গণ্ডগ্রামও যে না পেরিয়েছিল তা নয়, কিন্তু বাক্যালাপ করবার মতো একটা মানুষ চোখে পড়ল না। যাও বা এক আধটা আমাদের সীমান্ত প্রদেশ ঘেঁষে গেছে, তাদের চাষাভুষো ছাড়া কিছু বলা যায় না। চাষা কি আর চায়ের মর্ম জানে, চায়ের সোয়াদ চায়? তাকে চায়ের কথা জিজ্ঞেস করাও যা, আর কল্পনাকে চাষের কথা জিজ্ঞেস করাও তাই—একজাতীয় কল্পনাতীত ব্যাপার!

কিন্তু না, এর পর যে ব্যক্তিই সামনে পড়বে, তা সে যেই হোক, তার কাছেই চায়ের কথা পাড়ব। এ-গাঁয়ের চাষাই হোক আর ভুষোই হোক, প্রথম কথাই চায়ের কথা এবং চায়ের ছাড়া অন্য কথা না।

এবং পড়লও একজন সামনে!

তিনটে চষা ক্ষেত আর সিকি মাইল সরু আলের রাস্তা ডিঙিয়ে গিয়ে তার দেখা মিলল। গাছের মগডালে পা ঝুলিয়ে বসেছিল লোকটা। গাছের ডালে বসে থাকাটাই বোধ হয় এধারকার চলতি ফ্যাসান—ট্যাকসোবিহীন আমোদ-প্রমোদ—এইরকম আমার ধারণা হয়েছে। যখনই কোনো গেঁয়ো লোকের প্রাণে ফুর্তির সঞ্চার হয়, সাধ হয় যে

একটু হাওয়া খাই, অমনি সে খুঁজে পেতে বিলাসিতার নামান্তর সহনশীল একটা গাছ আবিষ্কার করে' তার ডালে উঠে বসে' থাকে।

'এখানে চাখানা কোথায় বলতে পারো ?' বৃক্ষাশ্রয়ী লোকটাকে আমি প্রশ্ন করি।

'ও নামে কেউ এখানে থাকে না।' পা দোলাতে দোলাতে সে জানায়। এবং তার কাছ থেকে কিছুতেই এর বেশি আর কিছু বার করা যাবে না। আমরা তাকে গাছের ডালে পরিত্যাগ করে' আবার আমাদের ভূপর্যটনে বেরিয়ে পড়ি।

এর পরেই একটি তরুণী মহিলার সহিত আমাদের ধাক্কা লাগলো। মেয়েটি রাস্তার ওপরে বসে' ধূলো-মাটি জমিয়ে বালির ঘর রচনায় ব্যস্ত ছিল—কিম্বা এমনও হতে পারে, মাটির বানানো পুলিপিঠেই বানাচ্ছিল হয়ত বা।

'খুকি, শোনো তো ? এখানে কোথায় চা পাওয়া যায়, জানো তুমি ?' কল্পনাই জেরা করে।

'হ্যাঁ, জানি।' খুকি তার সপ্রতিভ ছোট্ট ঘাড়টি নেড়ে তক্ষুনি জানায়ঃ 'আমাদের কেদার কাকু। কেদার কাকু চা ব্যাচে। কেদার কাকুর কাছে চলে যাও।'

'কোথায় থাকেন তিনি—সেই তোমাদের কেদার কাকু?' 'এই গাঁয়ের শেষে—এক্কেবারে শেষে গিয়ে।'

খুকির ব্যবহারে এবং বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত হই। তৎক্ষণাৎ পকেট হাতড়ে চক্‌চকে দুটো আনি ওর দু' হাতে সঁপে দিই—সত্যি, পৃথিবীতে মেয়েরা না থাকলে—এই সব উপাদেয় প্রাণীরা আজো না টিঁকে থাকলে আমরা দাঁড়াতাম কোথায় ?

তারপর—চলেছি তো চলেইছি। যে-গাঁয়ের অবশেষে কেদার কাকুর উপনিবেশ সে গাঁ আর আসে না। এক মাইল হাঁটাহাঁটির পর আমি বলিঃ 'এতখানি পথ পেরিয়ে এলাম, এতক্ষণে তো সে গ্রামে আমাদের পৌঁছানো উচিত ছিল।'

'আমিও সেই কথাই ভাবছি।' কল্পনাও ভাবিত হয়েছে দেখা যায়ঃ 'আরো কতোদূরে গ্রামটা, এসো, ঐ বুড়ো লোকটাকে জিজ্ঞেস ক'রে জানা যাক্।'

আমাদের প্রশ্ন শুনে বুড়ো লোকটি আকাশ থেকে পড়লেনঃ 'সে-গ্রাম তো তোমরা পেছনে ফেলে এসেছ বাপু! আনমনা হয়ে ছাড়িয়ে এসেছ, তাই তোমাদের নজরে পড়েনি।'

বুড়ো লোকটি ভারী অবাক হয়ে যান—এবং আমরা—ততোধিক অবাক হই।

যাই হোক, ফিরে চলি আবার—এবারে দুধারে খর-দৃষ্টি চালিয়ে যাই—দুজনেই কড়া নজর রাখি—যাতে ফের আবার কোনো গতিকে না ফসকে যায় গ্রামখানা।

'আমার—আমার মনে হচ্ছে এইটাই বোধ হয় সেই গাঁ।' পথিমধ্যে থেমে পড়ে কল্পনা আপন সংশয় ব্যক্ত করে।

'এটা যদি এদের গ্রাম হয়—' আমি বলি— 'তাহলে পর্ণ কুটির বলতে এরা কী বোঝে তাই আমি জানতে চাই।'

আমরা কুটির ওরফে সেই পল্লীগ্রামের দ্বারে গিয়ে ঘা মারি। দরজা বলতে বিশেষ কিছু ছিল না—দরজার পাঠান্তর সেই নামমাত্র একটি যা ছিল তার ওপরে করাঘাত

করতে হলে যথেষ্ট সাহসের দরকার—কেননা তার ফলে গ্রাম-চাপা পড়বার দস্তুরমতই আশঙ্কা ছিল।

কল্পনার হারমোনিয়াম বাজিয়ে অভ্যেস—সে-ই করাঘাতের দায়িত্ব নেয়। আমি গ্রামের আওতা থেকে সরে দাঁড়াই। কাপুরুষতার জন্যে না, দৈবাৎ যদি একজন গ্রামের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নিমজ্জিত হয়—তাহলে তাকে সেই গ্রাম্য সমাধির কবল থেকে উদ্ধার করতে, নিতান্ত না পেরে উঠলে সেই গ্রামেই সমাধি দিয়ে ফিরতে আরেক জনের থাকা দরকার।

করাঘাতেব একটু পরেই, গ্রাম ভেদ ক'রে—কিংবা গ্রামান্তর থেকে—একটি বুড়ো লোক বেরিয়ে আসেন। "

'কেদারবাবু এখানে থাকেন কোথায় বলতে পারেন দয়া করে?' দুজনেই যুগপৎ জিগেস করি: 'কেদারবাবু ওরফে কেদারকাকু?'

'আমিই কেদারকাকু!'

'ও, আপনিই! যাক্, বাঁচিয়েছেন!' আমি উৎসাহিত হয়ে উঠি: 'গাঁয়ের ওরা বললে আপনি নাকি—মানে আপনার নাকি—মানে—আপনার এখানে কিনা—'

কী করে কোন ভাষায় যে চায়ের নেমন্তন্নটা অযাচিতভাবে গ্রহণ করবার সুযোগ নেব ভেবে পাইনে।

'আপনি নাকি মনে করলে আমাদের একটু চা খাওয়াতে পারেন।' কল্পনার কিন্তু বলতে দেরি হয় না। প্রাণকাড়া একখানা হাসি হেসে চোখ ঘুরিয়ে কথাটা বলে দ্যায়।

বাস্তবিক, অদ্ভুত এই মেয়েরা! ভাবলে চমক লাগে! সত্যি, পৃথিবীতে এরা না থাকলে অব্যর্থ আমরা গোল্লায় যেতাম।

কেদার কাকু নিজের দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে প্রকাশ করলেন: 'ও—হ্যাঁ—তা ওরা ঠিকই বলেছে। কিন্তু চা আমার পুরোণো খুব। তিন মাসের মধ্যে নতুন চা আসেনি—জেলায় আর যাওয়া হয়নি কিনা। কিন্তু চা তৈরির তো কোনো পাট আমার নেই। এমনি ছটাক খানেক দিতে পারি—অল্পই রয়েছে। পাঁচ আনা লাগবে কিন্তু।'

'আপনি—আপনার এখানে চা তৈরি হয় না?' কল্পনার তারস্বর—হতাশার সুরে মেশানো।

'আমার এটা মুদির দোকান—চায়ের আড্ডাখানা না!' কেদার কাকুর বিরক্তিম মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। পাঁচ আনা দিয়ে আধ ছটাক চা-র একটা প্যাকেট বগল-দাবাই করে আমরা সেই গ্রামের দ্বারদেশ থেকে ছিটকে বেরুই। এবং আবার আমাদের অভিযানে বেরিয়ে পড়ি।

তারপর কত যে হাঁটি তার ইয়ত্তা হয় না—স্টেশনের দিকেই হাঁটবার চেষ্টা করি। কিন্তু বিভিন্ন পথিকের বিবৃতি থেকে যা টের পাই তার থেকে এহেন ইষ্টিসন-বহুল গ্রাম যে ভূপৃষ্ঠে আর দুটি নেই এই ধারণাই আমাদের হতে থাকে। এখান থেকে—পূর্ব পশ্চিম

উত্তর দক্ষিণ—যেদিকেই যাই না কেন একটা করে স্টেশন পাবো—অচিরেই পেয়ে যাবো—দশ বিশ মাইলের মধ্যেই পাওয়া যাবে তাও জানা গেল। এমনকি, সরাসরি নাকের বরাবর নৈঋৎ কোণ ধরে চলে গেলেও আর একটা নাকি পেতে পারি, সেরকম সম্ভাবনাও রয়েছে। অতএব কোনদিকে যাওয়া শ্রেয় হবে স্থির করতে না পেরে, অস্থির হয়ে আমরা দিগ্বিদিকে চলতে শুরু করে দিলাম।

চলতে চলতে হঠাৎ এক অভাবনীয় দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হলো। পার্শ্ববর্তী ছোট্ট একটি আমবাগানের ছায়ায় দুটি ছেলে—স্কুল-পালানো বলেই সন্দেহ হয়—পিকনিকের আয়োজনে মশগুল রয়েছে।

সুচারু একটি পিকনিক! স্টোভে খিচুড়ি চাপানো হয়েছিল—প্রায় শেষ হয়ে এল বলে—ভুরভুরে তার সৌরভে চারিদিক আমোদিত। পেঁয়াজ ছাড়ানো। ছোট বড় গোটা-কতক ডিম কাছাকাছি গড়াগড়ি যাচ্ছে—খিচুড়ির সাথে আমলেটের যোগাযোগ হবে আন্দাজ করা কঠিন নয়।

ঘেসো জমির ওপর খবরের কাগজ বিছানো হয়েছে। তার ওপরে ঝকঝকে চিনেমাটির প্লেট—খিচুড়ির আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় সেজেগুজে বসে!

'আহা!' আমার জিভে জল এসে যায়। চায়ের তেষ্টা তো ছিলই, তার ওপরে খিদেও পেয়েছিল বেশ।

'এক প্লেট খিচুরি পেলে মন্দ হতো না।' এই কথাটা স্বগতোক্তির নেপথ্যেই রেখে দি।

'চায়ের কাপও রয়েছে দেখেছো!' কল্পনা দেখিয়ে দ্যায়। তাবা মানে, চায়ের আয়োজনও হয়েছে ওদের—বলতে গিয়েও মুখ ফুটে বলতে পারে না ও—মনের মধ্যেই চেপে রাখে। ওর জিভের খবর বলতে পারি না, তবে ওই কথাটাই ওর মুখ চোখে উন্মুখর হয়ে—ভরপুর হয়ে উঠেছে, দেখতে পাই।

খবরের কাগজের ওপরে আরো কী কী যেন ছিল—আচার, আমসত্ত্ব, পাঁপড়, ছানার মণ্ডা, মাখন এবং আরো কী কী সব—পাশ দিয়ে যাবার সময়ে, ঝুঁকে পড়ে, খুঁটিয়ে দেখবার আমি চেষ্টা করি—দেখেই যতটা সুখ। কল্পনা আমাকে এক হ্যাঁচকা লাগায়ঃ 'চলে এসো! ছিঃ! ওকি? হ্যাংলা ভাববে যে!'

অবশ্যি, দেখতে পায়নি। ছেলে দুটি খিচুড়ি নিয়েই মত্ত। তাহলেও কল্পনাই ঠিক। পরের খিচুড়ি এবং ইত্যাদি—পরকীয় যা কিছু, চেখে দেখার আশা নেই তা শুধু শুধু চোখে দেখে লাভ? সুধা দেখলে কি আর ক্ষুধা মেটে?

পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ করে ফের আমরা রওনা দিই। কল্পনা আমাকে বকতে বকতে যায়ঃ 'তোমার ভারী পরের জিনিসে লোভ! বিচ্ছিরি! কেন, আমি—আমি তো একটুও লালায়িত হইনি।...' সুরুৎ করে জিভের ঝোল টেনে নিয়ে সে জানিয়ে দেয়।

আমবাগানটা পেরুতে না পেরুতেই বিরাট এক চিৎকার এসে পৌঁছয়। আওয়াজটা আমাদের তাড়া করে আসে। আমরা দাঁড়াই, সেই ছেলেদুটিই দৌড়তে দৌড়তে আসছে।

'আপনাদের পিছু ডেকে বাধা দিলুম, কিছু মনে করবেন না।' ওদের একজন কিন্তু-কিন্তু হয়ে বলেঃ 'দেখুন, আমরা ভারী মুস্কিলে পড়েছি—পিকনিকে সমস্ত আনা হয়েছে, কেবল চায়ের প্যাকেটটা আনতে ভুলে গেছি। অথচ, সব কিছু হলেও, চা ছাড়া কি পিকনিক জমে, বলুন তো?'

অপর ছেলেটি শুরু করেঃ 'পাশের জেলা থেকে বেড়াতে এসেছি—এখানকার দোকান হাট কোথায় কিচ্ছু জানিনে। কোথায় গেলে চা কিনতে পাওয়া যাবে, মুদিখানা কিম্বা মনোহারী দোকানটা কোন ধারে বলে দেবেন দয়া করে?'

'মুদিখানা এখান থেকে ঢের দূর। প্রায় একখানা গ্রাম জুড়েই একটা মুদিখানা।' আমি বলিঃ 'কিন্তু তার দরকার কী, আমাদের সঙ্গেই এক প্যাকেট চা আছে—ইচ্ছে করলে নিতে পারো—স্বচ্ছন্দেই।'

'দেখেছিস!' একটি ছেলে জ্বলজ্বলে চোখে আরেকটির দিকে তাকায়ঃ 'একেই বলে বরাত—দেখলি তো। কী বলেছিলাম? ধন্যবাদ। আপনাদের কী বলে যে ধন্যবাদ দেব বলতে পারি না। তা—তা এর দাম—কতো—?'

'ও—না না। সে তোমাদের দিতে হবে না।' আমি হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিই—প্রায় মাছি তাড়ানোর মতই।

এবং এর পর—এর পর আর ওদের কী করবার ছিল? নিতান্তই যা ছিল তা না ক'রে উপায় ছিল না। এবং পর পর অনিবার্যরূপেই মিনিট দশেক বাদে সবাই আমরা, সেই ভূপতিত খবরের কাগজকে ঘিরে খিচুড়ির চার পাশে জমায়েত হলাম।

মাখম-মাখানো আলু-সঙ্কুল গন্ধ-ভুরভুরে গরম গরম সেই খিচুড়ি, অমলেটের সাহায্যে কী তোফাই যে লাগলো তা আর বলবার নয়। তার সাথে মাঝে মাঝে চাটনি—পাঁপড়ের টুকরো—আচারের টাকরা—প্রভৃতিরা—আর অবশেষে, সবশেষে চা, আহা,—বলাই বাহুল্য।

সেদিন রাত্রে বাড়ি ফেরার পর কল্পনা বললঃ 'বলতে গেলে হয়তো তুমি ছোটলোক বলবে! কিন্তু আমাদের চায়ের বাকীটা, সেই প্যাকেটটা, সঙ্গে নিয়ে আসা উচিত ছিল। প্রায় আধ-পোটাক চা—পাঁচ আনা দাম তো।'

সংসারে ফিরে এলে উচ্চ নজরও তুচ্ছ খবরে নেমে আসে। সংসার এম্‌নিই! তাছাড়া, তিল কুড়িয়েই তাল, বল্‌তে কি। এবং যে সব তিলোত্তমাকে সেই তাল সামলাতে হয় তাঁরাই জানেন।

পকেট থেকে বার করে বিনাবাক্যব্যয়ে চায়ের প্যাকেটটা ওর হাতে তুলে দিই।

'কিন্তু এ—তো—আমাদের কেনা চায়ের প্যাকেট নয়। ...একি? ...য়্যা?' ১/৩ বিস্মিত, ১/৩ বিমুগ্ধ, ১/৩ বিরূপ দৃষ্টিতে আমার দিকে সে তাকায়।

'এ ছাড়া—ভেবে দ্যাখো—ওদের পিকনিকে যোগ দেবার আর কোনো উপায় ছিল না। আর তুমি—তুমিও চা চা ক'রে যেমন চাতকের মত হয়ে উঠলে—কী করব?'

কৈফিয়তের সুরে আমি বলি: 'আর তোমার জন্যে—বলো—কী না আমি করতে পারি?'

সহধর্মিণীর জন্যে লোকে সহনীয় অধর্ম তো করেই, করে' থাকেই, অসহনীয় ধর্মাচরণেও পেছপা হয় না—আমি আর এমন কী বেশি করেছি? দস্যু রত্নাকরের খুনসুরি থেকে শুরু করে তাজমহল স্রষ্টার প্রিয়তমার কবর-ই রচনা—অহো। আগাগোড়া সব জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত আমার নিজের জাজ্বল্যমান উদাহরণে এসে পৌঁছব—জবাবদিহির এই সব প্যাঁচ মনে মনে ভাঁজছি, কল্পনা আমার চিন্তাশীলতায় বাধা দেয়: 'অবশ্যি, চায়ের জন্যে কী না করা যায়! তা ঠিক! কিন্তু তা বলে এতটা—এতদূর—' কূটনৈতিক ভাষায় কুলিয়ে উঠতে না পেরে অবশেষে ও স্পষ্টবাদী হয়ে পড়ে: 'হ্যাঁ? শেষটায় চুরি-চামারিও তুমি বাদ দিলে না। ছি ছি!'

'দ্যাখো, আর যাই বলো চুরি বলো না!' ক্ষোভার্ত কণ্ঠে আমি বলি: 'চামারি বলতে পারো ইচ্ছা করলে।... কিন্তু যারা দুবেলা চা মারে তাদের আর চামার হতে বাকী কী?'

'হাতসাফাইটা করলে কখন শুনি? অবাক লাগছে আমার!'

'সেই যখন ঝুঁকে পড়ে খবরের কাগজের ওপরে সমবেত খাদ্য-তালিকাদের দেখছিলাম, সেই সময় ওদের এই চায়ের প্যাকেটটাকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে—প্রথম দর্শনেই—'

'যাও যাও, আর বলতে হবে না। ছি ছি!—' কল্পনা কানে আঙুল দ্যায়।

সাত

বিটকেল আওয়াজে সেদিন সকালের ঘুম ভাঙল। আওয়াজটা পিছনের বাগান থেকে লাফিয়ে উঠে শোবার ঘরের জানালা ভেদ করে বর্শার মত আমার কর্ণমূলে এসে বিঁধল। কল্পনার তারস্বর তাতে ভুল নেই, কিন্তু কতটা বীরত্বঘটিত হলে তা তীরস্বরে পরিণত হতে পারে কল্পনাতেও কোনদিন ছিল না। সেই মুহূর্তে স্বকর্ণে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা গেল।

এবং শুধু কাল্পনিক কণ্ঠই নয়, সেই সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে আরেক কেকা-ধ্বনি! আনকোরা অচেনা গলার কক্ কক্। সঙ্গে সঙ্গে নীচের ঘরে সশব্দে দরজা বন্ধ হওয়ার খবর পাওয়া গেল। তারপর সব চুপ।

তীরস্বর শুনেই, কল্পনা ধনুর্ধরের মত কিছু একটা করেছে টের পেয়েছিলাম। জানালা খুলে মাথা বাড়িয়ে খোঁজ নিলাম।

'কার সঙ্গে আলাপ করছিলে গা?'

'একটা পাখি ধরেছি।' কল্পনা ব্যক্ত করল।

'পাখি? কী পাখি?'

'দেখে যাও এসে। পুরে রেখেছি আমাদের বোটুকখানায়।' নামলাম নীচে। কল্পনা

খুব সাবধানে বৈঠকখানার দরজা দেড় ইঞ্চিটাক্ ফাঁক্ করল। সাহস বুকে বাধঁতে হলো আমায়। কে জানে,একটা ঈগল কি উটপাখিই হবে হয়ত; তাড়া করে আসে যদি? যতদূর সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করে সেই দেড় ইঞ্চি ফাঁকের ভেতর দিয়ে আধ ইঞ্চি দৃষ্টি চালিয়ে দিলাম। বহু চেষ্টার পর, টেবিলের আড়ালে, আমার গদি আঁটা চেয়ারে উপবিষ্ট পাখির মত চেহারার একজন আমার চক্ষুগোচর হলো।

পাখির মত হাবভাব, কিন্তু পাখি কিনা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। পাখির মত চেহারা, পাটকেলের মত রঙ (ইঁটের মতও বলা যায়), হাতলের তলা দিয়ে প্যাট্ প্যাট্ করে আমার দিকে চাইছে। ভারী বিরক্ত চাউনি। আর জলের কলের দম বন্ধ হলে যে রকম বকুনি বেরয় অনেকটা সেই জাতীয় বক্-বক্-নিনাদ!

'কী পাখি?' জিজ্ঞেস করল কল্পনা।

সূক্ষ্মদৃষ্টির সাহায্যে যতটা পারা যায়, পক্ষী-আকারকে আমি মনে মনে পরীক্ষা করলাম।

'পাখি বলেই তো বোধ হচ্ছে।' আমি বল্লাম। —'উড়ে এসেছিল, না কি?'

'প্রায় উড়েই এল বইকি।' জবাব দিল কল্পনা: 'কিংবা কেউ ছুঁড়ে দিল যেন। বোকেন বাবুদের বাগানের দিকটা থেকে এল!'

'দ্যাখো, এখানে আমরা ফেরারী হয়ে এসেছি।—' আমার প্রখরদৃষ্টির খানিকটা পাখির থেকে টেনে কল্পনার মুখে নিক্ষেপ করি।—" এখনো এখানকার সকলের সঙ্গে ভালো পরিচয় হয়নি। এস্থলের ইতরভদ্র প্রাণীদের কে কী ধরনের কিছুই জানিনে। এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ অপরিচিত কাউকে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দেয়া কি ঠিক হবে? চোখ কান ঠুক্রে নেয় যদি?'

বাস্তবিক, ইভ্যাকুয়েশনে আসা আর খুন করে' পালানো আসামীতে কোনো প্রভেদ নেই। কারো তারা প্রীতিভাজন না। সবাই তাদের বিষ নজরে দ্যাখে। স্থানীয় বাজার-দর বাড়ানোর কারণ বলে বাজারের কারো কাছে তাদের আদর নেই। এমনকি, ওই পাখিটা পর্যন্ত দ্যাখো না, দুই চোখে বিদ্বেষ উদ্গীরণ করছে! ভেবে দেখলে, বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে পালিয়ে শেষে এই বিভুঁয়ে এসে বুনো পশুপক্ষীর গর্ভে যাওয়া কোনো কাজের কথা বলে আমার বোধ হয় না। অপরের জিভে নিজের স্বাদ-গ্রহণ খুব উপাদেয় নয়, অন্ততঃ নিজের জিভে অপরকে আস্বাদ করার মত ততটা নয় বলেই আমার আন্দাজ।

'ধরো যদি কোনো রকমের বুনো হাঁস টাস হয়? ডিম পাড়ে যদি?' কল্পনা নিজের পরিসীমা বাড়ায়: 'এখানে তো কিছুই মেলে না। খাদ্য-সমস্যাটা কিছুটা তো মিট্তে পারে তাহলে?'

বলতে কি এই জন্যেই ওকে আমি এত ভালবাসি। আমার বুদ্ধির অভাবের কিছুটা ওর দ্বারা মোচন হয়। আমার বোকামির ও ক্ষতিপূরক। আমার অনেকখানি প্রতিষেধক, বলতে কি!

আমার যেসব বন্ধু নামজাদা মেয়েদের বিয়ে করেছিল, যারা সান্ত্বনা, স্নেহ, সুষমা বা লাবণ্যলাভ করেছিল, তৎকালে মনটা একটু, খুঁতখুঁত করলেও এখন আর সে বিষয়ে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। সেই সব স্নেহধন্যরা সুখে থাকুন। তাঁদের নিজেদের সুরম্য

উপত্যকায় বিরাজ করুন আনন্দে। সেই সান্ত্বনাদাতাকেও (যিনি মুখেই খালি সান্ত্বনা দিতেন, সত্যিকার সান্ত্বনা যাঁর কাছ থেকে কোনোদিন পাইনি) অকাতরে আমি এখন মার্জনা করতে পারি। এমনকি, আমার যে-বন্ধুটি কেবল বিয়ের দৌলতেই প্রতিভাবান বলে বিখ্যাত হয়েছেন (হতে বাধ্য) তাঁর প্রতিও আমার আর ঈর্ষা নাই। কল্পনাপ্রবণ হয়েই বেশ আমি আরামে আছি।

কল্পনার তারিফ করতে হয়। ডিমের দিকটা আমার একদম্ খেয়াল হয়নি। ভাবনার দিকটাই ভেবেছি। সম্ভাবনার দিকটা ঠাওর হয়নি। কি হবে, ওর মত অমন মর্মভেদী দৃষ্টিভঙ্গি আমার কই?

'থাক্ তাহলে। কিছু পাড়ে কিনা, দেখা যাক্।' আমি বল্লাম: 'ওই বোটুকখানাতেই বসবাস করুক। আমাদের বোটুকখানায় এইতো প্রথম এখানকার সামাজিক পায়ের ধূলা পড়লো!'

বিকেলে স্টেশনে বেড়াতে গিয়ে বোকেনের সঙ্গে দেখা। (মফঃস্বলে স্টেশনই হচ্ছে একমাত্র গম্যস্থল—ঠিক রম্যস্থল না হলেও—ওছাড়া আর চড়বার জায়গা কই? সেখানে ঢাকুরিয়ার মত লেক্ নাস্তি, অন্ততঃ বর্ষাকাল না এলে দেখা যায় না, কাজেই সুন্দর মুখ দেখতে হলে রেলগাড়িরই শুধু ভরসা। তাছাড়া, থিয়েটার যাত্রা সিনেমাও দুর্লভ—রেলগাড়ির প্রবেশ ও প্রস্থানেই যা কিছু যাত্রা ইত্যাদি নজরে পড়ে।)

বোকেন আমার দিকে ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে তাকিয়ে থাকল খানিক। তারপর মুখভার যারপরনাই কঠোর করে আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল যেন: 'আমার বন্য কুক্কুট কোথায়?'

'বন্য কুক্কুট?' আমি বোকা সাজলাম: 'বন্য কুক্কুট আবার কী হে?'

'ন্যাকা! ওসব ইয়ার্কি চল্‌বে না। আমার বালিহাঁসটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বলো।'

যখন এইভাবে আমার প্রতি লালবাজার-সুলভ-জেরা চল্‌ছে ঠিক সেই মুখে যতীন এসে হাজির। তার মুখেও কেমন একটা সন্দিগ্ধ ভাব।

'তোমাদের বালিহাঁসের কথায় মনে পড়ল। তোমরা কেউ আমার সখের পারাবতটিকে দেখেচ?' বল্ল সে।

'পারাবত? তার মানে? পারাবত তো পায়রা।' আমিও না বলে' পারি না: 'মোটেই পায়রার মতো দেখতে নয়।'

যতীন আর বোকেন—দুজনেই চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকায়।

'নয়ই তো।' যতীন একমুখ হাসি এনে ফ্যালে: 'উড়ে এসে জুড়ে বসলে হয় পায়রা; আর গৃহপালিত হলে হয় কপোত। গৃহকপোতী বলা হয়ে থাকে শোনোনি! সেই বস্তুই আবার পাড়ার বাইরে পাওয়া গেলে পারাবত। এই বেড়ালই বনে গেলে বনবিড়াল হয় যেমন হে!'

'কক্ষনো তা নয়। তোমার বন্যকুক্কুটও না...আর...আর তোমার বুনো পায়রাও নয়। সারস পাখি আমি কখনো চোখে দেখিনি, যদি হয় তাহলে তাই।'

ধরা পড়ে যাবার পর আর পিছিয়ে আসা যায় না। সাফাই দিতেই হয়। —'তবে যদি বন্য সারস হয় তো বল্‌তে পারি নে।' সেই সঙ্গে এটুকুও অনুযোগ করি—'বুনোদের সঙ্গে তো এইখানেই আমার আলাপ!'

ওদের গোয়েন্দা-মার্কা চাউনি তখন পরস্পরের ওপরে পড়েছিল। পরস্পরকে সন্দেহ করছিল ওরা। উভয় পক্ষ থেকেই বিপক্ষতার কোনো ত্রুটি হোতো না, মুখোমুখি থেকে হাতাহাতি পর্যন্ত গড়াত কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা ট্রেন এসে পড়ে বাধা দেয়ায় লড়াইটা থেমে গেল।

কুরুক্ষেত্র থেকে আমরা ধর্মক্ষেত্রে চড়াও হলাম। সন্ধি করে ফেল্‌লাম। সকলের জবানবন্দী জোড়াতালি দিয়ে জানা গেল, যতীন ঐ পাখিটাকে কাল সন্ধ্যায় তার বাগানে উঁকি মারতে দেখেছিল। তার ধারণায়, পাখিটাও আমাদের মতই পলাতক, তবে ধারে কাছের নয়, সুদূর থেকে আসা, বর্মা মুলুকের আমদানি হওয়াই সম্ভব। আর বোকেন আজ সকালে পা টিপে টিপে তার বাগানের সীমান্তে পৌঁছে পাখিটাকে প্রায় ধরে ফেলেছিল আর কি, সেই সময়ে পাখিটা কেমন করে' তার হাত ফস্‌কে (পাখোয়াজির কোথাও গলদ্‌ ছিল নিশ্চয়) বেড়া টপ্‌কে আমাদের এধারে এসে পড়ে।

একজনের প্রথম দর্শন, অন্যজন থি-ফোর্থ ধরে ফেলেছিল, আরেক জনের কাছে ধরা দিয়েছে—অধিকারসূত্রের এরকম ঘোরপ্যাঁচে—পাখিটা আপাতত আমার আস্তানাতেই বাস করবে স্থির হলো।

বাড়ি ফিবে জানলাম কল্পনা ইতিমধ্যেই ওর নামকরণ কবে ফেলেছে। মীনাক্ষি! নামটা খুব অযথা হয়নি। প্রথম দেখা থেকেই ওর চাউনিতে, বিশেষ করে' আমার প্রতি ওর হাবভাবে বিজাতীয় একটা মীন্‌নেস্‌ আমি লক্ষ্য করেছি। মিনেসিং সামথিং, ভাষায় ঠিক তার প্রকাশ হয় না। মীনাক্ষি বললেই ঠিক হয়।

'ওকে আমাদের খাবার ঘরে এনে রেখেছি।' কল্পনা বল্ল: 'বোটুকখানায় ভারী একা একা বোধ করছিল বেচারা।'

'তা; বাগানে কেন ছেড়ে দিলে না? নিজের মনে বেড়িয়ে বেড়াতো।'

'বাগানে? আমাব সাহস হয় না বাপু। কেউ যদি নিয়ে পালায়?'

সে কথা ঠিক। এ যা বাগান! বাড়ি ভাড়া করেই একটা বাগানবাড়ি পেয়ে গেছি বটে—বাগানটা ফাউয়ের মধ্যেই—তবে এ-অঞ্চলে বাড়িমাত্রই বাগানবাড়ি। চারধাবে ঘেরা বেড়া দেয়া থাকলেও, এসব বাগান তৈরি করা না স্বয়ংসৃষ্ট বলা কঠিন। ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে এক একটা মনুষ্যাবাস। তার ভেতরে কোনোটা বাংলোপ্যাটার্ণ কোনোটা একতালা, কোনোটা বা আটচালা, কদাচিৎ একখানা দোতালাও। কিন্তু এগুলো যে কিসের বাগান—বাগানের কোন্‌টা যে-কী গাছ তার ঠিকুজি ঠিক করা আমার পক্ষে বাতুলতা। পত্র-পাঠ গাছ চেনা আমার অসাধ্য (প্রকৃতিরসিক আমাদের বিভূতি বাঁড়ুজ্যে মশাই-ই শুধু তা পারেন)—গাছ আমার কাছে ওষুধের মতোই—সেই রকম ত্যাজ্য এবং কেবল ফলেন পরিচীয়তে। গাছের কর্মফল না দেখে এবং স্বয়ং ফলভোগ

না ক্রবে কিছুতেই গাছ চিনতে পারি না। কিন্তু এসব গাছের ফল দেখব তার যো কি! তলায় পড়া দূরে থাক, গাছেই ভালো করে ধরতে পায় না—পাড়ার ছেলেরা এসে দেখতে না দেখতে ফাঁক করে দেয়। গাছে গাছেই তাদের ফলা, এসব বাগান হচ্ছে 'মা ফলেষু কদাচন'। একমাত্র গীতার কর্মযোগী ছাড়া আর কেউ যে অস্মিন্ দেশে বাগান করার উদ্যোগ করে না তা নিশ্চয়। এখানে হচ্ছে একজনের বাগান এবং আর-সবার বাগানো। এ বাগানে যদি পাড়ার ছেলেরা এসে এই বেপাড়ার পারাবতকে একলাটি ঘুর ঘুর করতে দেখে তাহলে যে এক মুহূর্ত ছেড়ে কথা কইবে না সে কথা খাঁটি।

খাবার সময়ে দেখা গেল মীনাক্ষি অতিশয় অবজ্ঞাভরে রেডিয়োর ওপরে বসে রয়েছে। আক্রমণাত্মক কোনো লক্ষণ ওর দেখা গেল না। যতটা মারাত্মক ভাবা গেছল তা নয়; নিতান্তই নিরীহ একটি বন্য পারাবত! (পারাবত বা যাই হোক্!) ক্রমেই দেখি মীনাক্ষি এগিয়ে এসে আমাদের থালার থেকে খাবার খুঁটে নিতে লাগল।

দেখতে দেখতে আমরাও মীনাক্ষির আসক্ত হয়ে পড়লাম। দ্বিতীয় দিনেই অদ্বিতীয় পাখিরূপে আমাদের জীবনে কায়েম হলো। একটা বুনো সারস (অথবা বালিহাঁস যাই হোক্)—যদিও কিঞ্চিৎ মনমরা—তবু গার্হস্থ্য জীব হিসাবে নেহাত মন্দ না। আর যাই হোক, যখন তখন ঘেউ ঘেউ বা ম্যাও ম্যাও নেই, কাউকে ধরে কামড়াবে না, কিংবা পাড়াপড়শীর বাড়ি গিয়ে চুরি করে দুধ মেরে আসবে না। পাড়াতুত গণ্ডগোল ল্যাজে বেঁধে আনবে না। একটা কক্‌ককে আওয়াজ আছে বটে কিন্তু বকবক কম করে। তেমন বক্তা নয়, গানের আপদ নেই, শ্লোগানের বালাইও না।

পাখিটার আমরা প্রেমেই পড়ে গেলাম, বলতে কি! আমাদের পোষ্যকন্যারূপে ওকে গ্রহণ করারও প্রায় মনস্থ করে বসেছি এমন সময়ে বোকেন আর যতীনের তরফ থেকে বাধা এল।

বোকেন এসে বললেঃ 'বাঃ বাবা! খাসা চালাচ্ছো! দিব্যি একটা খবচ বাঁচিয়ে ফেল্লে! বেশ বেশ বেশ!'

'ডিমের ভাবনা রইলো না। মন্দ কি!' যতীন যোগ দিল সেই সঙ্গে।

'তুখোর ছেলে! তবে একটু চশমখোর, এই যা!' বোকেনের বক্র কটাক্ষ।

'তোমরা বলছ কী?' আমি আকাশ থেকে পড়ি।

'বলব আর কী! ভাগ্যবানের ডিম ভগবানে যোগায়। তবে কথাটা এই, অপরেব সম্পত্তি থেকে যোগানটা আসছে এই যা!'

'ডিম?' আমার চমক লাগেঃ 'তোমাদের কি ধাবণা যে—'

'আরে না না!' বোকেনের ঠাট্টার সুরঃ 'তুমি কি আর ডিমের লোভে—কে বলে! তোমার দাতব্য অতিথশালায় গৃহহীন বন্য কুক্কুটরা এলে অমনিই আশ্রয় পায়।'

'গার্হস্থ চিড়িয়াখানা বলো।' বলল যতীন। 'এদের দুজনকেই বা বাদ দিচ্ছ কেন?'

এই রকম দিনের পর দিন ওদের কচকচি শুনতে হয়, অথচ মীনাক্ষি ওদিকে একদিনও একটা ডিম পাড়েনি। ডিম তো পাড়েনি, তার ওপরে কদিন থেকে এমন মেজাজ দেখাতে

আরম্ভ করেছে যে আমরা আর ওকে তালা দিয়ে রাখতে চাই না—বরং তালাক দিতে পারলেই বাঁচি। এমন স্বার্থপর আত্মসর্বস্ব একগুঁয়ে পাখি এর আগে আর আমার নজরে পড়েনি—মনুষ্যত্ব দূরে থাক, পক্ষীত্বের লেশমাত্রও ওর নেই।

'আজকেও ডিম পেড়েছে তো?' এই প্রশ্ন মুখে করে একদা প্রভাতে যেই না বোকেনের প্রাদুর্ভাব, অমনি না আমি অম্লানবদনে মীনাক্ষিকে ওর করকমলে সম্প্রদান করে দিয়েছি। যতীনকে সাক্ষী করে।

এবং গদগদ কণ্ঠে বলতেও দ্বিধা করিনি: 'তোমাকে ঘরজামাই করতে পারলুম না, দুঃখ থাকল' কিন্তু এই আমার অনুরোধ, আমাদের মীনাক্ষিকে তুমি সুখে রেখো। আর মীনাক্ষি মাকেও বলি, ও তোমার জন্য নিত্য নিয়মিত ডিম পাড়ুক।'

ডিমের ওর বাড়-বাড়ন্ত হোক, সর্বান্তঃকরণে সেই প্রার্থনা করে মীনাক্ষিকে ওর সমভিব্যাহারে দিলাম। এবার ওর সুর বদলায় কিনা দেখা যাক। দিন কয়েক গেল, বোকেনের কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। তবে কি মীনাক্ষিই তার সুর বদলালো না কি?

'কি হে, কিরকম ডিম্বালাভ চলছে?' কৌতূহলী হতে হলো আমায়।

'প্রত্যেকদিন একটি করে—ফাঁক নেই!' বোকেন সহাস্যবদন, 'বন্যকুক্কুট হলে কি হবে, সভ্যতায় অভ্রভেদী!'

'বলো কী!' আমি বিস্মিত না হয়ে পারি না।

'তুমি একটা অপদার্থ! কী করে ওদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় জানো না। রাত দিন রেডিয়োর বাক্সয় বসিয়ে রাখলে কি আর ডিম পাড়ে? গানের দিকে কান থাকলে ডিমের দিকে মন দিতে পারে কখনো? বাগানে দুবেলা দৌড় করাতে হয়। একসারসাইজ দরকার—যেমন আমাদের তেমনি ওদেরও। দুবেলা আমরা ওকে নিয়ে সারা বাগান চষছি—আমি একবেলা, গিন্নী আরেক বেলা। তবে তো ফলছে ডিম!'

বোকেন ওদের ঘোড়দৌড় দেখবার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ করল, কিন্তু বন্য পশুপক্ষীর কীর্তিকলাপ আর কী দেখব? তাছাড়া মীনাক্ষির আচরণে প্রাণে বড় ব্যথা পেলাম। ও যে এতটা বিশ্বাসঘাতক আর নিমকহারাম হবে তা আমি ভাবতেও পারিনি। আর অমন পাখির মুখ দ্যাখে?

সমস্ত শুনে যতীন তো খাপ্পা। 'বাঃ, মীনাক্ষি ওর একলার না কি? ওতো এজমালি সম্পত্তি। কেন, আমাদের কি বাগান নেই, না, আমরা ঘোড়দৌড় করাতে জানিনে? আমাকে যদি ও মীনাক্ষির ভাগ না দেয় তো আমি সোজা আদালতে যাব। আমার সাফ কথা আমি বলে রাখলাম।'

ঘোড়দৌড়টা আদালতের দিকে গড়ালে নেহাত মন্দ হয় না, এবং দৌড়বাজিতে ঘোড়ার সংখ্যা যত বাড়ে দৃশ্য হিসাবে ততই আরো দ্রষ্টব্য হয়ে দাঁড়ায়। সম্ভাবনাটা বোকেনের কাছে গিয়ে ব্যক্ত করতে—চেহারা ও নামের মধ্যে যতটা আশ্বাস ছিল আসলে বোকেন তত বোকা নয় দেখা গেল—সে বলে ওঠে—'ঠিক কথাই তো! কালকেই মীনাক্ষি ওর বাগানে যাবে, আসছে হপ্তাটা ওর পালা! মীনাক্ষি এই ভাবে আমাদের সবার হাত ঘুরবে, সেই তো ন্যায্য!'

বোকেন তার কথা রাখল। রাত্রি প্রভাত হওয়া মাত্র, মীনাক্ষিকে স্বহস্তে যতীনের হাতে সঁপে দিয়ে এল।

বিকেলের দিকে স্টেশনে আমাদের দেখা হতেই, বোকেন আমাকে আড়ালে ডেকে বললে : 'ওহে শোনো, তোমার সঙ্গে আর ছলনা করতে চাইনে। তুমি ঠিকই বলেছিলে। মীনাক্ষি একদম বাঁজা।'

'তবে এই যে বল্লে সেদিন, তোমার প্রক্রিয়ায় বেশ সুফল দেখা দিয়েছে!'

'কাঁচকলা! তোমাকে যা বলেছিলাম তা স্রেফ প্রচার কার্য! সিনেমা কোম্পানিতে পাবলিসিটি অফিসারের চাকরি করতাম সেটা কেন ভুলে যাচ্ছ? আর, কথাটা রটিয়েছি ওই যতনেটার জন্যেই। মীনাক্ষি ডিম পাড়ছে জানলে ও নগদ টাকায় আমাদের অংশগুলো কিনে নিতে রাজি হবে। ওর যা ডিমের লোভ! দেখো, ঠিক ও মীনাক্ষিকে একচেটে করে নিয়েছে, তুমি দেখে নিয়ো।'

'কিন্তু মীনাক্ষি যদি ডিমই না পাড়ে—' আমি হতবুদ্ধি হই।

'তোমাকে কি আর সাধে বোকা বলি!' বোকেন বলল : 'আরে না পেড়ে যাবে কোথায়? ওরা কর্তাগিন্নীতে দুবেলা মীনাক্ষির সঙ্গে হানড্রেড ইয়ার্ডস দেবে তো—সারা দিন বাগানেই ছাড়া থাকবে মীনাক্ষি। সেইসময়ে কোনো ফাঁকে বাগানের কোথাও একটা ডিম ফেলে দিয়ে আসার মামলা। সে ভার আমার উপর থাকলো। বুঝলে এবার?'

বুঝলাম বই কি! নাঃ, বোকেন তার নামের দারুণ অমর্যাদা করছে—ওইসূত্রে সেই কথাটাও আরো বেশি বুঝলাম। সেই সঙ্গে, ওর তুলনায়—নিজেকেও নিখুঁতরূপে টের পেলাম এতদিনে।

সপ্তাহ ফুরুতেই যতীনের ওপরে আমাদের নোটিশ পড়ে গেল মীনাক্ষির পালা তার খতম।

'তা—তাতে কী হয়েছে?' ও ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল : 'কাল সন্ধ্যেয় আমার বাড়ি তোমাদের নেমন্তন্ন। সেই সময়ে সবাই মিলে ভদ্রভাবে মীনাক্ষির বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।'

ওষুধ ধরেছে তাহলে। ও একাই মীনাক্ষির অভিভাবক হতে ইচ্ছুক। শুধু মুখরোচক খাদ্যের সঙ্গে সামাজিক ভদ্রতা মিশিয়ে মীনাক্ষির দরটা একটু নামাতে চায় মাত্র—ভেবে এমন হাসি পেল! হায় কাল বাদ পরশু সকাল থেকে ডিম পাড়া যখন বন্ধ হবে, তখন মীনাক্ষি প্রাস আমাদের প্রতি তার এই আদরের পরিণতি কী দাঁড়াবে তাই ভাবি। যাই হোক, সান্ধ্য ভোজে তো গেলাম আমরা। বোকেন এবং শ্রীমতী বোকেন; আমি আর আমার বুদ্ধিমতী।

সন্ধ্যেটা কাটলো বেশ। ভারতীয় চায়ের সঙ্গে স্বদেশী মাংসের পিঠে—খারাপ কি?

টেবিল থেকে পেয়ালা পিরিচ সরে যেতেই বোকেন খুক-খুক করে কাশল। ব্যাস কাশি নয়, ভদ্র কাশি, ভদ্রভাবে আলোচনা শুরু করার পূর্বাভাস।

'আচ্ছা, এইবার আমরা মীনাক্ষির ভবিষ্যৎ নিয়ে'—আরম্ভ করল বোকেন।

শুনে যতীনের শ্রীমতী তো হেসেই কুটোপাটি। যতীনও একটু হাসল, যৎসামান্য, সচরাচর বুদ্ধমূর্তির আননে যে ধরনের রহস্যময় হাসি দেখা যায়।

'তোমাদের বলতে দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু না জানিয়েও উপায় নেই।' বলল যতীন : 'বেচারী মীনাক্ষির কোনো ভবিষ্যৎ নেই।'

'য়্যাঁ—?' বোকেনের চোয়াল ঝুলে পড়ে।

'আমাদের ঈষৎ ভুল হয়েছিল—এমন কিছু না—এই লাক্ষণিক ভুল।' যতীন তেমনি অমায়িক : 'কিন্তু মীনাক্ষি যেদিন আমার হাতে এল, সেইদিনই কলকাতা থেকে আমার শ্যালক এলেন—তিনি ভেটারিনারি ডাক্তার। দেখবামাত্রই মীনাক্ষির অবস্থা তিনি ধরতে পারলেন। তখনি সব পরিষ্কার হয়ে গেল।'

'কী পরিষ্কার হলো, শুনি?' শুনে আমিও একটু গরম হই। আসল কথার পাশ কাটাবার এই চাল আমার ভালো লাগে না।

'জানা গেল যে—' বলতে দ্বিধা করল না যতীন 'মীনাক্ষি আসলে হচ্ছে মীনাক্ষ।'

এই তথ্যের গূঢ়তা গাঢ় হয়ে যতই আমাদের মর্মে প্রবেশ করে ততই তার মর্মান্তিক তীক্ষ্ণতা আমরা টের পাই।

'ডিম পাড়া তার ক্ষমতার বাইরে।' যতীন-গিন্নি কোন রকমে একটুখানির জন্য হাস্যসম্বরণ করে আমাদের আলোচনায় এই মন্তব্যটুকু যোগ করতে পারলেন। এবং তার পরেই আরেক প্রস্থ হাসি তাঁকে পেয়ে বসল আবার!

আমরা আর কোনো কথাটি না বলে নিজের গৃহিণীদের সংগ্রহ করে উঠে পড়লাম। নিঃশব্দেই।

অমায়িক যতীন আর আহ্লাদে আটখানা ওর বৌ—দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল আমাদের।

বাগানে পা দিয়ে বোকেন বললে : 'যাই হোক মীনাক্ষি কোথায়? তাকে দেখছিনে কেন?'

'মীনাক্ষি—' শ্রীমতী যতীন থেমে থেমে জানালেন : 'সেই পিঠের মধ্যে ছিল।'

'সেও অতীতের কথা। এখন পেটের মধ্যে, সেই কথাই বলো!' বলল যতীন : 'তোমার বন্য সারসটা বেশ সরস ছিল হে।' বলে কটাক্ষ করল আমার দিকে।

আমরা আর দাঁড়ালুম না। উদরস্থ মীনাক্ষিকে ধরে আমরা পাঁচ জন আমাদের সোজা পথ ধরলুম।

'হ্যাঁ, ভালো কথা।' পেছন থেকে হেঁকে বলল যতীন : 'কদিন ধরে তোমরা যে ডিমগুলো পাঠিয়েছ তার জন্যে ধন্যবাদ। সবগুলো মুরগির ছিল না, কয়েকটা হাঁসের ছোট ডিম ভেজাল দিয়েছিলে; তার মধ্যে, একটা আবার গিন্নী বলছিলেন, একটু পচাই নাকি! যাকগে, যা বাজার, আর যেরকম মাগ্যি গণ্ডা, আর যেমন দিনকাল পড়েছে তাতে ওই নিয়ে আমরা কোনো বচসা করতে চাইনে।'



ভালবাসার অনেক নাম

ভালবাসার অনেক নাম

কডলিভার তেল মেখে মুড়ি খাওয়াটাকে আমি ভালবাসার বদনাম দিতে চাইনে, কিন্তু তাই একবার খেতে হয়েছিল মেয়েটার জন্যে আমায়।

কিছুতেই শরীর সারছিল না জবার, ডাক্তার ব্যবস্থা করলেন কডলিভারের। কিন্তু তাই কি খাবার পাত্রী সে! বলে যে, কী বিচ্ছিরি গন্ধ বাবা! ভাত খাবার পরে খাবার জিনিস নয় ও। তিন চামচ কেন, ওর এক চামচ মুখে তুললেও, তক্ষুনি তক্ষুনি ভাত-টাত সব বমি হয়ে উঠে আসবে। এমনকি, অন্নপ্রাশনের ভাত অব্দি।

শোন কথা! খাওয়ার আগে খেতে কি কোন বাধা আছে? তাহলেও তো হয়? তাহলে নাকি ওর খাওয়ার রুচিই চলে যাবে একদম।

তাহলে ওর শরীর সারবে কী করে!

এগুতে হলো তখন আমাকেই—'নিয়ে আয় তোর কডলিভার। কেমন খেতে খারাপ দেখি তো! আমি যেন কখনো কডলিভার খাইনি আর! কডলিভার না খেয়েই যেন আমার এই শরীর হয়েছে—এমন হৃষ্ট-পুষ্ট মেদস্বী বপু কি অমনিই হলো নাকি আমার!'

'কডলিভার খেয়ে তুমি পুষ্ট হয়েছ একথা মানতে আমি রাজি আছি, কিন্তু হৃষ্ট তুমি কখনই হওনি, আমি দিব্যি-গেলে বলতে পারি দাদা!' জবা বলে।

'হৃষ্ট হইনি? এখুনি তোর সামনে হৃষ্ট হয়ে খাব, আর খেয়ে হৃষ্ট হয়ে দেখাব তোকে।' আমি বললাম, 'কিন্তু তোকেও খেতে হবে তার পরে।'

'আচ্ছা, আগে খাও তো তুমি দেখি। বমি না করে খাও তো দেখি একটি চামচ একবার।'

এল কডলিভার।

আমি বললাম, 'কডলিভার কি আর শুধু শুধু খায় রে! কিছুর সঙ্গে খেতে হয়, নয় কিছু খাবার আগে বা পরে। বাড়িতে ভালমন্দ খাবার কী আছে নিয়ে আয়।'

'মুড়ি আছে। খাবে?' সে বলে, 'রান্নাঘর থেকে ভাত নিয়ে আসব নাকি?'

'আরে ভাত হলে তো ভালই হয়। ইলিশমাছের তেল দিয়ে ভাত খেতে যেমন খাসা লাগে, কডলিভার দিয়ে মেখে খেতে তার চেয়ে কিছু কম উপাদেয় নয়। ও তো মাছের তেলই বটে রে, সামুদ্রিক মাছের। তবে এখন মুড়ি দিয়েই একটু জলযোগ করা যাক নাহয়।'

কডলিভার মাখা মুড়ি তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগলাম আমি। বললাম—'আরেক চামচ ঢেলে দে মুড়ির ওপর। আহা, খেতে কী ভালই না লাগছে রে! যেন আচারের তেল মেখে মুড়ি খাচ্ছি, ভাই!'

'দাও তো আমায় একগাল, চেখে দেখি।' জবা হাত বাড়ায়। গালে দিয়ে বলে—'না, ততটা খারাপ নয় তেমন।'

'ভাল লাগছে তো? বলেছিলাম না? দুদিন খা-না, তারপর দেখবি ঠিক নলেন গুড়ের মতই মনে হচ্ছে তোর। আমি মাকে লুকিয়ে চুরি করে কডলিভার খেতাম রে...দাঁড়া, কে যেন ডাকল না আমায়? তুই খেতে থাক, দেখে আসি কে ডাকছে আমাকে...'

বলে এক ছুটে বাইরে গিয়ে বমি করে উদ্ধার পাই।

সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানিনে, আমার সাত মাসির সৌজন্যে, জীবন আমার বনে বনে অরণ্য। এই অরণ্যব্যূহ থেকে এ জীবনে বেরুতে পারব সে ভরসা আমার নেই। না থাক, তার জন্য কোন খেদ নেই আমার। বনের বাইরে যে ব্যক্তি কখনো উঁকি দেবার ফাঁক পায়নি, তার জীবনও নিছক ফাঁকি নয়, তার জন্য বনের মধ্যেই লাবণ্য; প্রকৃতির বদান্যতায় তার নিমিত্ত বনান্তরালেই বিচিত্র ফলফুল; বসন্তের সমারোহ। ঊষর মরুভূমির বাসিন্দার জন্যেও মরীচিকাই নয় কেবল, ওয়েসিসও রয়ে গেছে। পাহাড়ের শুষ্ক কাঠিন্য ভেদ করে ঝর্ণাধারা উৎসারিত হয়, কার জন্যে, কে জানে!

সব ভালবাসায়ই সমান যন্ত্রণা। সব টানের একই পোড়ানি, টানাপোড়েনে সব স্নেহই সমান। কডলিভার তেলের মতই আঁশ্‌টে।

এমন কি, একদার প্রীতি যখন এক সময়ে স্মৃতিতে এসে পর্যবসিত হয় তখনো বুঝি মনের কোণে ধূপের মতই তা পুড়তে থাকে। অনুক্ষণকে সুরভিত করে রাখে পুড়ন্তকে।

আর, সেই জন্যেই ভুলে গিয়েও বুঝি ভোলা যায় না। ভুলে থাকলেও ভোলানাথের ঝুলির মধ্যে থেকে যায়। হারিয়ে গিয়ে ফিরে ফিরে আসে ফের আবার।

তাই এখনো আমার মনে পড়ে, পূজোর সময়টায় বেশি বেশি আরো, মনের জুতোয় সেই পুরনো কাঁটাটা বেরয় যেন, এতদিনের এত তালি পড়ার পরও তলায়নি সেটা দেখা যায়, চলতে ফিরতেই কোথায় যেন খচ খচ করে।

সেবার পূজোর মুখে ওদের বাড়ি যেতেই ইতু বলে উঠল—'জান শিব্রামদা, এবার আমরা মজা করে মোটরে চড়ে ঘুরে ঘুরে কলকাতার যত পূজো দেখব, মামাদের সঙ্গে বেরুব এবার, জান?'

'তাই নাকি রে?' আমি বললাম। বলতে বলতে একটা উজ্জ্বল মুখকে নিভে যেতে দেখা গেল সামনের আয়নায়। আমার নিজের। 'জবাদি আর তোমার সঙ্গে ট্যাং ট্যাং করে ঘুরবে না এবার।' পুতুল জানায়, 'তুমি যে ওকে ল্যাজে বেঁধে নিয়ে কলকাতাময় চষে বেড়াবে সেটি হচ্ছে না।'

'কে বললে? মোটেই আমি ওকে ল্যাজে বেঁধে নিয়ে ঘুরিনে।' কথাটা যেন জবার পক্ষে মানহানিকর মনে হয় আমার কাছে, তাই আমি প্রতিবাদে সোচ্চার—'বরং বলা যায়, আমিই ওর ল্যাজে বাঁধা হয়ে ঘুরে থাকি।'

আমার লেজস্বিতার বিপক্ষেই আমার ভোট।

'ওই হলো।' বলল পুতুল, 'তোমার লেজের প্রিভিলেজ জবা আর নেবে না এবার।

তোমাকেও আর ওর লেজুড় হতে হবে না। এবার সবাই আমরা মজা করে মামাদের মোটরে চড়ে সার্বজনীনে সার্বজনীনে পূজো দেখে দেখে বেড়াব কেমন!'

'আহা! মোটরে বেড়াতে যে কী মজা! এই উঠলাম আর এই দুম্ করে পৌঁছে গেলাম—দেখতে না দেখতেই। দেখবার কত কী থেকে যায় কিছুই তার দেখা হয় না।'

'কলকাতার রাস্তায় দেখবার কী আছে ছাই!' ঠোঁট ওল্টায় ইতু, 'খালি ভিড় আর ভিড়!'

'আরে, সেই ভিড়েব গভীরেই তো যত মণিব খনি! যত রমণীয় মণি। সুন্দর মেয়েরা তো কলকাতার পথেই পড়ে আছে রে! রাস্তায়ই তাদের পাওয়া যায়। দেখতে দেখতে যাও আর দেখতে না দেখতেই হারাও।' বলে আমাব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি।

'মেয়েদের আবার দেখবার কী আছে?' পুতুলের প্রশ্ন।

'তা বটে! তোদের দেখবার কী আছে আর! কিন্তু বলেছে না, যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই...বলেছে না কথায়? পেলেও পাইতে পার লুকানো রতন। মেয়েদের আশে-পাশেই ছেলেদেব পাবি—তাবা তো তোদের দেখবার বটে! কত সুন্দর সুন্দর ছেলে—তারাও ঐ পথেঘাটেই ছড়ানো। তাদেব দেখতে পারিস।'

বলে আমি পুনশ্চ যোগ কবি—'তবে ছেলেদেব মধ্যে তোরা যে কী দেখিস তা তোরাই জানিস। আমি তো ভাই ওদের ভেতর দেখবাব কিছু পাইনে। তোরা আবার তাদের দেখেই ভুলে যাস না কি—কে বলে!'

'তোমাকে বলেছে!' পুতুলচন্দর ঠোঁট ওলটায তাব: 'ছেলে দেখতে বয়েই গেছে আমাদেব।'

'আমাদের দেখতে হয় বাধ্য হযে। না-দেখে উপায কী! পৃথিবীর আদ্ধেক মেয়ে হলেও, দুনিযাব আর সব চীজেব মতই মেয়ের মধ্যেও ভ্যাজাল। ঐ ছেলের ভ্যাজাল। পৃথিবীব অদ্ধেকটাই ভ্যাজাল বলতে গেলে। কিন্তু উপায় নেই, তারাই পিতৃরূপে ভ্রাতৃরূপে আগলে বয়েছে মেয়েদের—দারোয়ানকে খুশি না করলে বাড়ির ভেতরে ঢোকার যো কী? আম খেতে হলে আঁঠিসমেতই নিতে হবে, তবে খাবার সময় আঁঠি বাদ দিয়ে খাও। তখন আব আঁঠিসুটি না দেখালেও চলে। দেওয়ানী আমে গিযে পৌঁছুলে পর তখন আর আঁঠির দেওয়ানী করার দরকার করে না। যেমন...'

একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে গিয়ে আমি থেমে যাই।

'যেমন?' পুতুল থামে না।

'যেমন, প্রথমে তো তোদের দাদার সঙ্গেই ভাব জমেছিল আমার। তাই গোরার সঙ্গেই বেড়াতাম গোড়ায়। তখন তোরা সব এই টুকুন টুকুন ছিলিস্। মিশবার মতন হসনি তখন। কিন্তু তারপরে তো...জবার সঙ্গেই ঘুরি এখন।'

'তোমার সঙ্গে টই টই করে ঘুরে জবার গায়ে গত্তি লাগল না ভাই!' আক্ষেপ করে পুতুল।

'ঘুরে ঘুরে আমরা কত কী খাই। খাই না রে জবা? চীনেবাদাম চানাচুর ঘুঘনিদানা-

আলুকাবলি ফুচকা—কত কী। কাজুবাদামও কখনো-সখনো। এক পা যাও, একটুখানি খাও। পকেটে পয়সা থাকলে সন্দেশ-রসগোল্লাও।'

'রাস্তায় আবার খায় নাকি মানুষ?' ইতু কটাক্ষ করে।

'রাস্তাতেই তো খাওয়ার বেশি মজা রে। এমন কি, যে জিনিস মানুষ স্থির হয়ে খায় আর খেলে স্থির হয়ে যায় তাও রাস্তায়, চলতে চলতে খেলে, আরো বেশি মিষ্টি লাগে, তা জানিস?' আমি জানাই: 'যেতে যেতে খাও আর খেতে খেতে যাও।'

'অতো লোকের চোখের ওপর?' ইতুর চোখ বড় বড় হয়।

'লোক কোথায় রে! ভিড় তো! ভিড়ের মধ্যে কারো কি কোন দিকে নজর দেবার ফুরসত আছে? কেউ কারো দিকে তাকায়ও না। জনারণ্যের মতন নির্জন জায়গা নেই আর।' আমি জানাই, 'পাবার যা কিছু ঐখানেই পাবে। খাবার যা কিছু ঐখানেই খাবে। আবার হারাবার যা কিছু হারাবে ঐখানেই। ঐ জনতার মধ্যেই।'

'আমরাও খাব গো। খালি মোটরে করেই যাব না। মামারাও খাওয়াবে আমাদের। গ্র্যাণ্ডে,—চাংয়োয়ায়, কফি হাউসে—কলকাতার নামজাদা যতো বড় বড় রেস্তরাঁয়। তোমার মতন চার পয়সার চানাচুর নয়—চপ কাটলেট ফিশফ্রাই কত কী খাব আমরা মজা করে কেমন!'

'তোদের খালি খাই খাই! খাওয়া আর খাওয়া। খাওয়াটাই কি জীবনের সব নাকি? দেখাটা কিছু না? অবশ্যি, নানারকম চেখে দেখা যে মন্দ, এমন কথা আমি বলিনে, কিন্তু নানাবিধ চোখে দেখাটা? বললাম না যে পৃথিবীতে আমাদের আধাআধি বখরা—আদ্ধেক ছেলে আর আদ্ধেক মেয়ে। ছেলেগুলো সব তোদের জন্যে...বললাম না?'

'তোমার যেমন মেয়ে দেখবার ঝোঁক, আমাদের তত ছেলে দেখার শখ নেই। সত্যি বলতে, রাস্তায় বেরুলে ছেলেদের দিকে তাকাইওনে বড় আমরা। মেয়েদেরকেই দেখি—আমরাও। তোমার চোখ নেইকো, তাই তোমার নজরে পড়ে না।'

'মেয়ে দেখিস! তোরা তো মেয়েদের শাড়িটাই দেখিস খালি। কে কী রকম শাড়ি পরেছে, কেমন করে পরেছে...এই সব তো দেখিস। আর আমরা দেখি শুধু মেয়েদের...তার শাড়ি-টাড়ি সব বাদ দিয়ে...আমাদের স্বভাবসিদ্ধ দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে।'

'আর তোমরা বুঝি শাড়ি দ্যাখো না? চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি...কে বলেছিল গো? চণ্ডীদাস, না, কোন চণ্ডীদাসী?'

'আরে, আমিও তো সেই কথাই বলছি রে। আমারও সেই কথা, তবে একটু অন্য বানানে...আহা, চলে nil শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর...আহা!...'

মুখের আহাকার দিয়ে মনের হাহাকার চেপে চলে এলাম, আর গেলাম না ওদের বাড়ি...পূজোর সময়টায় গেলাম না আর।

কী হবে গিয়ে? জবা কেমন তার বোনদের সঙ্গে মজা করে মামাদের মোটরে ঘুরে পূজো দেখে বেড়াচ্ছে...কত কী খাচ্ছে নামজেয়াদা যত রেস্তোরাঁয়...কী হবে তাকে

সেই সুখের থেকে ছিনিয়ে কলকাতার পথে পথে আমার মতন হতভাগার সঙ্গে ট্যাং ট্যাং করে ঘুরিয়ে? বললে হয়ত আসত...তেমন প্রতিবাদ করার স্বভাব নয় জবার, মুখ বুজে চলে আসত আমার সঙ্গে...কখনো কোন কথায় না বলে না...আহা, বেচারীর জন্যে আমার মায়া করে।

বাসা ফাঁকা, সবাই যে যার বাড়ি চলে গেছে পূজোর ছুটিতে। আমার তো আর বাড়ি-ঘর-দোর নেই, যাব কোথায়? সারা বাসায় একলাটি আমি। খোলা বারান্দায় ডেক-চেয়ারে শূন্য আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কাটিয়ে দিলাম পূজোর ক'দিন।

আমিও আর বেরুলাম না কোথাও। কোথায় যাব? রাস্তায় সুন্দর সুন্দর মেয়েরা আছে জানি, কিন্তু তারা তো বিলকুল কিচ্ছু না, সুন্দর সুন্দর শূন্য কেবল। যে একজন পাশে থাকলে তারা সত্যিকার সুন্দর হয়ে ওঠে, দেখবার মতন হয়, সেই একটিই তো আমার পাশে নেই। সেই একটি থাকলেই তবেই না পৃথিবী সুন্দর...পৃথিবীর সবকিছু সুন্দর? সেই এক-টি পাশে থাকলেই তবেই না এইসব শূন্যের মূল্য বেড়ে যায়...দশগুণ...একশগুণ...হাজারগুণ?

অসহ্য ভিড় রাস্তায়। আর কী দারুণ হট্টগোল। তবে হ্যাঁ, সেই একজন পাশে থাকলে এই অসহনীয় ভিড়ও গভীর আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। ভিড়ের ভেতর তাকে জড়িয়ে, আগলে নিয়ে যাবার সুযোগে চারধারের চাপে জর্জর হতে ভালই লাগে আরো বরং। সঙ্গীর মত সঙ্গী থাকলে সেই নিদারুণ সঙ্গীন অবস্থাও সঙ্গীতের মতই হয়ে ওঠে সত্যি।

সেই একজনের আলোতেই সব কিছু দেখা যায়...সমস্ত দর্শনীয় হয়ে ওঠে...সে-ই তো আলো। কিন্তু সে কোথায়?

পূজোর পরে বিজয়ার মিষ্টি কুড়োতে বেরুলাম। বিজয়ার পর দিগ্বিদিক-বিজয়ে।

প্রথমেই গেলাম ওদের বাড়ি।

দোরগোড়াতে ইতুর সঙ্গে দেখা হতেই শুধালাম—'কী রে! কী রকম কাটালি পূজোটা?'

'ভারী মজায় কেটেছে শিব্রামদা। আজ এ মামার গাড়িতে কাল সে মামার গাড়িতে...কিন্তু এ-কদিনই তুমি এলে না কেন বল তো? দিদি পূজোর ক'দিন একদম বেরোয়নি, বাড়ির থেকে...কখন তুমি আসবে বলে বাড়িতে বসে ছিল সারাক্ষণ।'

'তাই নাকি রে জবা?'

জবা কিছু বলল না, একটুখানি হাসল কেবল।

ওই চোখ আর অমন হাসি আর কোন মেয়ের আমি দেখিনি আমার জীবনে।

একটি মেয়ের জন্য

অনেক দিনের পর শ্রীমান অশোক চট্টোপাধ্যায়ের দর্শন মিললো আমার আস্তানায়। অশোক আমার ভাগনে-রত্নদের একজন।

'কোথায় ছিলিরে অ্যাদ্দিন?' আমি শুধালাম।

'এলাহাবাদ গেছলাম মামা।'

'ও বুঝেছি। তাজমহল দেখতেই!' আমি ঘাড় নাড়ি।

'তাজমহল কি এলাহাবাদে নাকি গো?' আমার কথায় সে ভারী অবাক হয়, 'তাজমহল তো আগ্রায়। তোমার ভূগোল জ্ঞান তো খুব-টনটনে দেখছি মামা!'

'ও—তাই নাকি রে! আমার ধারণা ছিল ফতেপুর সিক্রিতেই। তা, তুই যখন বলছিস, তাহলে আগ্রাতেই হবে হয়ত।' আমি মেনে নিই।

আমার ভূগোল জ্ঞান সত্যি ভারী গোলমেলে। ভূগোলের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। যথার্থ বলতে, সানফ্রান্সিসকো যে কোথায়, কলঙ্করূপে সূর্যে, না নিষ্কলঙ্করূপে ফ্রান্সে—তাও আমি সঠিক বলতে পারব না। তবে নায়াগ্রাপ্রপাত যে আগ্রায় না, তা আমার জানা আছে বেশ।

'কী জন্যে গেছলি এলাহাবাদ—এত খরচা করে এই সময়? এমনি বেড়াতেই—না কী?'

'বেড়াতেই, তবে একপয়সা খরচা না করে। বিলকুল মুফৎ, মামা।'

'বটে? বটে?' শুনে আমার উৎসাহ হয়। 'বিনা টিকিটেই সেরেছিস বুঝি?'

'না মামা! ইনফ্যান্ট্রি মিলিটারি কমিশনে একটা ইণ্টারভিউ দিতে গেছলাম যে!'

'অ্যাঁ?' শুনেই আমার পিলে চমকায়। 'যুদ্ধু করতে? বলিস কি রে তুই?'

'না না, যুদ্ধু করতে নয় ঠিক, তবে কি জানো মামা, সৈনিক জীবনলাভের কোনো সুযোগ এলে সেটা আমার ছাড়তে ইচ্ছে করে না। সৈন্যদলে, কি বিমানবহরে, কি নৌবাহিনীর জন্যে সরকার লোক চেয়ে বিজ্ঞাপন দিলেই অমনি আমি একটা আবেদন ঠুকে দিই—যদিও আমি ভালোমতই জানি তেমন কাজ পাবার সৌভাগ্য আমার কোনদিনই হবে না।'

'কী করে জানলি?'

'জানি যে ইণ্টারভিউয়ের প্রথম ধাপই আমি উৎরাতে পারব না। প্রথম পরীক্ষা পাশ করতে পারলে তবেই তো সৈনিকের চাকরী—তারপরেই না যুদ্ধটুদ্ধ? অতদূর আমায় এগুতেই দেবে না ওরা।'

'একেবারে দেবে না? একদম বদ্ধপরিকর?'

'কই আর দিচ্ছে! এই নিয়ে তো চারবার ইণ্টারভিউ দেওয়া হলো চার জায়গায়—হলো আর কই! তবে একটা হলো বটে, সরকারী খরচায় যাওয়া আসা থাকা খাওয়া...নানা দেশ—দেশই বলো আর প্রদেশই বলো—ঘুরে ঘুরে দেখে আসা হলো বেশ। এইটেই যথালাভ।' বলে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'তবে খুব ভালো কাজ ছিল এটা মামা, কমিশনের চাকরি, বেশ মোটা মাইনের...।'

'এটাও হলো না?'

'না।' বলে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, 'আর হোলো না শুধু তোমার জন্যই।'

আমার জন্যে? শুনে তো আমি হতবাক।

'হ্যাঁ।·নরানাং মাতুলক্রমঃ বলেছে না একটা কথা? তোমার ঐ ক্রম-টা আমার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে, কী করে হলো কে জানে!'

আমি কোনো কথাটি না বলে ওর ধারাবাহিকের ক্রমশ প্রকাশ্যর আশায় উদ্গ্রীব হয়ে থাকি।

'? ? ?' মুখে কিছু না বলে স্বচক্ষে আমার প্রশ্নটা তুলি।

'সত্যি, ভারী সংক্রামক ব্যায়রাম এই মামারা!... 'আমার ইণ্টারভিউ ছিল সাড়ে আটটায়।' অশোক প্রকাশ করে, 'আমি হাজির হয়েছি গিয়ে সাড়ে নটায়। ইণ্টারভিউ-এ একঘণ্টা লেট। বোর্ডের একজন মেম্বর আমায় জিজ্ঞেস করল—এত দেরি হলো কেন? আমি বললাম—আজ্ঞে, স্যর, ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেছে। রোজই দেরী করে ওঠার অভ্যেস কিনা! এ অভ্যেস কোথা থেকে পেয়েছি তা আর বললাম না, তোমার কথা কি বলা যায় সেখানে? তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই যে এই দশা আমার হয়েছে তা আমি বলি কী করে? তাই চেপে গেলুম বেমালুম।'

'বেশ করেছিস চেপে গিয়েছিস। আমি সায় দিই—নইলে হয়ত আমায় ডি-আই-রুলে পাকড়াও করত এখন।'

তখন ভদ্রলোক বললেন, 'ধরো যুদ্ধ বেধে গেল ফ্রণ্টে। তখন এই বদ অভ্যেসের জন্য লড়াইয়ে যোগ দেবার দেরি হয়ে গেল তোমার, তাহলে...?'

আমি জবাব দিলাম—'আজ্ঞে, তাতো হতেই পারে...। ঘুমের ওপর কি কারো জোর আছে?'

তারপর আমাকে আরো শুধালো—'ধরো, তুমি যদি লটাবিতে হঠাৎ হাজার বারো টাকা পাও তাহলে সেই টাকা দিয়ে কী করবে তুমি? আমি বললাম, খেয়ে দেয়ে ফুর্তি করে উড়িয়ে দেব টাকাটা। একটা পয়সাও জমাবো না তার।' এরকম জবাব তারা প্রত্যাশা করেনি। শুনেই না পত্রপাঠ বিদায় করে দিল আমায়। চাকরির অ?গই ডিসমিস হয়ে গেল আমার।'

'কী রকম জবাবের প্রত্যাশা ছিল তাদের?' আমি জানতে চাই।

'তারা আশা করেছিল যে, ওর মোটা অংশ দিয়ে আমি ডিফেন্স বণ্ড কিনব আর বাকীটা দিয়ে দেব প্রধানমন্ত্রীর আর্তত্রাণ তহবিলে। এই রকম ধারার একটা কিছু বোধ হয়। কিন্তু তেমন জবাব আমার এই পাপ জিভের ডগায় জোগাবে কী করে? সেই ছোট্ট বেলার থেকে তোমার দৃষ্টান্ত দেখে দেখে মানুষ তো! তুমিই আমাদের মাথা খেয়ে রেখেছ মামা!'

'যাক্, না হয়েছে ভালোই হয়েছে...। আমি সান্ত্বনাচ্ছলে বলি—কোথায় কবে কোন্ লড়াইয়ে গিয়ে বেঘোরে তুই মারা পড়তিস...।'

'আমার এক মুসলিম বন্ধু কিন্তু পেয়ে গেল চাকরিটা। ঠিক সময়ে হাজিরা দিয়েছিল, ঠিক ঠিক জবাব দিয়েছিল সে। কিন্তু সেজন্যে নয়, শেষ পর্যন্ত একটা মেয়ের জন্যই চাকরিটা হলো তার।'

'ও, বুঝেছি।' সমঝদারের মতন আমি সমঝে নিই, 'সেই ইন্টারভিউ বোর্ডে মেয়েরাও ছিল বুঝি তোর?'

'মিলিটারি ইন্টারভিউ বোর্ডে কারা থাকে তার কোনো ধারণা আছে তোমার?' ভূগোল জ্ঞানের পরিচয় পাবার পর সে আমার সাধারণ জ্ঞানের বহর বিচার করে। '—জানো, লেফটেনান্ট কম্যাণ্ডার, কম্যাণ্ডিং অফিসার এঁরাই সব থাকেন ইন্টারভিউ বোর্ডে। এরা সব মেয়ে নাকি?'

'মেয়েই তো মনে হয়। আমি জানাই।'

'!...!'...অশোক মুখে কিছু বলে না, তার জবাবটা কেবল তার আর আমার চক্ষুগোচর করে দেয়। একটু আগে আমার চোখে যেমন— ? ? ?—আমার প্রশ্নপত্র প্রকাশিত হয়েছিল তেমনি এবার ওর অবাক চক্ষে দুটি বিস্ময়চিহ্ন বিমুদ্রিত হতে দেখলাম— !

'যদি না হয়ে থাকে তো জানি না,' আমার সাফাই গাই—'কিন্তু মেয়েরাই হবে আমার ধারণা। লেফটেনান্টকে যে কম্যাণ্ড করে সেই তো লেফটেনান্ট কম্যাণ্ডার? তার বৌ ছাড়া আর কে তাকে কম্যাণ্ড করার ক্ষমতা রাখে? তেমনি কোনো অফিসারকে যে কম্যাণ্ড করতে পারে এবং করেও, যার কথায় সেই অফিসার ওঠ-বোস করে লেফট-রাইট করে থাকে, সে তার বৌ ছাড়া আর কে হবে আবার?'

'খুব হয়েছে।' এক কথায় আমার এতবড় কথাটা সে উড়িয়ে দেয়—'কমিশনের ইন্টারভিউ বোর্ডের—জেনে রাখো মামা, ত্রিসীমানায় কোনো মেয়েটেয়ে থাকে না।'

'তুই-ই বলছিস মেয়ের জন্যই চাকরিটা হলো তার, আবার তুই নিজেই ফের বলছিস বোর্ডের কোথাও কোনো মেয়ে ছিল না—উল্টোপাল্টা গাইছিস তো তুই নিজেই!'

'রশিদুল হকের গল্পটা শোনো আগে, তবেই না বুঝবে। 'অশোক বলে,' বোর্ডের ইন্টারভিউয়ে ভারী ভারী মিলিটারি অফিসাররা থাকেন সব। ...তারপর, রশিদের মুখে যা শুনেছি পরে, যেমন যেমনটা শুনলাম...বলছি তোমায়...।'

ওর বিবৃতির জন্য আমি উৎকর্ণ হই।

'ইন্টারভিউ নেয়া হয়ে যাবার পর,' বলতে থাকে অশোক, 'আপনাকে আমরা নেব কিনা চিঠি দিয়ে পরে জানাব আপনাকে, বলে বোর্ড যখন রশিদুলকে প্রায় বিদায় করে দিচ্ছে তখন সে বোর্ডকে বলল, যাবার আগে আমার দু-একটা কথা কি আপনাদের জানাতে পারি? তাঁরা বলেছেন, হ্যাঁ বলুন বলুন! বাধা কী? তখন রশিদুল বলেছে, দেখুন স্যার, ইন্টারভিউ দেবার পর আমি দু'টো সম্ভাবনার কথা ভাবছি, প্রথমত, আমি চাকরিটা পেতে পাঁরি, দ্বিতীয়ত, চাকরিটা না পেতে পারি। চাকরি যদি নাই পাই, তাহলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু চাকরিটা পেলে আরো দুটো প্রশ্ন তখন আমার মনে জাগবে—এক—আপনারা আমাকে হেড কোয়ার্টার্সে রাখতে পারেন, দুই—আপনারা আমায় সীমান্তে পাঠাতে পারেন...'

বোর্ডের একজন বলেছেন—'তাতো পারিই। তবে প্রপার ট্রেনিং দেবার পরই সে কথা।'

'সেই কথা ভেবেই আমি বলেছি, বলল রশিদুল, তারপর যদি আপনারা আমায় হেড কোয়ার্টার্সে রাখেন তাহলে আমার আর বলার কিছু নেই। কিন্তু যদি আপনারা আমায় সীমান্তে পাঠান তখন আরো দু'টি সম্ভাবনা দেখা দেবে। প্রথমত, আপনারা আমায় পাকিস্তান-সীমান্তে পাঠাতে পারেন, দ্বিতীয়ত, আমাকে চীন-সীমান্তে পাঠাতে পারেন। যদি আমাকে পাক-সীমান্তে পাঠান তাহলে কিছু বলার নেই। কেননা তারা আমায় মারতে পারবে না, সেখানে ভয়ের কোনো কারণ নেই আমার...।'

'এ কথা বলছ কেন? বোর্ডের এক সদস্য বাধা দিয়ে তাকে শুধিয়েছেন, তুমি মুসলমান বলে পাকিস্তানীরা তোমায় রেহাই দেবে ভেবেছ? মারবে না তোমাকে?'

'আজ্ঞে না, মারবার কোনো ক্ষমতাই হবে না তাদের। উলটে তারাই মার খাবে আমাদের কাছে। পাকিস্তানীদের আমরা ভয় করিনে, কিন্তু যদি আপনারা আমায় চীন-সীমান্তে পাঠান তাহলে আরো দু'টো সম্ভাবনার কথা আমি ভাবছি...প্রথম, চীন ভারত আক্রমণ করতে পারে, দ্বিতীয়, নাও করতে পারে।'

'চীনাকে চেনা কঠিন।' মন্তব্য করলেন বোর্ডের একজন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর। কিন্তু চীন যদি ভারত আক্রমণ না করে তাহলে কোনো কথাই নেই, কিন্তু যদি আক্রমণ করে তাহলে আরো দুটি সম্ভাবনার কথা ওঠে। যুদ্ধে আমি মারা যেতেও পারি আবার না যেতেও পারি। যদি মারা না যাই তাহলে আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু মারা গেলে আরো দুটি প্রশ্ন দাঁড়ায়—আমার মৃতদেহ পাওয়া যেতে পারে, আবার নাও পাওয়া যেতে পারে...।'

'না পাওয়া যাবে কেন? বোর্ডের একজন শুধাল। মৃতদেহ তো আর পালিয়ে যায় না।'

'চীনেরা আমায় খেয়ে ফেলতে পারে। শুনেছি ওরা মানুষ খায়। কিন্তু চীনেরা যদি আমায় খেয়েই ফেলে তার জন্যে মোটেই আমি চিন্তিত নই। কিন্তু যদি না খায় আর আমার মৃতদেহ পাওয়া যায় তখন আরো দুটো সমস্যা ওঠে। হয় আমার মৃতদেহ আমার আত্মীয়দের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, নয় আমার শবদেহ সীমান্তেই কবরস্থ করা হবে। যদি আমার আত্মীয়-স্বজনের কাছে আমার দেহ পাঠানো হয় তাহলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু যদি আমায় সীমান্তেই কবর দেওয়া হয় তাহলে আমি আরো দুটি সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিতে পারি না। এক নম্বর সম্ভাবনা, আমার কবরের জমির ওপর ঘাস গজাতে পারে, দুনম্বর, আবার ঘাস নাও গজাতে পারে। ঘাস না গজালে আমি কিছু বলতে চাই না, কিন্তু যদি ঘাস গজায় তাহলে আরো দুটি সম্ভাবনা দেখা যায় আবার... গরুতে সে ঘাস খেয়ে ফেলতে পারে, আবার নাও খেতে পারে। গরুর পেটে সে ঘাস—গরু যদি ঘাস খেয়ে ফেলল তো ল্যাঠা চুকেই গেল, কিন্তু যদি সে সুযোগ সে না পায় তাহলে সেই ঘাসের থেকে আরো দুটো জিনিস ঘটতে পারে। এক, সেই ঘাস কোনো খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে—শুনেছি প্রোটিনের বিকল্প রূপে ঘাস নাকি বেশ পুষ্টিকর—নয়তো কাগজ তৈরি হতে পারে সেই ঘাসের থেকে। কাগজ তৈরি হলে আবার দুটি সম্ভাবনা দেখা দেয়—একনম্বর, লেখার কাগজ, দুনম্বর, টয়লেটের

কাগজ। লেখার কাগজ হলে তার যা গতি হয় হোক গে, বই ছাপা হোক বা হিসেবের খাতা হোক তা নিয়ে আমার কোনো মাথা-ব্যথা নেই, কিন্তু যদি তার থেকে টয়লেটের কাগজ তৈরি হয়...মানে আমি যদি টয়লেট পেপার হই তাহলে আমার ভাবনার কারণ আছে। হয় কোনো ছেলে সেই টয়লেট কাগজ ব্যবহার করবে নয়তো কোনো মেয়ে...' বলে রশিদুল হক একটু থামে... 'এইবার আমার শেষ কথাটি আমি বলতে চাই। বলতে পারি স্যর আপনাদের কাছে?' জিজ্ঞেস করে রশিদ।

'অসঙ্কোচে বলতে পারেন।' অভয় দিল বোর্ড।

'তখনো আমার দুটি সম্ভাবনা রয়েছে স্যর।' জানায় রশিদুল—'সেই আমার শেষ সম্ভাবনা।' বলে আমার বন্ধু রশিদুল হক একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

'যদি সেই টয়লেট পেপার কোনো ছেলে কাজে লাগায় আমার বলার কিছু নেই, কিন্তু যদি সেই টয়লেট কোনো মেয়ের কাজে লাগে, মানে, টয়লেট কাগজ হয়ে কোনো মেয়ের কাজে আমি লাগি তাহলে একটা কথা আমি বলতে চাই...।'

এই পর্যন্ত বলে অশোক একটুক্ষণের জন্য থামল। কীভাবে কথাটা প্রকাশ করবে তাই সে ভাবতে লাগল বোধহয়।

'কী কথা বলল তোমার বন্ধু শ্রীরশিদুল হক?' আমি অশোককে উস্কে দিতে চাই।

'না-হক কিছু বলেনি। হককথাই বলেছে মামা। সে তখন বলল, মহোদয়গণ, তাহলে এ-চাকরিটা আমাকে দিতেই হবে আপনাদের। কেননা, আমি বাল্যকাল থেকেই একটি মেয়ের স্বপ্ন দেখেছি...সেই মেয়েটির জন্যেই আমার এই জীবন ধারণ...আব আমি সেই মেয়েটির জন্যই আমার জীবন দান কবতে চাই। যদিও তাকে কখনো আমি দেখিনি, কোনদিনও দেখতে পাব না আর, তাহলেও, মবে গিয়েও আমাব প্রাণ দিয়েও যে তাব একটুখানি সেবায় লেগেছি—লাগতে পেবেছি তাই ভেবেই আমার পরিতৃপ্তি। তাব দেখা কখনো না পেলেও তার একটু ছোঁয়া যে পেলাম...সেই এতটুকু তার স্পর্শসুখের থেকে দয়া করে আপনারা আমায় বঞ্চিত করবেন না, এই আমার আর্জি।'

বোর্ড তখন একবাক্যে বলল—'তোমার আর্জি মঞ্জুর।'...সেই মেয়েটির জন্যই শেষ পর্যন্ত এই চাকরিটা হলো তার।' বলে অশোকেব কাহিনীর উপসংহাব।

কণ্ঠলগ্ন

'ভারী সমস্যায় পড়েছি মশাই!' গোবর্ধন আমার অধ্যবসায়ের মাঝখানে এসে বসল। গল্প লিখছিলাম।

'কী সমস্যা?' আমার নিস্পৃহ প্রশ্ন। 'তোমার সমস্যা তো তোর গুরুজনদেরই জানাতে হয়। তাঁরাই তো তামার-সমাধান করবেন। বাড়িতেই তো আছেন...তোমার দাদা...তোমার বৌদি...'

'সব কথা কি বলা যায় দাদাকে?' গোবরার একটু লজ্জা-লজ্জা ভাবঃ 'দাদা কি তাহলে রক্ষে রাখবে নাকি? ...আমি প্রেমে পড়েছি।'

'তাই নাকি হে?' আমার চক্ষের সমক্ষে যেন শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হতে দেখলাম। নবোদিত দিবাকরের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে আমার একটু উৎসাহের সঞ্চার হলো—'তোমার বৌদির প্রেমে পড়েছ বুঝি?'

'ছি ছি ছি!' কথাটায় গোবরা যেন কুঁকড়ে যায়—'বৌদির প্রেমে কেউ পড়ে নাকি? বৌদি মায়ের মতন না?'

'তা বটে।' সায় দিই আমি—'বাচ্চা ছেলেরাই বৌদির প্রেমে পড়ে বটে! অবোধ বালক তো! যাহা পায় তাহা খায়। তোমার মতন এত বেশি বয়সে...তা বটে...বৌদি মা কেন, প্রায় পিসিমার মতই বলতে গেলে এখন।'

বৌদির প্রেমে পড়ার সম্ভাবনাতে থ না হলেও ওর এই কথাটায় একটুখানি থই মেলে। কিন্তু বলতে কি, হর্ষবর্ধনের দিক থেকে আশ্বস্ত হলেও আমার উৎসাহ যেন উপে যায়। প্রায় উপেন্দ্রনাথের মতই আমি অস্তায়মান দিবাকরের দিকে কটাক্ষ করি। না, কোনো উপন্যাস নয়, উপন্যাসের মাল-মশলাও না। বৌদির পিসিমা হয়ে যাবার পর প্রেমের সীমান্তে পোঁছে গেছি বলে আমার ধারণা হয়। আমি অন্য প্রসঙ্গে যাই—

'তোমার দাদা কী করছেন এখন?' আমি শুধাই: 'তোমার বৌদির কাছে ঘুর ঘুর করছেন তো?'

'কোনো কালেই নয়।' সে বলে: 'যা করে থাকেন চিরকাল। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছেন।'

'একা একা?' অ্যাঁ, প্রকৃতিরসিক হয়ে গেল নাকি লোকটা, খটকা লাগে আমার।

'না না একলা কেন? তাঁর পাঞ্জাবী কণ্ট্রাক্টারের সঙ্গে ট্রাকে করে ঘুরছেন তো! গাছ বাছছেন, গাছ কাটাচ্ছেন, তারপরে ট্রাক বোঝাই করে কাঠ পাঠাচ্ছেন আমাদের কলকাতার কারখানায়। আমাদের কাঠের কারবার, জানেন না? ঐ কাঠের জন্যেই তো দাদার এই ঘাটশিলায় আসা।'

'তা জানি। তাঁর পাঞ্জাবী কণ্ট্রাক্টারকেও জানি। জানি তার মেয়েকেও।' জানাই আমি। 'চমৎকার মেয়েটি। পাঞ্জাবী হলেও বাংলা বলে চমৎকার। শান্তিনিকেতনে ছিল কিনা।'

'বাঙালী মেয়ে বলেই মনে হয়—তাই না দাদা?'

'স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে ঠিক না হলেও, তবে সৌন্দর্যের হিসেবে বলতে পারো বটে। সব সময় ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায় মেয়েটা।' আমি বলি: 'দাহিগড়ার দিকে গেছলাম সেদিন, আমার ভাইঝির শ্বশুরবাড়ি। আলাপ হয়েছিল সেইখানেই।'

'আলাপ হয়েছে আপনার সঙ্গে? এর মধ্যেই হয়ে গেছে?' তির্যক দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকায়।

'এমনি আলাপ। এমন কিছু আলাপ নয়।' আমি বলি: 'কিন্তু তোমার কথাটা তো বললে না? কার প্রেমে এমন করে পড়তে গেলে হঠাৎ?'

'বললাম তো। ঐ মেয়েটির প্রেমেই পড়েছি যে।'

'তাই নাকি হে!' শুনে আমার তাজ্জব লাগে। কিন্তু ভেবে দেখলে বিস্ময়ের কী আছে, বিশ্ব জোড়া ফাঁদে অশ্বারোহিণীকে যদি এক গোবেচারীর সঙ্গে বাঁধে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু তাহলেও পাঞ্জাবীকে গায় চড়ানো যায়, হাওয়ায় ওড়ানো যায়, অঙ্গে

ধারণ, এমন কি পাগড়ির ন্যায় শিরোধার্য করতেও বাধা নেই, কিন্তু তাকে উদ্বাহবন্ধনে বাঁধা যায় কি! খটকাটা আমার ব্যক্ত করি।

'আরে মশাই! ভাব করতেই পারছি না! বিয়ে তো ঢের পরের কথা!' সে বলে: 'কী করে যে তার সঙ্গে ভাব জমাই তাইত হয়েছে সমস্যা।'

'ভাব করতে পারছ না?'

'কই আর পারছি!'

'কেন, পারছ না কেন?'

'কী করে করব! ঘোড়ার থেকে নামেই না যে মেয়েটা। কতো আর ঘোড়ার সঙ্গে তাল রেখে, ঘোড়ার তাল সামলে আলাপ চালানো যায় বলুন!'

ভাবনার কথাই বটে। প্রেম এমনিতেই ঘোরালো, তার মধ্যে যদি আবার ঘোড়া এসে আলো করেন তো অন্ধকার দেখতে হয় বইকি!

'তাইত গোবরা ভায়া, ভাবনার কথাই দেখছি। ভালবাসার সীমান্তে গোধূলি লগ্ন, সেটা ঠিকই, কিন্তু তার আগে তো কণ্ঠলগ্ন বলে একটা রয়েছে। আগে গলায় গলায় ভাব না হলে আর তলায় তলায় না জমলে...শেষ পর্যন্ত কী কখনো বিয়ে হয়?'

'কী করে হবে গলায় গলায়? আমি একতলায়, সে রইল দোতলায়—দুজনে সমান স্তরের না হলে কী করে তা হবে? সমান সমান না হলে কি ভালোবাসা হয়? কথায় বলে সমানে সমানে ভালোবাসা। অন্ততঃ মাথায় মাথায় সমান তো হতেই হবে। কিন্তু পাশাপাশি না এলে তা কী করে হয় বলুন?'

'তা বটে! কাছাকাছি না এলে তো, ওই যে কী বলে ঐ কণ্ঠলগ্ন, তাও তো প্রায় আসবে না!' আমি সায় দিই ওর কথায়।

'তাহলে কী করবে ঠিক করেছ?'

'ভাবছি ঘোড়াটাকে খুন করে ফেলব।' প্রতিদ্বন্দ্বীসুলভ প্রতিহিংস্রতা প্রকাশ পায় ওর—'আমাদের মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ রাখব না।'

শুনে আমি চমকে যাই। প্রেম একটা যজ্ঞ হলেও তাকে রাজসূয় বলেই আমি জানি, রাজার মতন শুয়ে শুয়ে করবার জিনিস; কিন্তু প্রেমের জন্য অশ্বমেধ করতে যাওয়া...ঠিক গোবর্ধনসুলভ না হলেও, হয়ত প্রেমিকের যোগ্য বলেই আমার মনে হয়।

'কিন্তু সেটা করাটা কি ঠিক হবে? ঘোড়াকে খুন করলে ফাঁসি হয় কি না জানি না, কিন্তু তোমার জেল হয়ে যাবে নির্ঘাত!'

'তাহলে কী করে কী করব!' সে হতাশ হয়ে বলে: 'আর তো কোনো পথ দেখি না দাদা! মাঝখানে ঐ ঘোড়াতেই আটকাচ্ছে যে আমার।' সখেদে সে জানায়: 'ঘোড়াতেই আমার গলদ হয়েছে। গোড়াতেই গলদ।'

'কিন্তু ঘোড়া থেকে খোঁড়া হলে চলবে কেন?' আমি উৎসাহ দিই ওকে: 'যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে। ওই ঘোড়া ধরেই তোমাকে এগুতে হবে ভাই!'

'ঘোড়া ধরে?'

'হ্যাঁ। ঐ ঘোড়ার কিস্তিতেই মাত করতে হবে তোমাকে। ইংরেজিতে একটা কথা

আছে, জানো কি? লাভ মি, লাভ মাই ডগ। তার মানে, কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাতে হলে তার পেয়ারের কুকুরটিকেও ভালবাসতে হয় এক্ষেত্রেও, গোড়ায় তোমায় ঘোড়ার প্রেমে পড়তে হবে ভাই! ঘোড়ার থেকেই এগুতে হবে, তাহলেই তোমার পথ পরিষ্কার।'

'কী রকম? খুলে বলুন!'

'তুমি যদি ওর ঘোড়াটিকে ভালবাসো, তার সঙ্গে ভাব জমাতে যাও, মেয়েটি তাতে মোটেই অবাক হবে না। সন্দেহের চক্ষে দেখবে না তোমায়। ঈর্ষান্বিতও হবে না। কেননা, সেও তো তার ঘোড়াকে ভালবাসে, ভালবাসার পাত্র বলেই মনে করে। সুতরাং তোমাদের দুজনের অনুভূতি এক হয়ে গেল এইখানে—যার নাম হলো গিয়ে সহানুভূতি।' আর ওই সহানুভূতির থেকেই হয়ে থাকে ভালবাসার সূত্রপাত! বুঝতে পেরেছ?'

গোবরার কতখানি বোধগম্য হয় সেই জানে, কিন্তু এক ঘাড় মাথা নেড়ে দেয়।

উৎসাহিত হয়ে আমি আরও বলি—'ঘোড়া এগুলে মেয়েটাকেও এগুতে হবে; ঘোড়াও সঙ্গে সঙ্গে বাধ্য হয়েই—মেয়েটা কিছু ঘোড়া ছাড়া নয় যেকালে। ঘোড়া হাতে এলে মেয়েটি কি আর তোমার তফাতে থাকবে?'

'যা বলেছেন!' হাসিখুশির মলাট হয়ে সে চলে যায়।

আমি কিন্তু ভাবনায় পড়ি। ভাব জমাতে গিয়ে ঘোড়ার হাতে—হাতে না বলে পায়ে বলাই উচিত, বেচারা না অপঘাতে মারা যায়। এর আগে সে কোনো মানবের প্রেমে পড়েনি, কোনো মানবকও পড়েনি তার প্রেমে। কিন্তু এখন সেই প্রেমের দাবিই সইতে হবে প্রাণীটিকে। এই ধকল কি সইবে তার? এহেন বিটকেল ব্যাপার হয়ত সে বরদাস্ত নাও করতে পারে।

তবে কি না, প্রেমকে সর্বজয়ী বলে থাকে...সেইখানেই যা ভরসা! বিশ্বজয়ী প্রেম কি আর অশ্বজয়ী হতে পারে না?

তাহলেও, গোবরা যে কী করে এগুবে তা আমি ভেবেই পাই না। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া...মেয়েটির সঙ্গে ভাব জমানো, মনে হয় কষ্টসাধ্যই। বলতে কি, অসুবিধাটা আমি নিজেও যে বোধ করিনি তা নয়। মেয়েটি ভাব করবার মতই সত্যি, কিন্তু তার পথে ভাবনাও পদে পদে। ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে কাঁহাতক ভাব জমানো পোষায়? আর যদি গোড়াগুড়ির থেকেই তা করতে হয়...একটু কষ্টকর নয় কি? পথ কেবলই যে দুর্গম তাই না। রীতিমতন অশ্বক্ষুরলাঞ্ছিত। পরব্রহ্মের মত পরি-ব্রহ্মের পথও যদি 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা' হয়, পাশাপাশি চলতে গিয়ে পাছে ঘোড়ার পায়ের চোট লাগে সেই ভয়ে পদে পদে হোঁচট খেয়ে চলতে হয়, তাহলে অবশ্যই বলতে হয়, হে দেবি, তোমার ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ! আমি সটকালাম।

দিন কতক আর গোবরার দেখা নেই। অবশেষে একদিন দেখি সে কলার কাঁদি কাঁধে নিয়ে দাহিগড়ার দিকে চলেছে।

'কোথায় চলেছ গোবরা ভায়া?' আমি শুধাই: 'এত কলা কিসের জন্যে হে?'

'ভালবাসার জন্যে।' সে সংক্ষেপে সারে।

প্রেমে শেষ পর্যন্ত কাঁদিতে হয় জানা কথা, কিন্তু তা কি এই কলার কাঁদিতে? ওর কথায় আমি বিস্ময় মানি।

'প্রেমে বিস্তর ছলা কলা আছে, জানি তা, প্রেম একটা কলাবিদ্যাও বটে,' আমি বললাম: 'কিন্তু প্রেমিকাকে কি কেউ কলা দেখায় নাকি কখনো?'

'প্রেমিকাকে কেন মশাই, ঘোড়াটাকেই দেখাব তো!' সে বলে: 'ঘোড়াটা কলা খেতে ওস্তাদ। কলা খাইয়ে খাইয়ে পটিয়েছি ঘোড়াটাকে। কলা দেখলেই সে দৌড়ে আসে।' গোবরা তার পটিয়সী বিদ্যা প্রকাশ করে।

'মেয়েটাও তার পিঠোপিঠি দৌড়য় তো? মানে, তার পিঠে চেপে মেয়েটাকেও আসতে হয় নিশ্চয়?'

'নিশ্চয়! মেয়েটাও যে ছড়ার থেকে দুয়েকটা খায় না তা নয়।'

'কেমন? বলেছিলাম না? ঘোড়াকে পটাতে পারলে মেয়েটাও পটবে। ঘোড়ার সঙ্গে এগুতে হবে মেয়েকেও—কেমন হল কিনা? কী কৌশলে ঘোড়াটাকে তুমি কাবু করবে আমি ভাবছিলাম, যাক তোমার কাজ হাসিল হয়েছে তাহলে। তোমাকে কলাকুশল বলতে হয় ভায়া।'

'ঘোড়াটাও আমার বেশ কলারসিক দাদা!' গোবরার একগাল হাসি। —'কিরকম পুরুষ্টু পুরুষ্টু মর্তমান কলা সব দেখছেন?'

'তা তো দেখছি! ...মেয়েটাও তো তোমাব কলা খায় বলছ আবার। তা মেয়েটাকে এইভাবে কলাৎকার করলেও তোমার আসল কাজ কদ্দুব এগুলো? গোধূলি লগ্নেব দিকে কতটা এগিয়েছ শুনি?'

'বুঝতে পারছিনে ঠিক। মেয়েদের কিচ্ছু বোঝা যায় না দাদা! তবে মেয়েটাব না হলেও ঘোড়াটার আমি হৃদয় জয় করেছি ঠিকই।'

গোবরার হয়ত ঠিকে ভুল হয়নি। রমণীর মন সহস্র বর্ষের সাধনার ধন হলেও, এবং তার জন্যে কেউ কেউ সমরখন্দ আর বোখারা বিলিয়ে দিতে চাইলেও, কেউ আবাব ঘোড়ার জন্যও কি তাঁর রাজত্ব বিকিয়ে দিতে চাননি? হর্স! হর্স! মাই কিংডম ফব এ হর্স—বলেছিল কে? নিশ্চয় সে গোবর্ধনের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন ছিল না! ভালবাসার নানান রূপ—হাজার চেহারা। মোটের ওপর, হৃদয় একটা কারও পেলেই হলো! সেইটেই নেট লাভ! তা অশ্বিনী বা আ-রোহিণী যারই হোক না!

তারপর আর গোবরার দেখা পাই না। দেখা পেলাম হর্ষবর্ধনের।

কাঁচুমাচু মুখ করে তিনি হাজির।

'গোবরাকে নিয়ে ভারী ভাবনায় পড়েছি মশাই!' কাঁদো কাঁদো সুরে তিনি আওড়ান।

'কী হয়েছে? অ্যাঁ?'

'কী যে তার হয়েছে তাই তো আমরা ঠাওর পাচ্ছিনে। সব সময় কেমন যেন আনমনা হয়ে থাকে। আর মাঝে মাঝে...'

'প্রেমে পড়েনি তো কারো?'

'কে জানে! কিছু তো বলে না। মাঝে মাঝে কেবল চিঁ হিঁ চিঁ হিঁ করে ওঠে।' তিনি

বললেন—'প্রেমে পড়লে কি মানুষ চিঁ হিঁ চিঁ হিঁ করে নাকি?'

'চিঁ চিঁ করে বটে অনেকে, শুনেছি আমি।' আমি বলি—'তবে প্রেমের চিৎকার তো কতো রকমই হতে পারে। কিছু কি তার বলা যায়?'

'তার চালচলন কেমন ধারা যেন। এরকম বেচাল তার কখনো আমি দেখিনি। কি রকমের পাগলাটে পাগলাটে ভাব।'

'ঠিক সময়ে ওর বিয়ে না হওয়ার জন্যই এমনটা হয়েছে মনে হচ্ছে। যথাসময়ে যদি ওর গলায় একটাকে ঝুলিয়ে দিতেন... একজন কেউ কণ্ঠলগ্ন হলে আজ আর এমনটা হতে পারত না।'

'তা যখন হয়নি, এখন কী করা যায়? রাতবিরেতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ওর ওই চিঁহিঁ চিঁহিঁ করে ওঠাটাই আমার খারাপ লাগছে আরো। ওই বিটকেল আওয়াজে আমাদের ঘুম ভেঙে যায় মশাই! একটুও ঘুমোতে পারি না আমরা, না আমি না আমার স্ত্রী। পাশের ঘর থেকে দেয়াল ফুঁড়ে যেন তেড়ে আসে আওয়াজটা। আমার স্ত্রী বলছিলেন কোনো ঘোড়াভূতে ওকে ধরেছ হয়ত...?'

'মানুষ মর'লেই তো ভূত হয় জানি। ঘোড়া মরলে কি ভূত হয় নাকি? ঘোড়াদের কি আত্মা আছে?' বলে আমি ওঁকে অভয় দিই—'না না, ওসব কিছু নয়টয়। ভূতটুত নয় কিছু।'

কিন্তু তাহলেও আমার ভয় হয়, সেই ঘোড়াটা ভালবেসে ওকে কামড়ে দেয়নি তো? কণ্ঠলগ্ন হয়ে ওর ঘাড়ে যদি দাঁত বসিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে কুকুরে কামড়ালে যেমনটা লোক ঘেউ ঘেউ করে আর জলাতঙ্ক দাঁড়ায়...আমার কেমন যেন সন্দেহ হতে থাকে।

'ঘাস দিয়ে দেখেছেন? ওর মুখের সামনে ঘাস ধরে দিয়ে দেখবেন তো, খায় কিনা। যদি খেতে না চায়, আর চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়ে...।'

'কী যা তা বলছেন! ঘাস খেতে চাইবে সে! ডাল ভাতই তার মুখে রোচে না আজকাল! না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে দিনকের দিন! কী যে হলো ছোঁড়াটার।'

'তাহলে ডাক্তার দেখান এক্ষুনি। দেহের নয়, ওর মনের চিকিৎসা করানো দরকার। এমন ডাক্তার যিনি মনোবিকলন করতে পারেন...।'

'মনোবিকলন! সে আবার কী মশাই?' হর্ষবর্ধন হতবাক হন।

'মনের কলকব্জা বিগড়ে গেলে যিনি মেরামত করতে জানেন এমন ডাক্তার।' আমি বিশদ করি: 'গোবরা ভায়ার বিকল মনকে যিনি আগের মত অবিকল করে দিতে পারবেন আবার।'

'এমন কোনো ডাক্তার কি জানা আছে আপনার?'

'কলকাতার থেকে কদিন হলো একজন এখানে বেড়াতে এসেছেন বলে শুনেছি, তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া যায় এখুনি।'

গেলাম তাঁর কাছে গোবরাকে নিয়ে সহর্ষবর্ধন।

'দেখুন তো ডাক্তারবাবু, আমার ভাইয়ের কী হয়েছে! দিনরাত কী সব আবোল-তাবোল

বকে।' তিনি বলেন—'আর মাঝে মাঝে...সময়ে বিয়ে দিইনি, সেইজন্যেই কিনা কে জানে!'

'কী হয়েছে আপনার?' শুধান ডাক্তারবাবু গোবরাকে।

'আমি প্রেমে পড়েছি!' মুক্তকণ্ঠে জানিয়ে দেয় গোবরা।

'সে আর অবাক হবার কি!' বললেন ডাক্তারঃ 'আপনার বয়সে সকলেই প্রেমে পড়ে। তাতে দোষের কিছু দেখি নে।'

'কিন্তু আমি—আমি যে একটা ঘোড়াকে ভালবেসেছি মশাই।'

'তাতে কী! তাতেই বা কী? লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবজন্তুদের ভালবাসে! কেউ পাখি, কেউ কুকুর, কেউ বা বেড়াল। ঘোড়ার প্রেমে পড়ে বাজি ধরে কত লোক ফতুর হয়ে যায় পর্যন্ত।'

'সে ভালবাসা নয় ডাক্তারবাবু! রীতিমতন গভীর প্রেম যাকে বলে। তার জন্যে প্রাণ কাঁদে আমার। রাত্তিরে সেই ঘোড়াটার আমি স্বপ্ন দেখি।'

'বটে? তা, সেটা মদ্দা ঘোড়া না মাদী ঘোড়া?'

'আপনি পাগল হয়েছেন ডাক্তারবাবু? আমি পুরুষ মানুষ হয়ে একটা মদ্দা ঘোড়াব প্রতি আসক্ত হবো? বলেন কী আপনি? মেয়ে ঘোড়া আলবাৎ! আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? তাই আপনি ঠাউরেছেন আমায়...?'

'না না, তা কেন ভাবব! তবে...'

'তবে আমার কী মনে হয় জানেন ডাক্তারবাবু?' তাঁর কথার মাঝখানে বাধা দিয়েছেন দাদাঃ 'গোবরাটা ছোট বেলার থেকেই আমাকে ভীষণ ভালবাসে। ভ্রাতৃভক্ত বেজায়। আর আমার নাম হর্ষবর্ধন। আর জানেন তো—হর্ষ মানে হচ্ছে ঘোড়া...ছোঁড়াটা আমার প্রেমে পড়ে যায়নি তো? সেইটাই আমার সন্দেহ।' সহর্ষ হয়ে তিনি জানান।

'তা কী করে হবে!' হতভম্ব হয়ে ঘাড় নাড়েন ডাক্তারঃ 'হর্স মানে ঘোড়া বটে, কিন্তু যে ঘোড়া ঘাস খায়...আপনি কি আর ঘাস খান? সেই হর্স কি আপনি নাকি?'

তালগোল পাকিয়ে ডাক্তারেরই যেন মাথা খারাপ হয়ে যাবার মতন হয় তখন।

জীবন-জিজ্ঞাসা

'জীবনরহস্যের কোনো হদিশ পেলাম না ভাই', দুঃখ করছিল আমার বন্ধু সোমনাথ ডাক্তারঃ 'সারাজীবন ধরে এত চেষ্টা করেও।'

'তোমাদের পাবার তো কথা নয়,' তার খেদোক্তিতে আমি বাধা দিই—'ওতো আমাদের...লেখকদেরই একচেটে এলাকা ভাই! তলিয়ে যাবার ভয় থাকলেও, ওর গভীরে আমরাই তো ডুব দেব...থই না পেলেও...থ হয়ে গেলেও। তোমাদের কারবার তো জীবন্মৃতদের নিয়েই। জীবনসংশয়ের সঙ্গেই তো যতো সম্পর্ক তোমাদের।'

'জীবনরহস্য মানে দীর্ঘ জীবনের রহস্য।' বলে সে প্রাণীমাত্রের আদিমতম প্রাণের

কথাটি প্রাঞ্জল করে—'কী করে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়, অনেকদিন বেঁচে থাকা যায়—সেই সমস্যার কথাই আমি বলছিলাম।'

'ও, এই কথা!' বলে আমি হাঁফ ছাড়লাম।

'অবশ্যি কিছু কিছু কিনারা যে পাওয়া না গেছে তা নয়। মিতাহারী মিতাচারী হলে মানুষ দীর্ঘকাল বাঁচে, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সেটা প্রকাশ পেয়েছে। আহার-বিহারে সংযমীদের অকালমৃত্যুর আশঙ্কা ঢের কম। এই মিতাহারের কথাটাই ধরা যাক না...মিতাহার মানে পরিমিত আহার...'

মিতাহারের কথায় আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

সত্যি, পরীর মতই মেয়ে ছিল বটে মিতা। কিন্তু ওই মিতাহারের চেষ্টাতেই...পরিমিত পরিমাণেই, বলতে কি...

হ্যাঁ, মিতাহারী হবার সুযোগ পেলে আমি দীর্ঘজীবী...আরো একটু দীর্ঘজীবী হতে পারতাম হয়ত! এই যৎকিঞ্চিৎ জীবনে যে ক'টা দিন বেঁচেছি তার ভেতরেই আরো একটু বেশি দিন বাঁচা যেত, অনেক দিন অনেক রাত আরো অনেক বেশি জীবন্ত হতো, সেই তরঙ্গভঙ্গীনীকে ক্ষণকালের জন্যেও সঙ্গিনীরূপে পেলেও এই এক জীবনেই অনেক জীবন-যাপন করা যেত, এই জনমেই 'জন্ম-জন্মান্তর' লাভেরও কোনো অন্তরায় ছিল না। কিন্তু মিতালীর মুখপাতেই যেভাবে চড়চিত হতে হলো মনে পড়ায় এতদিন পরেও দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল আমার।

'মিতাহারের কথা তো বলছ!' আমি ফোঁস করে উঠলাম: 'কিন্তু মিতাচার কিরূপ অম্লমধুর জানতে যদি! আঙুর ফলের মতই ভারী টক ভাই! ওর talk পর্যন্তই ভালো, তার বেশি এগুলেই মারাত্মক।'

সেই বিপজ্জনক আচার-ব্যবহারের কথা স্মরণ করে এতদিন পরেও আমি শিউরে উঠি।

সে হাতের কাগজের একটা অংশে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল— 'আজকের এই খবরটা পড়েছ? এইটে পড়েই ওই দীর্ঘজীবনের প্রশ্নটা আমার মাথায় উঠেছে আবার নতুন করে।'

খবরটায় নজর দিলাম—খবরের মত খবর বটে।

'একালের এক দীর্ঘজীবী মানুষ—গতকাল ভট্টপল্লীর শ্রীভট্টশালী মহাশয়ের ১০৬তম জন্মোৎসব হয়ে গেল। তাঁর নিজের বিবেচনায় তাঁর বর্তমান বয়স ১০৯ বছর, প্রাথমিক গণনার ভুলহেতু তিন বছর বাদ পড়ে গেছে..'

'ইস্! লোকটা নিজের জীবনটাকে নিয়ে নয়-ছয় করেছে।' খবরটা পড়ে আমি বিরক্তি প্রকাশ করি—'অ্যাদ্দিন ধরে বেঁচে থেকে কী যে হয়! বুড়ো হয়ে বেঁচে থাকার কি কোন মানে আছে?'

'আরে, আজ যদি আমরা দীর্ঘজীবনের কিনারা করতে পারি তো কাল দীর্ঘ যৌবনলাভের কিনারে গিয়ে পৌঁছব, তা জানো?' বলল সোমনাথ: 'চলে যাই ভাটপাড়ায়। ভদ্রলোকের ইনটারভিউ নিইগে। জীবনরহস্যের যদি কোন হদিশ পাওয়া যায় তার থেকে।'

ভাটপাড়ায় পা দিয়েই একজনের কাছে শ্রীভট্টশালীর বাড়ির ঠিকানাটা শুধালাম।

'অ্যাঁ? ভট্টশালার বাড়ি খুঁজছেন নাকি আপনারা?' লোকটা যেন খেঁকিয়ে উঠল কেমন।

'ভট্টশালা। তার মানে।' আমরা তো হতবাক।

'এক নম্বরের বদলোক মশাই। আমারা ওকে ভট্টশালাই বলি। শ্রীশ্রী ভট্টশালা।'

'এমন কথা বলছেন কেন?' সোমনাথ একটু মৃদু প্রতিবাদ জানায়ঃ 'এত দীর্ঘদিন ধরে বেঁচে রয়েছেন—উনি তো আপনাদের ভট্টপল্লীর গৌরব মশাই।'

'গৌরব! গৌরবই বটে' লোকটার মুখভঙ্গি দেখবার মতই—'খেয়ে না খেয়ে অ্যাদ্দিন ধরে খালি বেঁচেই রয়েছেন, এ ছাড়া আর কী করেছেন উনি? শুনি তো একবার?'

'কিছুই করেননি?' ভদ্রলোকের কথায় আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কী কী করা উচিত ছিল উক্ত ভট্টশালীর মনে মনে তাই খতাই। সুদীর্ঘকাল ধরে কেবল বেঁচে থাকাটা কি কোন কথাই নয়?

'দীর্ঘজীবনবাবুর কথা আর বলবেন না।' এই কথা বলে বিষবৎ আমাদের পবিত্যাগ করে চলে যায় লোকটা।

ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত আমরা ভট্টশালী মশায়ের আটচালায় গিয়ে পৌঁছলাম।

চতুষ্পাঠীতেই বসেছিলেন ভট্টশালী। নমস্কার করেই কথাটা পাড়া গেল—'কলকাতাব থেকে আসছি আমরা। আজকের কাগজে খবরটা পড়েই ছুটে এলাম, আপনার দীর্ঘজীবনলাভের কারণগুলো আমরা জানতে চাই—যদি দযা কবে আমাদেব জানান... আমি একজন ডাক্তার। ইনি লেখক।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দীর্ঘজীবনলাভের যদি কোনো শর্টকাট থাকে...' সঙ্গে সঙ্গে আমাবও অনুযোগ।

'আসুন আসুন। বসুন আপনারা।' আমাদেব অভ্যর্থনা করে বললেন ভট্টশালী। —'দেখুন, দীর্ঘজীবনের রহস্য কিছু নেই। দীর্ঘজীবনলাভেব সোজা পথ হচ্ছে সহজ পথ। জীবনের আঁকা বাঁকা চোরা গলিতে না যাওয়া—ভুল পথগুলো এড়িযে চলা। সর্বদা সোজা পথে চলবেন— সেইটেই হচ্ছে সহজ পথ। সহজভাবে জীবন-যাপন কবলেই দীর্ঘায়ু হওয়া যায়। মিতাহার, মিতাচার, আহার-বিহারে সংযম, নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত জীবন—এইগুলিই দীর্ঘায়ুলাভের সহায়ক। সংযত জীবন-যাপন কবলে যে পরমায়ু বাড়ে সেকথা আর না জানে কে?'

'আজ্ঞে, আমিও সেই কথাই বলছিলাম আমার বন্ধুকে, এই মিতাচারের কথাই। এখন আপনিও আবার সেই কথাই বলছেন।' দ্বিরুক্তি করল সোমনাথ।

'দেখুন আমি আজীবন নিরামিষাশী, জীবনে মদ্যমাংস স্পর্শ করিনি, কোনো নেশাভাঙ নেই আমার, কিছুর জন্যেই কোনো উদ্বেগ দুশ্চিন্তা নেইকো. মনে হয় এই সবই হয়ত আমার দীর্ঘজীবনলাভের হেতু হবে।' বলে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেনঃ 'তবে আমাব এ আর কী দীর্ঘজীবন! আমার চেয়েও দীর্ঘতরজীবী ব্যক্তি এই অঞ্চলেই রয়েছেন। এই ভট্টপল্লীতেই।'

'বলেন কী! কই তাঁর খবর তো...'

'পাবেন কী করে, তিনি কখনো নিজের পরমায়ু কারো কাছে প্রকাশ করেন না। কিন্তু আমি তো জানি। এইটুকুন বয়স থেকে দেখে আসছি তাঁকে।'

'তার বয়স কত এখন?' আমি জানতে চাই।

'তিনি তো বলেন চুরাশী।' ভট্টশালী বললেন, 'কিন্তু তাঁর এই চুরাশীই আমি চুরাশী বছর ধরে শুনে আসছি। আমার আট বছর বয়সে যেমনটি তাঁকে দেখেছিলাম, এখন এই একশো আটের পৈঠা পেরিয়েও ঠিক তেমনটিই দেখছি তাঁকে। কোনো বৈলক্ষণ্য নেই। কিছুমাত্র না। ডবোল আশী পার করে দিয়েও তিনি...'

'বলেন কী!' শুনেই আমি আঁতকে উঠি : 'ডবোল আশীর চূড়ায় চুর হয়ে বসে আছেন— তাঁর চিরকালের চুরাশীতে? আশী আশী করেও আসেননি এতদিনেও! আশ্চর্য! দীর্ঘজীবনের চূড়ান্ত যদি বলতে হয় তো বোধকরি এইটেই তার পরাকাষ্ঠা।'

'শুধু তাঁর চুলগুলো পেকেছে কেবল।' বলে ভট্টশালী নিজের বক্তব্য সম্পূর্ণ কবলেন।

'এক চুলেব তফাত মাত্র!' আমার টিপ্‌পনি কাটলাম।

'নামটি কী তাঁর?' সোমনাথ শুধায়।

'কেউ তাঁর নাম জানে না। কাউকে বলেনও না তিনি। তবে আমরা সবাই তাঁকে যোগেন্দ্রজী বলে থাকি। ঐ নামেই ডাকি আড়ালে। যোগবলেই তাঁর এহেন দীর্ঘজীবন—আমাদের এই ধারণা।'

'হিন্দুস্থানী সাধক-ফাধক বুঝি?'

'না না, সাধক-ফাধক নয়। হিন্দুস্থানীও না। সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোক। তবে ওঁর দীর্ঘজীবনের কোন কিনারা করতে না পেরে, হয়ত তান্ত্রিক ক্রিয়া-টিয়া যোগ-টোগ কিছু করে থাকেন, এই ধারণায় সবাই ওঁর ওই নাম দিয়েছে। এ—ই আর কি!' বলেন শ্রীভট্টশালী : 'তাহলেও তাঁর কাছে যান না একবার। হয়ত এখানে আসাটা আপনাদের সার্থক হতে পারে তাহলে। যে গুহ্য রহস্যের সন্ধানী আপনার তার চাবিকাঠি হয়ত তাঁর কাছেই রয়েছে।'

গেলাম তাঁর কাছে।

যোগেনবাবুকে দেখে কিন্তু চুরাশী দূরে থাক, চৌষট্টির বেশি বলে মনে হয় না কিছুতেই। নাদুস-নুদুস দেহ—স্বাস্থ্যখানা রেখেছেন মন্দ না। পঁয়ষট্টি দেবার এখনো কোনো লক্ষণ নেই, তার বেশ দেরি আছে বলেই মনে হয়।

'এখানকার একজন বলছিলেন—' কথায় কথায় ভট্টশালীর কথাটা পাড়া গেল—'যে আপনি নাকি চুরাশী বছর ধরে চুরাশীতেই রয়ে গেছেন, দেখতেও রয়েছেন সেই একরকমটিই প্রায়, বয়স নাকি আপনার বাড়ছে না আদপেই।'

শুনে তিনি হো হো করে হাসলেন। বললেন—'দেখুন, অস্তিত্বের একটা স্থিরবিন্দু আছে—তাকে ঈশ্বরই বলুন আর অজ্ঞেয়ই বলুন—তার সঙ্গে কোনরকমে যুক্ত হতে পারলে—সময় তখন আপনার থেকেই স্তব্ধ হয়ে যায়। অস্তিত্বের সেই বিন্দুমাত্রায় বিন্দুমাত্রই অবস্থিতি থাকে কেবল। দেশকালাতীত ত্রিশূন্যে কি বয়স বাড়ে? আপনাদের বিজ্ঞানও

কি এই কথায় সায় দেয় না? কিন্তু আমরা তো আর তা পারি না, সেই কেন্দ্রবিন্দুর থেকে প্রকৃতির বশীভূত হয়ে প্রবৃত্তির বশে ক্রমাগত বৃত্ত টেনে টেনে বৃত্তান্তরে গিয়ে পড়ি—তখন তার অনিবার্য পরিণামে নানান পরিণতি এসে দাঁড়ায় স্বভাবতই। সেই বৃত্ত-বৃত্তান্তই আমাদের এই ধারাবাহিক জীবদ্দশা।'

কিছু না বুঝেও আমি ঘাড় নাড়ি—'কেন এমনটা হয় মশাই?'

'নিছক মায়া বাড়াতে গিয়েই। আবার কী?'

'তিনি কিন্তু আপনার যোগবলের কথাও বলছিলেন।' সোমনাথ বলল।

'যোগবলের চেয়ে বড় হচ্ছে বিয়োগবল। যোগ হচ্ছে বিধাতার। মানুষের নয়। কেন না যোগানদার তিনিই। আমাদের সব কিছুই বিয়োগান্তক। ভগবতী দশ হাতে আমাদের যুগিয়ে যাবেন, আর আমরা দশ দিকে তা বিলিয়ে যাব। যাবার রাস্তা পরিষ্কার না রাখলে আসার পথ বন্ধ। উত্তুরে বাতাস ঘরে ঢুকতেই পারবে না যদি না আমরা দক্ষিণের জানালাটা খুলে রাখি—বাইরে যত ঝড়ই বয়ে যাক্ না কেন। তাঁর কৃপায় উত্তরণ তখনই সম্ভব যখন দক্ষিণার দ্বার মুক্ত থাকবে আমাদের। ধন, ঐশ্বর্য, অর্থসামর্থ্য, স্নেহ ভালবাসা যাই বলুন—সবই আমাদের অপরকে দিয়ে দিয়ে পেতে হবে—না দিয়ে পাওয়ার কোনো উপায় নেই—পেয়েছি কি না সত্যিই, দিলে পরে তবেই তো সেটা টের পাই। পুঁজি করে রাখলে সেটা পুঁজ হয়ে থাকে—তার থেকেই যতো আধিব্যাধি—কি দেহের—কি সমাজের—কি রাষ্ট্রের...তামাম্ দুনিয়ার।'

'কিন্তু তার সঙ্গে বয়স না বাড়বার সম্বন্ধটা কী?' সোমনাথ শুধায়।

'বয়স বাড়ে ঠিকই, কিন্তু তার কোনো দাগ পড়ে না কেবল। বহতা নদী যেমন, তার কি কোনো বয়স আছে? পর্বতশীর্ষে তার জলযোগ আর ঘাটে ঘাটে জল বিলিয়ে সমুদ্রগর্ভে গিয়ে সেই জলবিয়োগ—যেমন পাওয়া তেমনি তার দেওয়া—এই জন্যেই সে ফুরোয় না কখনো, অফুরন্ত, কানায় কানায় ভরা সব সময়—সময়ের কি কোনো ছাপ আছে তার গায়?'

'কিন্তু ঐ মায়া বাড়ানোর কথাটা বললেন যে...' আমি ওঁকে মনে করিয়ে দিই তখন।

'শূন্যবিন্দুর থেকে যে-বৃত্তই টানি—যে বৃত্তিতেই যাই না, সবই তো শূন্যাকার। শূন্যর থেকে শূন্যেরই সৃষ্টি হয়—বৃত্তাকার ধারণ করলেও তা শূন্যবিন্দুরই সমষ্টি মাত্র। সবই শূন্যাকার, মায়া। ফাঁকি—ফক্কিকার। উপনিষদের সেই বিখ্যাত বচনটা বদলে নিয়ে হয়ত বলা যায়—শূন্যমদঃ শূন্যমিদং শূন্যাৎ শূন্যমদুচ্যতে। শূন্যস্য শূন্যমাদায় শূন্যমেবাবশিষ্যতে।'

'কিন্তু ঐ বৃত্তাকার?' সোমনাথ তর্কে প্রবৃত্ত।

'সবই হচ্ছে আমাদের দানবৃত্ত—আত্মদানের প্রবৃত্তি। শূন্য তো আসলে পূর্ণ-ই, অলরাউণ্ডার, সম্পূর্ণ। শূন্যের আত্মপ্রসার থেকেই তো বৃত্ত। তাই নিছক মায়া হলেও, যে কোনো বৃত্তিই, তা আমাদের কলাবৃত্তিই হোক যৌন প্রবৃত্তিই হোক, দেহদানই কি আর স্নেহদানই কি, সবই আমাদের নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া ছাড়া তো কিছু নয়। যেতে যেতে দেওয়া, দিতে দিতে যাওয়া—পেয়ে পেয়ে দেওয়া আর দিয়ে দিয়ে পাওয়া—সব বৃত্তের সব বৃত্তিই সেই এক বৃত্তান্ত।'

'দেওয়ার কথাটা যা বলেছেন' সায় দেয় সোমনাথ ডাক্তার ঃ 'না দিলে তো ত্রিভুবনে কিছুই মেলে না মশাই। না হৃদয়, না ভিজিট।'

'আসলে মেলা মানেই তো দেওয়া নেওয়া, আদানপ্রদান।' মেলাই কথার ওপর আমার এক কথা।

'আর এ সমস্তই আমাদের মায়া বাড়ানো মাত্র।' যোগেনবাবু যোগ দেন ঃ 'মায়া তো ব্রহ্মের সম্প্রসারণ ছাড়া কিছু নয় ; ব্রহ্মের নানারূপে নানান বৃত্তিলাভ। ব্রহ্মের আত্মদান। আপনাকে দেওয়া। আর সেই আত্মদানে তাঁর আত্মচরিতার্থতা। তাঁর এই দানযোগে যদি আমরা ঠিক ঠিক যোগদান করতে পারি তাহলে এর সব কিছুই শূন্যমাত্র হলেও, শেষ ফল সেই শূন্য হলেও, সেই শূন্যতার মধ্যেই আমরা পূর্ণতার স্বাদ পাব। দেশকালপাত্রের সীমানা উপচে সেই পরিতৃপ্তি।' বলে তিনি নিঃশ্বাস ফ্যালেন ঃ 'আর ভেবে দেখুন, ভূয়ো হলেও সেই স্বাদটুকুই তো আ[illegible] —জীবনের সহস্র যন্ত্রণা, হাজার বিষাদের মধ্যেও।'

তত্ত্বকথার এই সব গোঁজামি[illegible] গর্তে আর মাথা না গুঁজে সোমনাথ তার ডাক্তারি সত্তায় ফিরে আসে এবার। —'[illegible], এই দীর্ঘজীবনে কি কোনো অসুখবিসুখ করেনি আপনার?' জিজ্ঞেস করে বসে হঠাৎ।

'করেনি আবার? শরীরম্ ব্যাধিমন্দিরম্। কোন অসুখটা করেনি। যে অসুখ একবার এসেছে সে আর যায়নি, যেতে চায়নি, খুঁটি গেড়ে বসেছে এই দেহে। কোন অসুখটা নেই বলুন আমার? বাত আছে, হাঁপানি আছে, ডায়াবিটিসও চাগাড় দেয় মাঝে মাঝে, উচ্চরক্তের চাপ তো রয়েইছে—আর এর কোনোটাই ভূয়ো নয়।' ভূয়োদর্শী ব্যক্ত করেন ঃ 'তবে হ্যাঁ, রক্তচাপ থাকলেও, রক্তের সেই চাপল্যটা ততটা নেই আর।'

'অ্যাতো অসুখ আছে আপনার?' আমি হতবাক হই ঃ 'কিন্তু কই, দেখে তো তা মনে হয় না মোটেই।'

'অসুখও যেমন আছে তেমনি তার ওষুধও রয়েছে যে! সবই আছে তবে প্রশমিত হয়ে আছে।'

'কী করে দমিয়ে রেখেছেন এত সব অসুখ?' আমার প্রশ্ন।

'ওষুধ খেয়ে—আবার কী করে? অসুখের আঁচ পেতেই ওষুধ খাই, শরীরকে বেশি ভোগাই না। সুখভোগে অরুচি না থাকলেও অসুখভোগে আমার নিতান্ত অনীহা। আমার দেহে অসুখ আর ওষুধের সহাবস্থান—' বলে তিনি সোমনাথের দিকে কটাক্ষ করেন—'আপনারা ডাক্তাররা অসুখ হলে তার পরে ওষুধ দিয়ে তা সারান, আর আমি, অসুখের সম্ভাবনা দেখলেই ওষুধ খেয়ে তাকে সরিয়ে রাখি। আমার ঐ দেরাজটার দিকে চেয়ে দেখুন না একবার! এফিড্রিন, অ্যাড্রিনালিন, প্যাথিডিন, ইসিড্রেকস্ উইথ অ্যাডেলফিন, ইনসুলিন, আর যতো রাজ্যের ভিটামিন—এ বি সি ডি থেকে ঈ পর্যন্ত কী নেই?'

সোমনাথ সেদিকে তাকাল না। মার কাছে মামার বাড়ির গল্পের মত ডাক্তারের কাছে ওষুধের তত্ত্ব ব্যাখ্যানা তার ভালো লাগল না বোধহয়। 'আচ্ছা, এবার আমরা আসি তাহলে।' বলে সে উঠে পড়ল। নমস্কার ঠুকে বিদায় নিলাম আমরা।

ফিরে এলাম ফের সেই ভট্টশালীর সমীপে।

'কী বললেন যোগেনবাবু?' শুধালেন শ্রীভট্টশালী।

'আসল কথা ফাঁস করলেন না কিছু।' জানাল সোমনাথ: 'তবে আমাদের জ্ঞান দিলেন বটে বহুত।'

'উনি ঐ রকমই। মচকান তো ভাঙেন না।' সহাস্যে বললেন ভট্টশালী: 'কারো কাছে ভাঙেন না কিছু কখনো। ওঁর রহস্য উনিই জানেন কেবল।'

'কিন্তু জীবনরহস্যের আসল কথাটা তো...' সোমনাথ বলতে যায়।

'আসল কথা আপনারা আমার কাছে শুনুন।' বাধা দিয়ে তিনি বললেন—'দীর্ঘজীবন যদি পেতে চান তো আমার পথ ধরুন। সংযত জীবনযাপন করুন, নেশা-ভাঙ করবেন না, বিড়ি-সিগ্রেট খাবেন না, মদ ছোঁবেন না কখনো...'

এমন সময় সদর রাস্তার দারুণ একটা সোরগোল তাঁর কথার মাঝখানে এসে বাধা দিল।

'ঐ যে ভট্টশালা! ভট্টশালা! ভট্টশালা কি'জয়!'

নিজের জয়ধ্বনি শুনেই কি না কে জানে, উনি মুখ বিকৃত করে সদুপদেশ বিতরণে ক্ষান্ত হলেন।

'ব্যাপার কী?' জানতে চাইলাম আমরা।

'ও কিছু না। আমার বাবা আসছেন।'

'অ্যাঁ? আপনার বাবা?' অবাক হয়ে যাই আমরা: 'উনি বেঁচে আছেন এখনো?'

'আছেন বলে আছেন! রীতিমতন সজীব। ওঁর জ্বালায় আমরা তো বটেই, পাড়াপড়শী—ভাটপাড়ার ইতরভদ্র সবাই অস্থির।' বলে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন—'আরো কতোকাল জ্বালাবেন কে জানে!'

'ওঁব নামটি কি আমরা জানতে পারি?'

'শ্রীশ্রীভট্টশালী। আমার শ্রী একটা, ওঁর দুটো শ্রী—উনি নিজেই এটা নিয়েছেন। কিন্তু মশাই, শ্রীশ্রী না বলে ওঁকে বিশ্রী বলাই উচিত বরং। পাড়ার ছোঁড়ারা ওঁকে ভট্টশালা বলে খ্যাপায়। এককালের ভারতবিশ্রুত মহামহোপাধ্যায় জীবন ন্যায়রত্নমশাযেব এই দশা—তাঁর ছেলে হয়ে নিজেব চোখে আমায় দেখে যেতে হলো...'

তাঁর খেদোক্তি শুনতে হয় আমাদের...'পিতৃনিন্দা মহাপাপ জানি, কিন্তু ওঁর যা আচাব ব্যবহার...আমরা মুখ দেখাতে পারি না লোকসমাজে। বলা উচিত নয়, কিন্তু হেন নেশা নেই যা ওঁর নেইকো। বিড়ি সিগ্রেট তো মুখে লেগেই আছে। তা ছাড়া গাঁজা আফিং চরস গুলি ভাঙ কিছু বাদ যায় না। কোকেন পেলেও খেতে ছাডবেন না উনি...'

'তাহলে তো ওঁর জীবনটাই নিতে হয় সব আগে।' সোমনাথকে আমি উসকালাম: 'জীবন সম্বন্ধে জীবনবাবুর বক্তব্যটাই জানা দরকার আমাদের।'

বাইরের সেই হল্লাটা ক্রমেই আরো বেড়ে চলল।

'সারা পাড়া জ্বালাতে জ্বালাতে ফিরছেন এখন উনি সেই ভাটিখানার থেকে...'

টলতে টলতে ঘরের ভেতরে এসে ব্যক্ত হলেন একদা ভারত-বিশ্রুত শ্রীশ্রীভট্টশালী

মশায়। আমাদের কোনো প্রশ্ন তোলার সুযোগ না দিয়েই নিজের বক্তব্য-প্রকাশে আপনার থেকেই তিনি সোচ্চার হয়ে উঠলেন—

'সভাপতিমশায়, সমবেত জনমণ্ডলী ও বন্ধুগণ! আমি প্রতিবাদ করছি...ঘোরতর প্রতিবাদ করছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনারা শুনুন সবাই। আমার প্রতি কী দারুণ অন্যায় আচরণ করা হয়েছে কান পেতে আপনারা শুনুন একবার।'

আমরা তটস্থ হয়ে দাঁড়ালাম উৎকীর্ণ হয়ে...

'হ্যাঁ, আমি...আমি এহেন অসদাচরণের প্রতিবাদ করি। আপনারা বলবেন আমি কেন প্রতিবাদ করছি। কিন্তু প্রতিবাদ ছাড়া আমি আর কী করতে পারি? আমি বলব যে প্রতিবাদ ছাড়া আমি আর কিছুই করতে পারি না। সেই কারণেই আমি প্রতিবাদ করছি। শুনুন তাহলে আপনারা...আমার প্রতিবাদটা শুনে রাখুন সবাই...আমি ভাটিখানার মালিকের কাছে একের এক চেয়েছি, বলেছি তুমি আমায় একের এক দাও। সে আমাকে একের এক দিয়েছে...আমি একের এক খেয়েছি কিন্তু...কিন্তু...কিন্তু...'

বলতে বলতে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাঁর সারা মুখ যেন কেমনধাবা হয়ে যায়—

'কিন্তু ওরা আমাকে সত্যি সত্যি একের এক দেয়নি, আমি একের এক খাইনি, বলুন আপনারা, আমি একের এক খেয়েছি কি? আপনারাই বলুন একবার?...'

তিনি জিজ্ঞাসু নেত্রে আমাদেব দিকে তাকান। ন্যাযরত্ন মশাযেব ন্যাযেব কূটতর্কে সবাই আমরা বিড়ম্বিত বোধ করি।

'না, খাইনি। প্রকৃতপক্ষে আমি একেব এক খাইনি। প্রমাণ চান তাব? একেব এক যে কী বস্তু নিশ্চয় তা আপনাদেব অজানা নয়...'

আমার জানা ছিল না। 'একের এক-টা কী হে?' সোমনাথকে আমি শুধালাম। 'এমন কী চীজ?'

'একশো নম্বর ওয়ান-এর এক বোতল।' সোমনাথ জানাল—'মা. নদেব পরিভাষায় ঐ একের এক।'

'একশো নম্বর ওয়ান? তাহলে তো উনি বমি করে এখনি সব একশা কববেন।' বলে আমি আঁতকে উঠে ওঁর সামনেব থেকে সরে দাঁডাই।

'তার প্রমাণস্বরূপ আমি বলি...' বলতে থাকেন ন্যায়বত্ন—'সত্যি সত্যি একের এক খেলে আমি এরকম দাঁডিয়ে প্রতিবাদ করতে পারতাম না। আপনারা বলবেন প্রতিবাদ না করে তাহলে আমি কী করতাম? আমি বলব একের এক খেলে আমি এইবকম কবে মাটিতে পড়ে যেতাম সটান...'

বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধডাস করে পডে গেলেন মেজেয। আব উঠলেন না। তাবপব আব কোনো উচ্চবাচ্য নেই তাঁব।

সোমনাথ ডাক্তাব তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁব নাড়ি টিপে দেখে স্টেথিসকোপ বসিয়ে বুক পরীক্ষায় লাগলো।

বাধা দিলেন শ্রীভট্টশালী [illegible] না [illegible]। কিছু হয়নি ওর। মদ খেয়ে [illegible]

হয়ে পড়েছেন মাত্র। দিনে দশবার উনি অমন পড়ছেন, উঠছেন, আবার ছুটছেন ওই ভাটিখানার দিকে। একের এক না হলে তাঁর একদণ্ড চলে না।'

একবাক্যে উভয় ভট্টশালীকে নমস্কার জানিয়ে আমরা ভট্টশালার থেকে বের হলাম।

সোমনাথ চুপ। আমিও। ওর চোখে নির্বাক জিজ্ঞাসা—'? ? ?' (জীবনের একি রহস্য ?)

আমার চোখে তার অবাক জবাব—'! ! !' (জীবন-রহস্যই বুঝি এই ভাই !)

কিন্তু একের এক কি সে পেয়েছিল ? জীবনরহস্যের সব কিছু ছাপিয়ে জীবনন্যায়রত্নের সেই প্রশ্নটাই যেন কানে বাজতে থাকে আমাদের।

জীবনজিজ্ঞাসার সেই প্রশ্নমীমাংসা কোথায় ? হাযবে, তা কি কখনো পাওয়া যায় ! সেই একের একটিকে। সেই মাতাল করা তাকে ? মিতা-কে।

প্রায়োপবেশন

যথাযথ বললে, প্রায়োপবেশনই বলতে হয়, সবদিক বিবেচনা করে।

সুতারকিন স্ট্রিটের কাজটা সেরে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুর কফি-হাউসের মোড়টায় এসে খাড়া হয়েছি, থ্রি-বি বাস ধরে নিউ আলিপুর পাড়ায় আমার বোন পুতুলের বাড়ি যাব বলে—কিন্তু বাস ধরাই তো দায়। একটার পর একটা থ্রি-বি আসতে লাগল ঠাসবোঝাই হয়ে—আর পাশ কাটিয়ে চলে যেতে লাগল ফ্রিলি—পা বাড়াবার সাহসই হলো না। আধঘণ্টা ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে—টু-বি আবার নট টু-বি—এই দোনামোনার মধ্যেই—। শেষটায় মরিয়া হয়ে ঠিক করলাম এরপর যে থ্রি-বি-ই আসুক, যতই না ভিড় থাক—উঠে পড়ব লাফ দিয়ে—যে করেই হোক, না হয় প্রাণ হাতে করে ঝুলতে ঝুলতেই যাব নেহাত।

এলো একটা থ্রি-বি, তেমনিতরই ভর্তি, তবুও কোনগতিকে হ্যাণ্ডেল ধরে উঠে পড়লাম।

একতলা থ্রি-বি-গুলোর দুমুখো দরজা। মাথার দিকের মেয়েলি তরফের হাতলটা ধরে উঠতে যাচ্ছি, ল্যাজার দিকের দরজার মুখে যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ঝুলছিলেন তাঁদের একজনা কাতর স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—'উঠবেন না, মশাই ! উঠবেন না দোহাই।'

ল্যাজার দিকে লোকটার কথায় ব্যাজার হতে হলো আমায়—'কেন মশাই, আমি তো এদিক দিয়ে উঠছি, আপনার তাতে কী হলো ?'

বলে ঠেলেঠুলে কোনোরকমে তো সেঁধিয়ে গেলাম ভেতরে। ঢুকতে না ঢুকতেই আওয়াজ পেলাম, ধপাস্ ! মুখ বাড়িয়ে দেখি অন্য দিকের দরজার সেই ঝুলন্ত লোকটি রাস্তার উপরে চিৎপাত হয়ে পড়েছেন। আমার দিকে কড়ানজরে তাকিয়ে ধরাশায়ী ভদ্রলোকটি বললেন—'বারণ করলাম শুনলেন না, দেখলেন তো এখন কী হল !'

সেই ঠাসবোঝাই বাসের এধার থেকে আমার ঠেলাতেই যে ওধার থেকে উনি খসে পড়েছেন সেটা বুঝতে আমি বেগ পাই না, কিন্তু তখন উদ্বেগ বোধ করার অবসর কই ?

ওঁর দিকে দেখব কি, এদিকে বাসের ভেতরেই আরেক দুর্ঘটনা! আমার এই অনুপ্রবেশের জন্যেই কিনা কে জানে, মেয়েদের গা ঘেঁষে যে ভদ্রলোক টায় টায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ঠায়, তিনিও ধপাস্ করে ভদ্রমহিলার কোলের ওপরে বসে পড়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গেই জিভ কেটে তাঁর উঠে পড়ার অবশ্যি দেরি হয়নি, কিন্তু ক্ষমা চাইবার আগেই মেয়েটি তাঁকে আশ্বস্ত করে বসবার অনুরোধ জানিয়েছে। না, তাঁর কোলে নয়, পাশেই—এবং নিজেও একটুখানি ধার ঘেঁষে সরে বসেছেন তিনি।

ভেবেছিলাম উনিও রোষকষায়িত নেত্রে আমার প্রতি তাকিয়ে অভিযোগের কটাক্ষ হানবেন, কিন্তু না, বরং তিনি কৃতার্থের মতই একটু জড়সড় হয়ে বসলেন দেখলাম। এবং মনে হলো একটু সকৃতজ্ঞের মতই যেন চাইলেন আমার পানে।

কিন্তু খাপ্পা হয়ে উঠলেন আরেক ভদ্রলোক।

'ইতর, অভদ্র, ছোটলোক কোথাকার!' গর্জে উঠলেন তিনি।

'আজ্ঞে, মাপ করবেন, আমার ঘাট হয়েছে।' আমি বলতে যাই—কিছুটা কৈফিয়তের সুরেই বোধহয়।

'না, আপনাকে না, বলছি ঐ লোকটাকেই। কেমনধারা মানুষ দেখুন তো! বলা নেই কওয়া নেই, ঝুপ করে একটা মেয়ের কোলে বসে পড়লো হঠাৎ! কী ঘোরতর লোক...অপদার্থ।'

'ওঁর আর দোষ কী? টাল সামলাতে না পেরে...' ভদ্রলোকের পক্ষ-সমর্থনে এগোই আমি—যার ভেতরে আমার নিজের সাফাইটাও উহ্য রয়েছিল।

'টাল সামলাবার কী আছেটা মশাই? বাসের মধ্যে আবার টাল-বেটাল কী। মাথার ওপব রড ছিল না ওর? দু-হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে থাকতে কী হয়েছিল?' তিনি বলতে থাকেন—'অমনি বসে পড়লেই হলো এক ভদ্রমহিলার কোলে!'

'সবার কব্জির জোর কি সমান?' এবার আমার হাত সাফাই। ·ত পিছলে মাথার রড ফসকেও তো যায় এক এক সময়।'

'রাখুন আপনি। নামি না আমি একবার। নামুক না লোকটা বাস থেকে, তারপর দেখিয়ে দেব লোকটাকে। মেয়েদের কোলে বসার মজাটা টের পাইয়ে দেব হাতে হাতে। কব্জির জোর কাকে বলে জানিয়ে দেব এক ঘুষিতে।'

যাঁর উদ্দেশে এত বাক্যবাণ, এমন তম্বি, তিনি কিন্তু স্থানুর ন্যায় নিথর নীরব। নিরাসক্ত। আমিও আর মাঝে পড়ে কথা না-বানিয়ে চুপ করে যাই।

'ইস্টুপিট—রাস্কেল—রট্ন...' আরো উগ্র হয়ে ওঠেন উনি তখন।

'হটেনটট্...হনলুলু...হিপোপটেমাস!' উগরে যান তাঁর গরল একধার থেকে।

'ওঁর আগেই তুমি এখানে বসলে না কেন?' বললেন এবার ভদ্রমহিলাটি ঃ 'তাহলে তো উনি আর...' তার বেশি তিনি এগোন না, কথাটা উহ্য রেখে দেন। মানে, তাহলে তো উনি ওঁর কোলে বসার সুযোগ না পেয়ে ঐ ভদ্রলোকের কোলেই বসতেন। এমনধারা কাণ্ড বাধতো না।

'বসব কেন আমি? তুমি বললেই আমি বসব? মেয়েদের সীট না? মেয়েদের সীটে বসতে যাব কেন? একটি মেয়ে এলেই তো উঠে পড়তে হবে তক্ষুনি। কিন্তু আমি বসিনি বলেই ওঁর এমন কি এক্তিয়ার...পাজি, নচ্ছার, হতচ্ছাড়া! শূয়োর ভণ্ড! শুশুক কোথাকার!'

উপবিষ্ট ব্যক্তিটি চুপ করে থাকেন। শুশুক শুনেও, (গালটা বলা বাহুল্য তেমন সুখকর নয়) তাঁর মুখভাবের কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। কিন্তু মেয়েটির গলায় প্রতিবাদের সুর অর্ধোচ্চারিত হয়—'আহা, কেন মিথ্যে ভদ্রলোককে...'

'ভদ্রলোক!' গর্জে ওঠেন ইনিঃ 'ভদ্রলোকের পোশাক গায়ে থাকলেই ভদ্রলোক হয় না। পরস্ত্রীর কোলে বসাটা কী রকমের ভদ্রতা? শুনি তো একবার?'

এ-কথার কোনো জবাব না থাকলেও প্রশ্নটা আমাকেও যেন পীড়িত করে। পরস্ত্রীর কোলে বসা ভদ্র-অভদ্র কারো পক্ষেই উচিত নয় নিঃসন্দেহে, কিন্তু সত্যি করে বলতে, ভদ্রলোক বসতে আর পেলেন কোথায়? বসতে না বসতেই তো...খতিয়ে দেখলে তাঁর লাভের দিকটায় zero। কোলে বসে জিরোবারও ফুরসত পাননি একটু। বসতে না বসতেই উঠে পড়তে হয়েছে। এটাকে প্রায়োপবেশনই বলা যায় ববং।

'মেয়েদের সীটের গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়ানোর মানেটা কি কেউ বোঝে না নাকি? তাক খোঁজা হচ্ছিল, কখন টালটা আসে। ফাঁক পেতেই ধূপ করে বসে পড়া হয়েছে অমনি।'

উনি নিরুত্তর। ইনি কিন্তু এর আগে যে রেটে এগুচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল, তাঁব স্ল্যাংলাপে শীগ্‌গিরই শ'কার ব'কারে গড়িয়ে আসবেন, কিন্তু কর্ণমর্দনের (নাকি, কর্নওয়ালিসের ?) সেই দশশালা বন্দোবস্তে না গিযে, বোধহয ভাষায কুলিয়ে উঠতে না পেবেই, বাক্যেব শালীনতায় ফিবে এসেছেন বাধ্য হযে। তবু ভালো যে, ভদ্রলোককে মার্জনা কবতে না পারলেও তিনি নিজে অন্তত‌ঃ ভদ্রভাষায় মার্জিত হয়েছেন।

'মেয়েছেলের কোলে বসতে খুব আরাম লাগে, তাই না?' আবার তাঁর কামান-গর্জন হলেও, তাঁর কথার শোনায় এবার যেন একটু সোহাগা মেশানো মনে হয়।

কথাটা শুনে আমার কেমন খটকা লাগে। খট্ করে একটা কথা মনে পড়ে যায়...

বসার কোল ঘেঁষাই কথাটা।

মেয়েদের কোলে বসাটা কেমন আরামের জানিনে, তবে মেয়েদের কোলে বসানোর আরামটা আমার জানা আছে বটে। হাড়ে হাড়েই জানা।

মারাত্মক আরাম। প্রায় কুরুক্ষেত্র কাণ্ডই বলা যায়। দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারেই ঠিক যে-রকমটি ঘটেছিল নাকি একবার।

কুপার স্ট্রিট থেকে ম্যাটিনি শো-এর সিনেমা দেখতে যাব বলে বেরিয়েছি—আমার বোন ইতু, আমি আর পুতুল।

কুপারের থেকে দু'পা এগিয়েই আমি কাহিল—'না বাপু, এই দুপুর রোদে ট্যাং ট্যাং কবে অদ্দুর আমি যেতে পারব না। হাঁটতে আমি পারিনে। হাঁটুর অত জোর নেইকো আমার।'

'এই কাছেই তো পূর্ণ সিনেমা! কদ্দুর আর?' ইতুচন্দর বলেন: 'এতে হাঁটুর আর খাটুনি কী! এইটুকুন তুমি হাঁটতে পারো না শিব্রামদা?'

'তুই হলি পাহাড়ে মেয়ে। তোর সঙ্গে হেঁটে আমি পারি? তোর পায়ের হাড় কতো শক্ত। তোর পায়ের কব্জি দ্যাখ, আর আমার পায়ের। তোর সঙ্গে পাঞ্জাতেই আমি পারব না, আর, হাঁটনের পাল্লায় পারব! এখান থেকে রসা রোড অব্দি হাঁটতে হলেই আমার হয়েছে। না বাপু, তোমরা একটা রিকসা ডাকো বরং।'

রিকসা এলো, কিন্তু পুতুল প্রশ্ন তুললো—'রিকসায় কি তিন জন ধরবে?'

'একজন কারো কোলে বসুক নাহয়?' বলে দিলাম আমি।

'কে বসবে শুনি?' পুতুলের পুনরপি প্রশ্ন থাকে।

'আমার তো কোলে বসার কথাই ওঠে না। তোদের দুজনের কেউ কারো কোলে বসুক তাহলে।'

'না দাদা, আমি ইতুর কোলে বসে যাব না, আমি ওর দিদি না?'

'তাহলে ও-ই তোর কোলে বসে যাক।' দেখা গেল, ইতুর তাতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু পুতুলের আপত্তি ঘোরতর—'বাব্বা! ও যা ভারী! ওকে আমি কোলে বসাতে কিছুতেই রাজি নই। ইতুকে কোলে করে অদ্দুর যেতে হলেই আমার ইতি।'

তারপর? তারপর সেই পুরনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। পৌরাণিক পালার পুনরভিনয়। সেই কুরুক্ষেত্র কাণ্ড!

আমার কোলে বসারই কথা উঠল তখন। অম্লানবদনে ইতুই বসল আমার কোলে।

কোনো ষোড়শী তরুণীকে নিজের কোলে পেলে নেহাত মন্দ হয় না, মোহের বশে ঘুণাক্ষরে কখনো হয়তো নির্জ্ঞানে করে থাকব, কিন্তু সেই স্বপ্ন চুরমার হয়ে যেতে বেশি দেরি হলো না আমারা। ল্যান্সডাউন মার্কেটও পেরুইনি, আমি চিৎকার করে উঠেছি—'এই রিকসাওলা! রোকো রোকো। রোক্কে। ...একদম রোক্কে এই নাম, নাম—নাম তোরা সব।'

নামবার পর রিকসাওলার প্রণামী গুনি—'এই লেও তুমহারা ভাড়া। যাও, ভাগো। ভাগো হিঁয়াসে। এই মহল্লাসে ভাগ যাও।' আমি হল্লা করে উঠি—'আউর কভি ইধর নেহী আনা।'

হলো কী তোমার?' পুতুল শুধোয়: 'হলোটা কী?'

'আর হলোটা কী! পায়ের হাড়গোড় সব গুঁড়ো হয়ে গেল আমার—বাব্বা! ইতু যে একটা আস্ত পাহাড় তা কে জানত।'

'তখনই বলেছিলাম না আমি? শুনলে না তো।' সে বলে।

'আমি কি বসতে চেয়েছিলুম তোমার কোলে?' প্রতিবাদ করে ইতু: 'তুমিই আমার কোলে বসতে পারতে, ইচ্ছে করলে।'

'বা রে! ও দিদি হয়ে বসল না, আর আমি দাদা হয়ে বসতে যাব? মায়ের পেটের না হলেও, আমি তোদের দাদা না? আমার একটা আত্মসম্মান নেই?'

'তাহলে আমি আর কী করব!'

'কী সুখে যে মেয়েদের কোলে নিতে চায় লোকে!' আমি বিরক্তি প্রকাশ করি।

'আমি তো চাইনি। ও যা ভারী, জানি তো।' পুতুল জানায়ঃ 'ওকে কেন, কোনে । মেয়েকেই আমার কোলে নিতে চাই না আমি কক্ষনো।'

তা সত্যি, মেয়েরা কখনো তা চায় না বটে। মেয়ে হয়ে তারা মেয়েদের মর্ম বোবে না, সেই জন্যেই কিনা—নাকি, মর্মে মর্মে সেটা বোঝে বলেই,—তার মর্মোদ্ঘাটন করা আমার কম্মো না; তবে দেখেছি যে হাল্কা গোছের শিশুদেরই কোলে কাঁখে এমন কী গর্ভে ধারণ করতেও তারা গর্ববোধ করে, কিন্তু ভুলেও কক্ষনো কোনো মেয়েবে নিজের কুক্ষিগত করতে যায় না। চায়ও না। স্বভাবতই তারা বুদ্ধিমান।

কিন্তু হনুমানরা চায়। এমনকি, দারুণ দুরাকাঙ্ক্ষায় তারা হনুমানকেও টেক্কা মাবতে যায়। এই যেমন আমি। স্বয়ং মহাবীর শুধু গন্ধমাদনই ঘাড়ে করেছিলেন, কাঞ্চনজঙ্ঘাকে কোলে করতে যাননি। কিন্তু হনুমত্তায় (নাকি, হনুমত্ততায়?) তাঁকেও ছাড়িয়ে গিয়েছি আমি।

'তুই না চাইতে পারিস।' জবাব দিই পুতুলকেঃ 'কিন্তু অনেকে চেয়ে থাকে।'

'কেউ চায় না। ধাড়ি ধাড়ি মেয়েকে কেউ কোলে নেয় নাকি? না, নিতে চায আবার?'

'ছেলেরা চায়। ...দুর্যোধন চেয়েছিল।'

'দুর্যোধন?'

'চায়নি দুর্যোধন? যার জন্যে অমন কুরুক্ষেত্র কাণ্ডটা বাধলো? দ্রৌপদীকে নিজেব কোলে বসাতে চেয়েছিল বলেই না!'

পুতুল চুপ করে যায়। পুরাতত্ত্বের গর্ভে হাবুডুবু খেতে চায় না হয়তো বা।

'আহা, তখন যদি শ্রীমতী যাজ্ঞসেনী তাব কোলে চেপে বসতেন গিয়ে! তখনই তো উরুভঙ্গ হয়ে যেত বেচারার। তাহলে আব অত কাণ্ড করে অত কাঠখড় পুড়িযে 'ভগ্নউরু কুরুপতি' করার জন্য ঐরকম কুরুক্ষেত্র বাধাতে হতো না।'

কোলে বসালেই এই! আর, কোলে বসলে যে কী হয় তা তো চোখের সামনেই দেখছি—এই বাসেই। আর, তাও কিছু কম কুরুক্ষেত্র নয়।

'...ছোটলোক!...আহাম্মোক!...যৎপবোনাস্তি!...' তখনো ভদ্রলোক গঞ্জনা দিযে চলেছেন সমানে। আর, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি তখনো তেমনি নির্বিকার নীরব। বিলকুল স্পীক-টি-নট!

কিন্তু আমি আর প্রতিবাদ না-করে পারি না। বলি—'যৎপরোনাস্তি কি একটা গাল নাকি মশাই? আপনি যে যা মুখে আসছে তাই বলে যাচ্ছেন!'

যার-পর-নাই হয়ে যাবার পর পার্শ্বোপবিষ্ট ভদ্রলোকের বুঝি আর সহ্য হয় না। তিনি উঠে দাঁড়ান—

'আমি নামব এবার।' বলে মেয়েটিকে তিনি নমস্কাব জানিযে ভদ্রলোকেব দিকে একখানা কার্ড বাড়িয়ে দেন—

'এই নিন আমার নাম-ঠিকানা। যাবেন একদিন আমার বাড়ি। আমার বৌয়ের কোলে বসে আসবেন ঘণ্টাখানেক।'

চলে যাবার আগে বলে যান তিনি।

চোখের ওপর ভোজবাজি

সবার উপরে মানুষ সত্য—ঘোরতর সত্যি কথা। উপরওয়ালা যে প্রচণ্ডভাবে অমোঘ, তা কে না জানে? কিন্তু মানুষ আর কতক্ষণ উপরে থাকতে পারে? উপরের মানুষটির কতক্ষণ আর উপরি উপায়ের সুযোগ থাকে? নিজের কর্মদোষে আপনার থেকেই কখন নীচে নেমে পড়ে।

আমরা তো হর্ষবর্ধনকে অদ্বিতীয় বলেই জানতাম, কিন্তু তিনি যে নিজগুণে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করবেন, করতে পারেন, তা কখনো আমার ধারণার মধ্যে ছিল না।

ধারণাটা পালটালো ওঁর গিন্নীর কথায়। যেতেই তিনি ভীষণ খাপ্পা হয়ে কথাটা জানালেন আমায়। আর বললেন যে, 'অ্যাদ্দিন লোকটা বেশ চৌকোস ছিল, কিন্তু আপনার সঙ্গে মেশবার পর থেকেই নাকি কেমন ধারা যেন ভোঁতা মেরে যাচ্ছে। বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে কিছু নেই আর।'

'কিন্তু আমাকে তো বেশ ধারালো বলেই আমি জানতাম' ...মৃদু প্রতিবাদের ছলে বলিঃ 'উনি যেমন ধার দিয়ে ধারালো, তেমনি ধার নেবার বেলায় আমার তো আর জুড়ি হয় না।'

'ধারালো লোকের ধার ঘেঁষতে নেই কখনো।' পাশ থেকে ফোড়ন কাটে গোবরাঃ 'ধারে ধারে ঘষাঘষি হয়ে ধার ক্ষয়ে ভোঁতা মেরে যায় শেষ য়। তাই হয়েছে গিয়ে দাদার।'

তারপর সমস্ত কথা জানতে পারলাম সবিশেষ। হর্ষবর্ধনের চোখের ওপর ভোজবাজিটা ঘটে গেল কেমন করে! যেন কোন যাদুকরের মায়াদণ্ডেই হাওয়া হয়ে গেল গাড়িটা!

হয়েছিল কী, হর্ষবর্ধন গত সকালে চুল ছাঁটতে গেছলেন পাড়ার কাছাকাছি এক সেলুনে। সেলুনে কাল ভীড় ছিল বেজায়। তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে খানিকক্ষণ।

অপেক্ষমান হর্ষবর্ধনের সামনে কতকগুলো বই এনে ধরে দিল সেলুনওলা—'চুপচাপ বসে থাকবেন কেন বাবু! এই বইগুলো দেখুন ততক্ষণ নেড়েচেড়ে। আপনার আগে তো আরো জনাতিনেক রয়েছেন, তাঁদের ছাঁটাই শেষ হলেই তারপর আপনাকে ধরব।'

বইগুলো নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করছেন এমন সময় অপরিচিত একজন এসে তাঁর পাশে বসল—

'নমস্কার হর্ষবর্ধনবাবু!' বলেই এক নমস্কার ঠুকল তাঁকে।

'নমস—কার!' প্রতিধ্বনির সুরে বললেও লোকটা যে কে তা কিন্তু তাঁর আদৌ ঠাওর হয় না।

'আপনি আমাকে চিনবেন না মশাই! আপনার প্রায় প্রতিবেশীই বলতে গেলে। দুটো গলির ওধারে আমি থাকি। তবে আপনাকে আমি বেশ চিনি। আপনি আমাদের পাড়ার শীর্ষস্থানীয়। কে না চেনে আপনাকে?'

'না না! কী যে বলেন, আমি...আমি নিতান্ত সামান্য লোক।' অপরের দ্বারা স্তুত হয়ে হর্ষবর্ধন কেমন অপ্রস্তুত বোধ করেন।

'আপনি অসামান্য, আপনি অসাধারণ। জানেন, পাড়ার ছেলে বুড়ো সকলে, ইতর ভদ্র সবাই আমরা, আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করি?' বলে লোকটি একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে: 'এই দেখুন না, আপনাকে এই সেলুনে ঢুকতে দেখে আমিও এখানে দাড়ি কামাতে এলাম। নইলে নিজের বাড়িতেই তো কামাই রোজ। নিজের হাতেই কামাই।'

'আমি চুল ছাঁটতে এসেছি।' হর্ষবর্ধন কথাটা উড়িয়ে দিতে চান। নিজের দৃষ্টান্তস্বরূপ হওয়াটা যেন তাঁর তেমন পছন্দ হয় না।

বলেই তিনি বইগুলো ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দেন—'পড়তে দিয়েছে এগুলো। দেরি হবে এখানে চুল ছাঁটবার, দাড়ি কামাবার। হাত খালি নেই কারো—দেখছেন তো! পড়ুন এগুলো ততক্ষণ।'

'এসব তো রহস্য রোমাঞ্চের বই।' দেখেশুনে নাক সিঁটকান ভদ্রলোক: 'ভুতুড়ে অ্যাডভেঞ্চারের গল্প যতো। পড়লে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। কেন যে রাখে এগুলো এখানে কে জানে!'

'ওই জন্যেই বোধহয়।' হর্ষবর্ধন বাতলান: 'মাথার চুল খাড়া হয়ে থাকলে ছাঁটবার পক্ষেও ওদের সুবিধা হয় হয়ত।'

একটা গভীর রহস্যের রোমাঞ্চকর সমাধান করে ওঁকে যেন একটু সহর্ষই দেখা যায়।

'তা যা বলেছেন!' তাঁর কথায় সায় দেন ভদ্রলোক: 'এই এলাকায় এই একটাই তো ভাল সেলুন! তবে এই বড় রাস্তার ওপরে, পাড়ার থেকে অনেকটা দূর—রোজ রোজ আর কে এখানে দাড়ি কামাতে আসছে বলুন! এধার দিয়ে যাচ্ছিলাম, আপনাকে ঢুকতে দেখলাম বলেই না...তা, আপনার গাড়িটা কোথায় রাখলেন?'

'গাড়ি! গাড়ি কই আমার!' হর্ষবর্ধন নিজের দাড়িতে হাত বুলোন—'গাড়ি নেই বলেই তো এত ঝামেলা, দুবেলা গিন্নী বাড়ি মাথায় করছেন সেইজন্যে! গাড়ি আর পাচ্ছি কোথায়!'

'সে কী! আপনি পাচ্ছেন না গাড়ি?' ভদ্রলোক রীতিমতন সবিস্ময়।

'কই আর পাচ্ছি মশাই! তিন বছর হলো দরখাস্ত দিয়ে বসে আছি...তবে এবার একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে। এতদিনে আমার নাম লিস্টির মাথায় এসেছে। সবার ওপরে আমার নাম দেখে এলাম সেদিন। এইবার পাবো মনে হয়।'

'পেলেও পেতে পারেন।' ভরসা দেন ভদ্রলোক—'মাথায় মাথায় হলেই পাওয়া যায় কিনা!'

'হ্যাঁ, এজেন্টও সেই কথা বলল। বলল যে, আপনার গাড়ি পৌঁছে গেছে ডকে,

দু-একদিনের মধ্যেই মাল খালাস হয়ে আসবে। দিন দুই বাদে এসে দাম চুকিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে পারবেন, বলল এজেন্ট।'

'আপনি ভাগ্যবান।' উল্লসিত হন ভদ্রলোক, 'কী গাড়ি বলুন তো?'

'ফিয়াট তো বলল।' হর্ষবর্ধন জানানঃ 'ফ্রিয়াট না—কী যেন!'

'ফি—য়া—ট!' উপচে ওঠা উৎসাহ হঠাৎ যেন চুপসে গেল লোকটার—'ফিয়াট!'

'কিরকম গাড়ি মশাই?' হর্ষবর্ধন জানতে উদ্‌গ্রীব।

'যাচ্ছেতাই! ফিয়াট না বলে আপনি ফীয়ারও বলতে পারেন।'

'তার মানে?'

'ফীয়ার মানে ভয়। ভয়ঙ্কর গাড়ি মশাই।'

'সে কী! তবে যে খুব ভালো গাড়ি বলল এজেন্ট?'

'ওরকম বলে ওরা। বেচতে পারলেই তো ওদের কমিশন। মোটামুটি লাভ।'

'তাই নাকি?'

'বেশ বড়ো গাড়িই তো পেয়েছেন? বিগ ফিয়াট, নাকি বেবি ফিয়াট?' জানতে চান ভদ্রলোক।

'না, তেমনটা নাকি বড় হবে না, বলল লোকটা। তবে নেহাত ছোটও নয় তা'বলে। মাঝামাঝি সাইজের বলেছে এজেন্ট।'

'কজন চাপবার লোক বাড়িতে আপনাব?'

'তিনজন আমব। আমি আমাব গিন্নী আর আমার ভাই গোবরা—এই তো। ড্রাইভারকে ধরে জনা চাবেক স্বচ্ছন্দে যেতে পাবে, সেইবকম জানা গেল।'

'কুলিয়ে যাবে তাহলে আপনাদের।'

'তা যাবে। গোববা ড্রাইভাবেব পাশেই বসবে না হয়, তাতে কী হয়েছে! আমরা কর্তা গিন্নী দুজনায় ভেতবে বসব দুজনে। অবশ্যি, আমরা একটু ·টার দিকে, তাহলেও মোটামুটি আমাদের চলে যাবে মনে হয়।'

'মোটামুটিই হন আর পাতলাপাতলিই হন, আপনাদের চলে যাবে বুঝলাম।' বলার সময় ভদ্রলোকের মুখ বেশ ভার হয়—'তবে গাড়িটা যদি চলে—তবেই না!'

'কেন, গাড়ি কি চলবে না নাকি?'

'কেন চলবে না! চালালেই চলবে। ঠেলেঠুলে চালাতে হবে। ঠেলেঠুলে চালালে কী না চলে বলুন? বাড়িতে আপনারা কজনা আছেন বললেন? ড্রাইভারকে বাদ দিয়ে অবশ্যি সে তো ধর্তব্যের বাইরে, কেননা, সে তো স্টিয়ারিং ধরে বসে থাকবে। কজনা আছেন বললেন আপনারা?'

'আমি, আমার বৌ, আমার ভাই—তাছাড়া একটা বাচ্চা চাকর—এই চারজন।'

'চারজনা মিলে ঠেললে গাড়ি চলবে না আবার! চারজনায় চার্জ করলে, বলে, ঠেলেঠুলে হাতিকেও চালিয়ে দেওয়া যায়।'

'ঠেলেঠুলে নিয়ে যেতে হবে গাড়ি, তার মানে? ঠেলাগাড়ি নাকি মশাই?' অবাক হন হর্ষবর্ধন।

'না না, তা কেন? মোটর গাড়িই, আর, দম দিয়ে চালাবার মত না হলেও, একটু উদ্যম লাগবে বইকি!... তবে একটু ঠেলা আছে।' তিনি বিশদ করেন—

'ঐ গোড়াতেই যা একটু ঠেলতে হবে। তারপর একবার ইঞ্জিন চালু হয়ে গেলে গড গড করে গড়িয়ে চলবে গাড়ি। এগুলোর অ্যাকসেলেটার ততো ভালো নয় কি না, তাই এরকমটা। আপনার থেকে স্টার্ট নেয় না তাই।'

'নতুন গাড়ির এমন দশা কেন মশাই?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু।

'নতুন গাড়ি কি এদেশে পাঠায় নাকি ওরা? সব সেকেণ্ডহ্যাণ্ড।' জানান ভদ্রলোক: 'বলে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড, আসলে কতো হাত ঘুরে এসেছে কে জানে! তাকেই আনকোরা বলে চালায় এখানে বাজারে।'

'এই রকম! জানতাম না তো। হর্ষবর্ধনকে একটু ম্রিয়মাণ দেখা যায়। 'ওদের শো রুমে ঐ ফিয়াট ছিল আরো দু-একখানা। এজেণ্ট ভদ্রলোক নমুনা দেখালেন আমায়—ঝক্‌ঝকে নতুন—খাসা চমৎকার দেখতে কিন্তু।'

'ঐ ওপর ওপর।' সমঝদারের হাসি হাসেন ভদ্রলোক। —'উপরে চাকন-চিকন ভিতরে খড়ের আঁটি। উপরটা ঝকঝকে, ভিতরটা ঝরঝরে।' একটু দম নিয়ে তিনি নবোদ্যমে লাগেন আবার—'তা ছাড়া এই গাড়িগুলোর আরেকটা দোষ এই যে পেট্রল কনজাম্‌পসন বড্ড বেশি। পেট্রল খায় খুব।'

'তা খাক্। খাইয়ে লোকেদের আমরা পছন্দ করি। আমরাও খুব খাই মশাই।'

'শুধুই কি পেট্রল? তাছাড়া হোঁচোট— ?'

'হোঁচোট?' হর্ষবর্ধন বুঝতে পারেন না। চোট খান হঠাৎ।

'যেতে যেতে হোঁচট খায় যে গাড়ি। ভয়ঙ্কর স্কিড্ করে।'

'ছাগলছানা সামনে পড়লে আর রক্ষে নেই বুঝি?' হর্ষবর্ধন শুধান: 'চাপা দিয়ে চলে যায় বলছেন তাই?'

'ছাগলছানা পাচ্ছেন কোথ থেকে?' ভদ্রলোক হতবাক।

'ঐ যে বললেন ইস্‌কিড? ইস্‌কিড মানে তো ছাগলছানা। বিড এ ম্যান গো টু দি ইস্‌কিড্। পড়িনি নাকি ফাস্‌ট্‌বুকে?'

ছাগলছানা অব্দি যে তাঁর বিদ্যের দৌড় সেকথা অম্লানবদনে প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধা করেন না।

'না না। সে তো হলো গিয়ে কিড। এটা স্কিড। তার মানে, যেতে যেযে হঠাৎ লাফিয়ে যায় গাড়িটা। টক করে বেটক্করে গিয়ে পড়ে। বেঘোরে মানুষ খুন করেও বসে মাঝে মাঝে।'

'অ্যাঁ?' আঁতকে ওঠেন হর্ষবর্ধন।

'মারাত্মক গাড়ি মশাই—তবে আর বলছি কী!'

'কী সর্বনাশ!'

'সর্বনাশ—বলতে! গাড়ির ব্রেকটাই আসলে খারাপ। হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবে

আপনাকে। রাস্তায় যত খুন জখম হবে আপনার গাড়ির তলায়, তার খেসারত গুনতে গুনতে দুদিনেই আপনি ফতুর হয়ে যাবেন।'

'লাখ লাখ টাকা ফাঁক হয়ে যাবে ঐ গাড়ির জন্যেই? আপনি বলছেন?'

'ঐ ব্রেকের জন্যই ব্রোক হতে হবে আপনাকে শেষতক।' ভদ্রলোকের শেষ কথা।

ব্রোক হবার আগেই যেন ব্রেক ডাউন হয় হর্ষবর্ধনের, ভেঙে পড়েন তিনি—শুনেই না!

'আর কলিশন হলেই তো হয়েছে। যদি আর কোনো গাড়ি কি ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে একটু ধাক্কা লাগে তাহলেই ভেঙে তক্ষুনি চুরমার! যা ঠুনকো গাড়ি মশাই!'

'তাহলে আমরাও তো খতম্ হয়ে যাবো সেই সঙ্গে?'

'খতম্ না হলেও জখম তো বটেই। তবে গাড়িটা কিনেই ইনসিওর করিয়ে নেবেন, আপনারাও লাইফ ইনসিওর করে রাখবেন নিজেদের—তাহলেই কোনো ভয় নেইকো আর। দুদিকই রক্ষা পাবে তাহলে। কোম্পানির থেকে দুটোরই খেসারত পেয়ে যাবেন তখন।'

'মারা গিয়ে টাকা পাওয়ার কোনো মানে হয়?' তাঁর কথায় হর্ষবর্ধন তেমন ভরসা পান না : 'আর নাই যদি বা মরি, কেবল হাত পা-ই হারাই—কিন্তু তা হারিয়ে অর্থলাভ করাটা কি একটা লাভ নাকি?'

'সেটা দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য। যে যেমনটা দ্যাখে। কেউ টাকা উপায় করার জন্য সারা জীবন ব্যয় করে। কেউ বা জীবন রক্ষা করতে গিয়ে দু হাতে টাকা ওড়ায়। যার যেমন অভিরুচি।'

'ইস্! ফেঁসে গিয়েছিলাম তো আরেকটু হলেই। ফাঁসিয়ে দিয়েছিল গাড়িটা। কী ভাগ্যি আপনার সঙ্গে দেখা হলো আজ, আপনি বাঁচিয়ে দিলেন মশায়। আমাকেও—আমার টাকাকেও।'

'না না, তাতে কী হয়েছে। আপনি ঘাবড়াবেন না। চাপবার জন্যে কি আর গাড়ি? তার জন্যে তো ট্যাক্সিই রয়েছে। রাস্তায় পা দিয়েই যদি ট্যাক্সি পাওয়া যায় তার চেয়ে ভালো আর হয় না। আর তা সস্তাও ঢের। আর এধারে দেখুন, এসব গাড়ির পেছনে খর্চাটা কম নাকি? ঠুনকো গাড়ি, পচা কলকব্জা, একটুতেই বিকল। আর্ধেক দিন কারখানার গ্যারেজেই পড়ে থাকবে—তারপর মেরামত হয়ে এলেও, দুদিনেই আবার যে কে সেই।'

'এমন গাড়িতে আমার কাজ নেই। এ গাড়ি আমি নেব না।'

'না না, নেবেন না কেন? বললাম না, চাপবার জন্য তো গাড়ি নয়। গাড়ি হচ্ছে বাড়ির শোভা, বাড়ির ইজ্জৎ বাড়াবার। বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকলে পাড়াপড়শীর কাছে মান বেড়ে যায় কতো।'

'আমার গিন্নীও সেই কথা বলেন বটে। বলেন যে, একটা গাড়ি নেই বলে পাড়াপড়শীর কাছে মুখ দেখানো যাচ্ছে না।'

'ঠিকই বলেন তিনি। বাড়ি গাড়ি এসব তো লোককে দেখানোর জন্যেই মশাই! দেখে

যাতে পাড়ার সবার চোখ টাটায়। তবে এ যা গাড়ি—চোখে আঙুল দিয়ে তো দেখানো যাবে না পড়শীদের।' বলেন ভদ্রলোক : 'তেমন করে দেখাতে গেলে তো তাদের চাপা দিয়ে দেখাতে হয়। নিদেন চাপা না দিলেও, গা ঘেঁষে গিয়ে কি গায়ে কাদা ছিটিয়ে গেলেও চলে, কিন্তু তাতো আর এ গাড়িতে সম্ভব হবে না। তবে হ্যাঁ, পড়শীদের কানে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারেন বটে।'

'কানে আঙুল দিয়ে?' তিনি অবাক হন : 'সে আবার কী রকম দেখানো?'

'হ্যাঁ, ঐ ঘচাং ঘচ্! ঐটা করতে পারেন বটে। ঐ ঘচাং ঘচ্।'

'ঘচাং ঘচ্?'

'হ্যাঁ। আপনারা চারজন আছেন বললেন না? কর্তা, গিন্নী, দেওর আর বাড়ির চাকর, চারজন তো রয়েছেন। বাড়ির দেউড়িতে থাকবে তো গাড়ি, গাড়ির চার দরজায় আপনারা চারজনা দাঁড়াবেন। তারপর ঐ ঘচাং ঘচ।'

'ঘচাং ঘচটা কী মশাই?' বারংবার শুনে বিরক্ত হন হর্ষবর্ধন।

'আপনারা চারজনায় মিলে গাড়ির চারটে দরজা কেবল খুলুন আর লাগান—ঘণ্টায় ঘণ্টায়—ঘণ্টার পর ঘণ্টা! ঘচাং ঘচ—ঘচাং ঘচ...ঘচাং ঘচ...চলতে থাকুক পরম্পরায়। রীতিমতন কানে আঙুল দিয়ে টের পেতে হবে পড়শীদের...যে হ্যাঁ, গাড়ি একখানা আছে বটে পাড়ায়। চালান সারাদিন ঐ ঘচাং ঘচ।'

'কিন্তু নাহক ঘচাং ঘচ করাটা কি ভালো?'

'তাহলে ঘচাং ঘচের ফাঁকে ফাঁকে প্যাঁ পোঁ চালাবেন। তাও করতে পারেন ইচ্ছে করলে—সেও মন্দ নয় কিছু।'

'প্যাঁ পোঁ?' একটু যেন ভড়কেই যান তিনি।

'হ্যাঁ। ঐ প্যাঁ পোঁ, গাড়ির সবকিছু বাজে হলেও ওর হর্নটা কিন্তু নিখুঁত। সেটাও বেশ বাজে। মাঝে মাঝে তাই বাজান। চলুক ঐ প্যাঁ পোঁ আর ঘচাং ঘচ!'

'দূর মশাই ঘচাং ঘচ। আমি এক্ষুনি চললাম অর্ডার ক্যানসেল করতে—অমন ঘচাং ঘচে গাড়ি চাই নে আমার।'

চুল না ছেঁটেই তীর বেগে বেরিয়ে পড়লেন হর্ষবর্ধন। বাড়ি ফিরলেন গাড়ি খারিজ করে দিয়ে তারপর।

'না গিন্নী! ঘচাং ঘচ করা পোষাল না আমার পক্ষে!'

বলে বাড়ি ফিরে গিন্নীর কাছে পাড়তে গেছেন গাড়ির কথাটা, তিনি তো বাড়ি মাথায় করে তুললেন। কর্তার বোকামির বহর মাপতে না পেরে কিছু আর বাকী রাখলেন না তাঁর।

বৌয়ের বকুনি খেয়ে আজ সকালেই আবার তিনি মুখ চুন করে গেছেন সেই এজেন্টের কাছে—'গাড়িটা চাই মশাই! আমি মত পালটেছি আমার।'

'গাড়ি আর কোথায়! আপনি অর্ডার ক্যানসেল করে যাবার পর যিনি দু-নম্বরে ছিলেন—আপনার ঠিক পরেই ছিলেন যিনি—পেয়ে গেছেন গাড়িটা। ঐ যে তিনি

ডেলিভারি নিয়ে বেরিয়ে আসছেন এখন।' তিনি দেখিয়ে দেন—'তবে যদি বলেন, আপনার নাম আমি দ্বিতীয় স্থানে রাখতে পারি অতঃপর। এর পরের পর যে গাড়ি আসবে সেইটা আপনি পাবেন। ফের আবার তিন বছরের ধাক্কা হয়ত বা।'

হর্ষবর্ধনের চোখের ওপর দিয়ে প্যাঁ পোঁ করতে করতে চলে গেল গাড়িটা। তাঁর মুখ দিয়ে বেরুতে শোনা যায় শুধু—'সেই ভদ্রলোক দেখছি! সেলুনের আলাপী কালকের সেই ঘচাং ঘচ্...!'

অ-দ্বিতীয় সেই ভদ্রলোককে দেখে আপন মনেই তিনি খচখচ করেন।

র ধরা কল

ইঁদুর অর্চনার রেওয়াজ এদেশে নেই, কিন্তু সিদ্ধিদাতার বাহন শ্রীমান মূষিকও কিছু কম সিদ্ধিপ্রদ নন—উৎসবের এই কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারব।

এমনকি অতঃপর ইঁদুরকে নিয়ে একেবারে বারোয়ারি সার্বজনীনের চল না হলেও ছোট্ট খাট ঘরোয়া উৎসব বেশ জমতে পারে, আশা করব অবশ্যই।

পর্বতের মূষিকপ্রসব বলা ঠিক না গেলেও মষিকের পর্বতপ্রসব হয়ত বা বলা যায়। পর্বত না হলেও পার্বতী তো বটেই।

সেদিন সকাল আটটার সময় চোখ মেলেই উৎসব দেখতে পেল তার ঘরের জানালার গা ঘেঁষে রঙীন শাড়ি ঝুলছে একখানা। তার ওপরকার ফ্ল্যাটে ভাড়াটে এলো তাহলে এতদিনে!

রঙীন শাড়িটা তার মনেও একটু রঙ ধরালো বুঝি!

উপরে নীচে পাশাপাশি অনেকগুলো ফ্ল্যাট নিয়ে তাদের পাচতলা বাড়িটা। একঘরের ফ্ল্যাট, দু'ঘরা, আর তিনঘরা ফ্ল্যাট সব। প্রত্যেক ফ্ল্যাটের সঙ্গে সংযুক্ত রান্নাঘর, স্নানের ঘর এবং সব কিছু। টেলিফোনও আছে প্রত্যেক তলাতেই। তবে নিজেরটায় দু'টি শয়নকক্ষ। তার উপরেরটাও দু'ঘরা ফ্ল্যাট—উৎসব এখানে এসে আগেই ওটা দেখেছিল, তার পরে দু'টোর ভেতরে পছন্দ করে এই নীচেরটাকেই সে বেছে নিয়েছে।

নিয়েছিল যে তার ভাগ্যি! নইলে, উপরের ফ্ল্যাট হলে এই শাড়িধারিণীর আবির্ভাব তার অলক্ষ্যেই থেকে যেতো হয়ত। তারপরে যাঁর শাড়ি তার সঙ্গেও তার দেখা হয়েছে মুখোমুখি—সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে একাধিকবার। মেয়েটি তরুণী সুশ্রী আর অবিবাহিত, তাও দেখেছে সে।

দেখে তার মনে হয়েছে যে, উপরের ঘর ভাড়া নেবার এমন কী দরকার ছিল মেয়েটির! তার পাশের ফ্ল্যাটটাই তো খালি পড়ে আছে, আর, যে কালে প্রত্যেক ফ্ল্যাটই স্বতন্ত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ আর প্রত্যেক তলাতেই টেলিফোন।

আর। একই ভাড়া যখন সব ফ্ল্যাটের, তখন পাশাপাশি বাস না করে উপরে গিয়ে থাকার কোনো মানে হয়?

সিঁড়ি ধরে ওঠা নামার অবসরে গায়পড়া আলাপও যে এক আধটু গড়ায়নি তা নয়। উৎস জেনেছে যে মেয়েটি কোন ইস্কুলের শিক্ষিকা, একলাই থাকে। আর নাম তার পার্বতী। আর সেই সূত্রে মেয়েটিকে সে জানিয়ে দিয়েছে যে সে হচ্ছে উৎস, এক কলেজে প্রফেসারি করে—সম্প্রতি ডক্টরেটের থিসিস লেখায় উৎসাহী।

এর বেশি এগোয়নি আর। তবে নীচের ঘরে নিজের বিছানায় শুয়ে বা ডেকচেয়ারে বসে বসেই সে উপরের খবর সব রাখতে পারে। কখন মেয়েটি বেরোয়, কখন ফিরে আসে, কখন তার স্টোভ ধরায় আবার কখনই বা সে বাথরুমে যায়—নীচে বসেই সব টের পায় উৎস।

আর, সেই আন্দাজে যথাসময়ে সে সিঁড়িটার মাথায় গিয়ে দাঁড়ায়। দেখতে পায় নেমে আসছে মেয়েটি—কিন্তু তার কুশল জিজ্ঞাসা আর মেয়েটির মিষ্টি হাসির বেশি এগোয় না কিছু আর। নিজের কাজে বেরিয়ে যায় মেয়েটি।

এইরকমই চলেছে, অকস্মাৎ একদিন ধারাটা যেন পালটে গেল কেমন করে।

উৎস বেড়াতে বেরিয়েছে, কিন্তু সিঁড়ির সম্মুখে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো মেয়েটি ভীত চকিত বন্যহরিণীর মতই।

'উৎস বাবু! বেরুচ্ছেন নাকি আপনি?' জিজ্ঞেস করেছে সে।

'বেরুচ্ছিলাম, তবে দূরে কোথাও নয়, এই ডাকবাক্সে একটা চিঠি ফেলতেই যাচ্ছিলাম।' দাঁড়িয়ে গেল সে।

'আমার ঘরে একটা ইঁদুর!' সভয়ে জানালো পার্বতী। 'আমি ছুটে পালিয়ে এসেছি।' উৎসর হাতে যে কোনো চিঠি-পত্র ছিল না তা সে লক্ষ্য করেনি।

'চলুন তো দেখি।' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে উৎস শুধোয়—'নেংটি ইঁদুর? না ধাড়ী একটা?'

'খুব ধাড়ী নয়, নেহাত নেংটিও না, তার মাঝামাঝি...কিন্তু ভয়ঙ্কর!'

'তা, ইঁদুর একটু ভয়ঙ্কর বই কি!' উৎস সায় দেয় তার কথায়ঃ 'কামড়ে দিলেই তো র‍্যাটফিভার। তার কোনো চিকিচ্ছে আছে কিনা আমার জানা নেই।'

'কী সর্বনাশ!' বলে মেয়েটি নিজের ঘরের দরজা খোলে। তারপর তড়াক করে এক লাফে একটা চেয়ারের ওপরে গিয়ে দাঁড়ায়—'ওই! ওই যে!' ভীতিবিহ্বল চোখে সে তাকিয়ে থাকে।

'ওটাকে ধরতে না পারলে তো রাত্তিরে আমি ভয়ে ঘুমুতেই পারব না।' সে বলে, 'পারবেন তো পাকড়াতে?'

'চেষ্টা করে দেখা যাক।' উৎসাহিত হয়ে এগুলো উৎস। 'যদিও আমার তেমন প্র্যাকটিশ নেই। ধরতে গেলে এটা বেড়ালদেরই কাজ তো।'

একটু তাড়া পেতেই ইঁদুরটা উধাও হয়েছে। চকিতের মধ্যে চোখের উপরেই যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। আনাচেকানাচে কোথাও আর তার পাত্তা নেই।

'যাক্ পালিয়ে গেছে ইঁদুরটা। এতক্ষণে তিনটে বাড়ি ছাড়িয়ে গেছে আমার বিশ্বাস।

এ তল্লাটেই নেইকো আর। যা তাড়া লাগালুম ওকে!' বলতে গেছে উৎস; বাধা পেয়েছে মেয়েটির কাছ থেকেঃ 'পালাবে কোথায়! ওই তো, পাপোষের পাশটিতে ঘাপটি মেরে বসে আছে।'

'তাইতো! পাপোষের আড়ালেই আত্মরক্ষা করছে বটে।'

'যাক্, এইবার ওকে ঘেরাও করতে পারব। ডাণ্ডা-টাণ্ডা কিছু দিন তো আমায় দেখি।' উৎস বলল, 'ঠাণ্ডা করে দিই ওকে।'

তাড়া খেলেই ইঁদুররা নিজেদের গর্তে গিয়ে সেঁধোয়, তার এতকালের বদ্ধমূল ধারণা যেন টলিয়ে দিল ইঁদুরটা। পাপোষের সঙ্গে আপোষ করে উৎসর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো সে।

'না না না!' আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটিঃ 'মারবেন না বেচারীকে। ঐ ঝাড়নটা দিয়ে তাকে ধরে বাইরে নিয়ে গিয়ে দূরে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসুন বরং। পাকড়াতে পারবেন না ঝাড়ন দিয়ে?'

ঝাডনটার বর্ণবৈচিত্র্যে ইঁদুরটা সম্মোহিত হয়েছিল মনে হয়। সহজেই উৎসর হাতে ধরা দিল সে।

ইঁদুরটা ধরা পড়বার পর চেয়ার থেকে নামল পার্বতী। 'আপনি আমায় বাঁচালেন উৎসবাবু!' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল সে।

কুণ্ডলী পাকানো ইঁদুরের পুঁটুলিটা হাতে নিয়ে রাস্তা পেরিয়ে ওধারের পার্কে ছেড়ে দিয়ে এল উৎস।

ঝাড়নটা নিয়ে ফিরে আসতে দেখল, পার্বতী দেবী তাদের দু'জনের জন্যে দু'পেয়ালা কফি বানিয়ে বিস্কুটের বাক্স বার করেছে।

কিন্তু ঐ কফির পেয়ালা পর্যন্তই। তার বেশি আর এগুতে পারেনি উৎস।

কতোবার ভেবেছে যে সে শুধোয়—বিকেল বেলায় ঘরে বসে বসে করেন কী! চলুন না কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি গিয়ে। কিংবা, সামনের পার্কটায় আসুন একটু হাওয়া খাওয়া যাক। সিনেমায় যাওয়ার কথাও তার মনে হয়েছে, কিন্তু কোথায় যেন আটকায়। মেয়েটার মধ্যেই, না, তার নিজের মনেই কোথায় যেন বাধা রয়েছে। কেমন বাধ বাধ ঠেকে।

তার মনে হতে থাকে যে নিজের সুবর্ণ সুযোগটা সে ফস্কে যেতে দিয়েছে। ভাব জমাবার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ সে হারিয়েছে কখন যে!

অনেকবার তার মনে হয়েছে সেই ইঁদুরটা ফিরে এসে যদি তার ভ্রষ্ট লগ্ন আবার তাকে ফিরিয়ে দেয়? দ্বিতীয়বার কফিপানের অবকাশে কফির পেয়ালায় তুফান তুলবার সুযোগ কি আর হবে তার? ভাবতে ভাবতে কত রাত সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

অবশেষে এক সুপ্রভাতে ঘুম থেকে উঠতেই তার মাথায় একটা আইডিয়া খেলল।

সটান সে চলে গেল নিউ মার্কেটে। পোষ্য পশুপক্ষীর এলাকাটায়।

'একটা ইঁদুর চাই আমার।' পক্বশ্মশ্রু এক বুড়ো দোকানীর কাছে গিয়ে বলল।

'একটা ইঁদুর? নিশ্চয়। এই যে, দেখুন না, কী চমৎকার ইঁদুর সব। দেখছেন?'

খাঁচা ভর্তি সুশ্রী সাদা রোমশ যত ইঁদুর—দেখলে চোখ জুড়োয়, সত্যি! মনে হয় যেন খরগোসের বাচ্চারা।

'না, না। এ ইঁদুর নয়। এরা তো বিলিতি ইঁদুর। আমি চাচ্ছি আমাদের দেশী বাঙালী ইঁদুর। আমাদের ঘরে বাইরে যাদের দেখতে পাই—সেই রকম ঘরোয়া জিনিস।'

'আজ্ঞে, সে আমাদের কাছে আপনি পাবেন না। রাখিনে আমরা।' অবজ্ঞায় নাক কুঁচকে বলল দোকানদার: 'কেউ আবার চায় নাকি সে ইঁদুর! বাড়িতে দেখতে পেলে মেরে তাড়ায়।'

'তাই একটা আমার চাই যে।' জানাল উৎস: 'ভয়ঙ্কর দরকার ছিল। যা দাম লাগে দেব।'

'দিয়ে যান দাম। চেষ্টা করে দেখব। আশপাশের বাড়ির বাচ্চা চাকরদের বলে-কয়ে যদি যোগাড় করতে পারি একটা।'

উৎস তক্ষুনি তার হাতে দশ টাকার একখানা নোট ধরে দিল।

'আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যান বাবু!' বলল দোকানীটা: 'আপনার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব ইঁদুর।'

দিন কয়েক বাদেই পৌঁছল এসে ইঁদুরটা।

তারপর পার্বতীর কক্ষে ইঁদুরটার অনুপ্রবেশের অপেক্ষায় মুহূর্ত গুনতে লাগল উৎস—নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে কান খাড়া করে।

যখন তার বাথরুমে যাবার আওয়াজ এল তার কানে, স্নানের ঘরে কল খোলার শব্দ পেল সে—আস্তে আস্তে উপরে গিয়ে, ঘরের দরজা একটুখানি ফাঁক করে, ইঁদুরটাকে ঢুকিয়ে দিয়েই, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চুপ চাপ ফিরে চলে এল উৎস নীচে। নিজের ঘরে বসে পার্বতীর চিৎকারের প্রতীক্ষায় রইল নিঃশব্দে।

একটু পরেই, সেই আগের দিনটির মতই, ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ তীরবেগে নেমে এল তার দরজায়। দুয়ার ঠেলে তার ঘরে সদ্যস্নাতা পার্বতীর আবির্ভাব হল।

'উৎস বাবু! আসুন আসুন! চট করে একবারটি আসুন ওপরে।' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে—'আমার ঘরে আবার একটা ইঁদুর! সেই ইঁদুরটাই ফিরে এল কিনা কে জানে!'

'তাই নাকি? কী সর্বনাশ!' উৎসমুখ উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎসর পা-ও চঞ্চল হয়ে উঠল।

উঠল গিয়ে একেবারে পার্বতীর ঘরে।

'কোথায় সে হতভাগা? দেখিয়ে দিন তো।'

'ঐ যে—ঐ টিপয়ের তলায়।'

দেখেই চিনতে পাবল উৎস। তারই সদ্য আমদানি-কৃত নেংটি!

পূর্ব পরিচয়ের জন্যই কিনা কে জানে, ইঁদুরটা উৎসকে দেখে ভয়ে যেন শিঁটিয়ে গেল। সহজেই ধরা দিল তার হাতে।

বিজয়গর্বে তাকে করকবলিত করে যেই না উৎস উঠে দাঁড়িয়েছে, অমনি অপর কোণ থেকে আরেকটা ধেড়ে ইঁদুর তেড়ে এল টিপয়ের দিকটায়।

'ও বাবা! এ আবার কে! আরেকটা ইঁদুর দেখছি যে!' লাফিয়ে উঠেছে উৎস। পার্বতীও তৎক্ষণাৎ নিজের বিছানায় গিয়ে উঠেছে—'কী হবে উৎস বাবু! এটা যে আরো সর্বনেশে চেহারার।'

'একটা কেঁদো ইঁদুর!' উৎস বলল, 'গেরস্থ বাড়ি সচরাচর তো দেখা যায় না এমনটা। সরকারী গুদামের চালমারা ইঁদুর মনে হচ্ছে—খেয়ে দেয়ে বেশ নাদুস নুদুস হয়েছে।'

কেঁদো ইঁদুরটাকে ধরতে রীতিমত বেগ পেতে হলো উৎসকে। তারপর কেঁদো আর কাঁদো কাঁদো দুটোকেই পাকড়ে ঝাড়ন জড়িয়ে ছেড়ে দিয়ে এলো সেই পার্কটায়।

ঝাড়নটা ফিরিয়ে দিতে এসে আবার দেখল টিপয়ের ওপরে কফির পেয়ালা সাজানো—সেই আগের বারের মতই।

এবারকার সুযোগ সে আর হাতছাড়া করল না।

কফি পানের ফাঁকে ফাঁকে পাড়ল কথাটা—'আপনার ঘরে যেমন ইঁদুরের উপদ্রব, তাতে দেখছি, ইঁদুর তাড়াবার জন্যই একটা লোক না রাখতে হয় আপনাকে।'

'ভাবছি তাই।' কিছু না ভেবেই জবাব দিয়েছে পার্বতী!

'যদি রাখেনই কোনো লোক,' বলল উৎস, 'তাহলে আমার আবেদনটা করে রাখছি সবার আগে এই ফাঁকে। আমাকেই রাখতে পারেন।'

পার্বতী এর কোন উত্তর দিল না, তারা সারামুখ সিঁদুরের মত টকটকে হয়ে নিজের নিরুক্তিটি জানাল।

তারপরে ইঁদুর-লগ্ন থেকে গোধূলির সিঁদুর-লগ্নে পৌঁছতে আব বিশেষ দেরি হলো না উৎসর।

সেদিন উৎস এসে আমন্ত্রণ জানাল আমায়—'আমাদের বিয়ের উৎসবে আসবেন দাদা! রীতিমতন প্রেম করে বিয়ে, বুঝলেন?' বলে সে পুনশ্চ যোগ করে—'তা প্রেম করেই বলুন বা ইঁদুর ধরে বিয়ে করাই বলুন!'

'প্রেম করা তো ইঁদুর ধরার মতই দুঃসাধ্য ব্যাপার ভাই!' আমি বলিঃ 'শুনি তো ব্যাপারটা।'

তারপর থেকে যা উৎসারিত হলো সেই কাহিনীটাই উদ্ধৃত করেছি এখানে।

'কিন্তু আসল কথাটাই আপনাকে বলা হয়নি দাদা!' তার উৎসার শেষ হবার পর সারাংশ সে নিবেদন করেঃ 'আজ সকালে যখন আপনাকে নেমন্তন্ন করতে বেরুচ্চি, দেখি যে নিউ মার্কেটের সেই লোকটা ঘুর ঘুর করছে আমাদের বাড়ির সামনে—যার কাছ থেকে ইঁদুরটা আমি কিনেছিলাম।'

'ইঁদুর ধরবার ফিকিরেই ঘুরছিল বুঝি?'

'তা নয়। কী দরকারে এসেছে তাকে শুধাতে, সে একটা চিরকুট আমার হাতে দিয়ে বলল, এই ঠিকানার একটি মেয়ে কয়েকটা ইঁদুর চেয়েছিলেন...।'

'সে কী!' কাগজখানা পড়ে দেখি—পার্বতীর নাম ঠিকানা তাতে লেখা।

আমি আরো অবাক হলাম যখন সে বললে, মেয়েটি মাসখানেক আগে একটা ইঁদুর কিনেছিল তার কাছে, আর দিন কয়েক আগেই নিয়েছে আরেকটা। আরো বলেছে যে হয়তো আবারও কয়েকটার দরকার হতে পারে, তাই আমি তার খোঁজ নিতে এসেছিলাম বাবু!

'না, না, ইঁদুরের আর দরকার হবে না', আমি বলে দিলাম তাকে। বলল উৎস: 'ইঁদুর ধরা পড়েছে—দরকার নেই আর ইঁদুরের। ইঁদুর দিয়ে ইঁদুর ধরেছে মেয়েটা।' কথাটায়, মনে হল, উৎস নিজের প্রতিই যেন কটাক্ষপাত করল—' পার্বতীই মূষিক প্রসব করল, না, মূষিকটাই পার্বতী প্রসব করল!—এখনও আমি ঠিক ঠাওর করতে পারছি না, দাদা।'

ব্রজবিহারীর ধনুর্ভঙ্গ

ব্রজবিহারীর ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল না মাধবীকে বিয়ে করার, ছিল সেটা ধনুর; তাই চিঠিটা পেয়ে একটু অবাক হয়েছিলাম বইকি।

বাড়ি-ঘর ছেড়ে এতকাল নিরুদ্দেশে থাকার পর ফিরে এসে অবশেষে মাধবীর মত একটা আধবুড়িকে তার বিয়ে করাটা আমার কাছে একটু অভূতপূর্ব বলেই মনে হয়।

ষাট বছর পেরিয়ে বিয়েব ছাঁদনাতলায় গিয়ে লটকানো কম বিস্ময়কর নয় তো।

অবাক তো হয়েছিলামই, আরো অবাক করে দিল সে নিজে এসে তার পরে।

চিঠির ল্যাজ ধরে ব্রজ হাজির হলো শেষে।

'পাছে তুমি ভুল বোঝো ভাই, তাই চলে আসতে হলো আমায় এই সাত তাড়াতাড়ি...' এসে বলল সে।

'না, ভুল বোঝাবুঝির কী আছে ভাই! এরকম তো হয়েই থাকে আকচার।' আমি বলতে চাই, 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথায়...'

'প্রেম ফ্রেম নয় ভাই,' সে বাধা দেয় আমার কথায়—'চিঠিটায় আমি ব্রজ বলে আমার নামসই করেছি তো, সেই জন্যেই আসতে হলো আমায়। শতং বদ মা লিখ, শাস্ত্রে বলেছে। সে কথাটা ভুলে গেছলাম বেমালুম। তাই ওই স্বাক্ষরটা আমার ঠিক হয়নি। কিসের থেকে কী দাঁড়ায়, ফৌজদারি আদালত অবধিই বা গড়ায় কি না কে জানে। এই বয়সে কি জেলে যেতে হবে শেষটায়, তাই...'

'বিয়ে করাও তো একরকমের জেলে যাওয়া ভাই,' আমি শুধাই 'তাই নয় কি?'

'জেল যে, তা এর মধ্যেই টের পেয়েছি বিলক্ষণ। কিন্তু তাহলেও আলিপুরের সশ্রমের চেয়ে তো ঢের ভাল। আরামপ্রদ কারাবাসই বলা যায় একরকম।'

'তা বলতে পারো বটে। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, মাধবীকে বিয়ে করার কথা ছিল ধনুর। তোমার তো নয়; কিন্তু তুমি যে...'

'ধনুই তো বিয়ে করেছে। এই দ্যাখো না।' বলে সে একটা ছাপানো নিমন্ত্রণ-পত্র আমার হাতে দিল, তাতে শ্রীধনুর্ধর রায়ের সঙ্গে কুমারী মাধবী বসুর বিয়ের কথাই ছাপার অক্ষরে লেখা রয়েছে বটে।

'তাহলে ধনুই বিয়ে করছে, তুমি নও। তাই বল তাহলে।' আমি হাঁপ ছাড়ি।

'ধনু ওরফে আমি। আমিই শ্রীব্রজবিহারী বর্মণ।'

'হেঁয়ালি রাখো। খোলসা করে বল সব।'

'হেঁয়ালি নয়, সত্যি কথাই। তুমি বন্ধুজন, তোমার কাছে প্রকাশ করতে বাধা নেই। জানি, তুমি আবার তা পুনঃপ্রকাশ করে আমায় জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে না। তাই খোলসা করে সব তোমাকে বলার জন্যই এতখানি আমার ছুটে আসা।'

'তুমি ব্রজ না ধনু, কে তাহলে, ঠিক করে বল দেখি।' সঠিক ঠাওর না পেয়ে আমি বলি—'আমার নিজেরই কেমন খটকা লাগছে। তোমাদের দুজনের চেহারায় এমন আশ্চর্য মিল ছিল যে কে কোন্টা আমরা ঠাউরে উঠতে পারতাম না। তুমি ধনু, না, ব্রজ?'

'আমি ব্রজই।' বলে সে করুণ সুর ধরেঃ 'কিন্তু, আর তো ব্রজে যাব না ভাই, যেতে মন নাহি চায়। মা পেয়েছি বাবা পেয়েছি... ব্রজের খেলা ভুলে গেছি...না, মা আমার মারা গেছে সম্প্রতি। এখন থেকে আর আমি ব্রজ নই। অতঃপর, আমি শ্রীধনুর্ধর—এখন থেকে বরাবর।'

'বুঝতে পারছি না কী ব্যাপার।'

সবটাই আমার কাছে যেন ধাঁধার মতই লাগে। সে বলতে থাকেঃ

'ভাওয়ালের মেজকুমারের সেই কেসটা, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা গো! তোমার মনে আছে নিশ্চয়? আমার ব্যাপারটাও প্রায় সেই রকমই বলতে গেলে। তবে ভাওয়ালের বেলায় সন্ন্যাসীর নিজের সাধু হবার ইচ্ছা ছিল। আর এক্ষেত্রে আমাব অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ব্যাপারটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। এই যা তফাত।

'আইন-বিরুদ্ধ কোন কাজ করার বাসনা কোনদিনই আমার ছিল না, এক্ষেত্রে তো নয়ই, কিন্তু পাকচক্রে কেমন করে কী যে ঘটে যায়! ভবিতব্যের লিখন যাকে বলে আব কি!...

'আমাদের সোনারপুর থেকে সেই কলেজে পডবার সময় আমি আর ধনু নিরুদ্দেশ হযে গেলাম না? বছর চল্লিশেক হলো তো? তারপর থেকে আমাদের আর কোন খবর পাওনি তোমরা—রাখওনি তেমন। ভাগ্যান্বেষণে সারা ভারত তারপর ঘুরেছি আমরা দুজনে, তারপরে কোথাও কিছু সুবিধা করতে না পেরে কপাল ঠুকে বর্মা মুলুকে পাডি দিলাম আমরা। বর্মায় গেলেই কপাল ফেরে, বলত লোকে তখন। অন্ততঃ শরৎবাবুব উপন্যাস পড়ে সেই রকমের একটা ধারণা জন্মেছিল আমাদের।

'মাঝপথে সমুদ্রে ঝড়ের মুখে পড়ে আমাদের যাত্রী জাহাজটা ডুবে যায়—সেই থেকে ধনুর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি। আরেকটা জাহাজ এসে নিমজ্জমান আমাদের কতকগুলোকে তুলে নেয়, তাদের ভেতরে ধনু ছিল না কিন্তু। মনে হয় সে তলিয়ে গেছল সেই ঝড়ে।

'যাক, আমি তো সেই জাহাজে বর্মায় গিয়ে পৌঁছলাম। এটাসেটা করতে করতে টীকের ব্যবসায় লেগে গেলাম শেষটায়। টীক এক রকমের দামী কাঠ, জান বোধহয়? টীকের কারবারে অনেক টাকা কামিয়ে ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর টিকে থাকা গেল না...।'

'কেন? টীকের জঙ্গল সব সাফ হয়ে গেল বুঝি?'

'না না। আমরাই সাফ হয়ে গেলুম। বর্মার নয়া বিপ্লবী সরকার এসে বিদেশীর যত ব্যবসাপত্তর বাজেয়াপ্ত করে নিল, নিঃসম্বল উদ্বাস্তু হয়েই ফিরে আসতে হলো স্বদেশে।

'কোথায় যাই? ভাবলাম, বাড়িতেই ফিরে যাই, কিন্তু বাড়িঘর কি আছে আর আমার? মা ছোটবেলায় মৃত, তারপর মামার বাড়িতেই আমি মানুষ—কিন্তু সেখানে যেতে মন চাইল না। ভেবেচিন্তে নিজের গ্রাম সোনারপুরেই ফিরলাম।

'কিন্তু সোনারপুর আর সেই সোনার গ্রামটি নেই, শহরতলী হয়ে তার ভোল পাল্টে গেছে এখন। কোথায় যে আমাদের ভিটে ছিল তার কোন হদিশই মিলল না। আর মিললেই বা কী হতো? তিন কূলে তো কেউ ছিল না আমার। শুনলাম মামারাও সেখান থেকে উঠে গেছেন কোথায়।

'ভাবলাম, আপাতত আমার ইস্কুলের বন্ধু পার্থর বাড়িতেই উঠি গিয়ে নাহয়। তারপর দিনকয়েক সেখানে কাটিয়ে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়া যাবে আবার।

'সোনারপুরে পার্থদের বর্ধিষ্ণু পরিবার। তারা নিশ্চয় উঠে যায়নি অন্য কোথাও।

'গিয়ে দেখলাম, পার্থ তার বাড়ির রোয়াকেই বসে। কিন্তু সে আর সেই আগের পার্থটি নেই—ছিমছাম সুশ্রী চেহারার সেই পার্থ। ভুঁড়ি বাগিয়েছে এখন, বুড়িয়েও গেছে বেশ।'

'পার্থ, চিনতে পারছিস আমায়?'

'শুধোতেই না তার মুখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তারপর তার ভুঁড়ির পরিধিতে আন্দোলন দেখলাম।

—'ওমা ধনু যে! অ্যাদ্দিন পরে। কী আশ্চর্য!'

'তারপরই সে হাঁক পাড়ল বাড়ির নেপথ্যে—'মা! মা! নেমে এসো একবারটি। ধনু ফিরে এসেছে আবার—পরলোকের থেকে।'

'আর, এই ভাবেই নতুন নাটকের যবনিকা উঠল আমার জীবনে। আমি বলতে যাচ্ছিলাম, না না, আমি ধনু নই, ব্রজ। আমরা দুজনে যে দেখতে ঠিক একরকম ছিলাম তা কি তোমার মনে নেই? এমন কি মাস্টারদেরও ভুল হতো আমাদের দুজনকে নিয়ে। ধনুর অপরাধে আমাকেই বেত খেতে হয়েছিল কতবার। মনে পড়ছে না তোমার?... বলতে যাচ্ছি, কিন্তু বলতে দিলে তো! ফাঁকই পেলাম না কথাটা বলবার।

'ইতিমধ্যে পার্থর মা নেমে এসেছিলেন—আমাকে দেখে তাঁর আনন্দ যেন উথলে উঠল। পাড়ার আরও লোক সব জড়ো হল এসে, যেন হারানো মানিক ফিরে পেয়েছে সবাই—কারো আর আনন্দের অবধি রইল না। সেই উল্লাসের তোড়ে আমার কথাটা কোথায় যেন তলিয়ে গেল। পাড়ার ফুরসতই হলো না আর।

'এরই ভেতরে পার্থ আমায় আড়ালে ডেকে বলেছে—'জান, তোমার মা ইতিমধ্যে লাখখানেক টাকা পেয়েছেন লটারিতে? তবে বুড়ি আর বেশিদিন টিকবে না ভাই! শরীর এমন ভেঙে পড়েছে তাঁর। চোখেও ভাল দেখতে পান না আর।'

'খবরটা পেতেই আমি চেপে গেলাম একদম। আমার মত বদলে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ব্রজকে সলিল-সমাধিতে পাঠিয়ে ধনু বনে গেলাম দেখতে না দেখতে। আর, সবাই যখন আমাকে ধনু বলেই ধরে নিয়েছে, চিনতে ভুল হচ্ছে না কারো—তখন বৃথা আর ব্রজবুলি আউড়ে আমার লাভ কী?

'পার্থ আমাকে খবর দিল আরো। মাধবীর খবরটাও দিল আমায়। মাধবী আমাদের সঙ্গেই পড়ত স্কটিশ চার্চ কলেজে, তাকে বেশ মনে ছিল আমার—যদিও আমার চাইতে ধনুর সঙ্গেই তার ভাব ছিল বেশি।'

'পার্থ বলল—'মাধবী এখনো তোমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। তাকে বিয়ে করবে বলে তুমি কথা দিয়েছিলে না? সেই কথা বিশ্বাস করে এখনো সে আর কাউকে বিয়ে করেনি।'

'তাই নাকি? কিন্তু এই বয়সে—সেটা কেমন হবে? ...মানে, তাকে এই বিয়ে করাটা?' আমি বলি পার্থকে।

'সে তুমি যা ভাল বোঝ। আমার মতে, তোমার ওকে বিয়ে করাই উচিত। তোমার মাকে সে-ই এতদিন ধরে দেখাশুনা করছে—সেবা-যত্ন করছে ঠিক আপন শাশুড়ির মতই। তারও তো তিনকুলে কেউ নেই এখন আর। সে তোমার মা-র কাছে থাকে। ঠিক তার মেয়ের মতই।'

'ধনুর মাকে গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে বসলেন—'জানতুম তুই ফিরে আসবি একদিন। ঠাকুর-দেবতার দোর ধরে তোকে পেয়েছিলাম, জাহাজডুবি হলেও তুই বেঁচে যাবি আমি জানতাম। নিশ্চয় আর কোন জাহাজ তুলে নেবে তোকে।...'

'তাই হয়েছিল মা। আরেকটা জাহাজ কাছ দিয়েই যাচ্ছিল তখন—তুলে নিল আমাদের। কিন্তু ব্রজ-বেচারীর আর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না তারপর।'

'আমার স্থির বিশ্বাস ছিল আমার মরবার আগে তোকে আমি দেখতে পাব। মাকে তোর মনে পড়বে একদিন। ফিরে আসবি তুই আমার কোলে আবার।'

'মাধবীকে নিয়ে একটু বেগ পেতে হবে ভেবেছিলাম কিন্তু সে কোন উচ্চবাচ্য করল না; আর বিয়ে করার কথাটা পাড়লই না একেবারে। বেঁচে গেলাম আমি, বলতে কি!

'শৈশবের থেকে মা-হারা, মাতৃস্নেহ কাকে বলে জানিনে, তার স্বাদ ষোল আনাই পেলাম ধনুর মা-র কাছে। নিজের মায়ের সেবা করার সুযোগ পাইনি, দুঃখ ছিল মনে, তারও কোন ত্রুটি রাখলাম না আমি। মাতৃসেবার চূডান্ত করে ছাড়লাম।

'বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো—স্বপ্নের মতই প্রায়। ইতিমধ্যে...।

'ইতিমধ্যে আমাদের তো ঘুণাক্ষরেও জানাওনি এসব কিছু।' বাধা দিয়ে আমি শুধাই—'কারণ কী? নতুন মা পেয়ে কি পুরনো বন্ধুদের ভুলে গেলে সব?'

'না। তা নয়। তবে আমার মা, মানে ধনুর মা মারা গেলেন কিনা হঠাৎ। তাঁর বিষয়-সম্পত্তির সাকসেসন সার্টিফিকেট, ব্যাঙ্কের হিসেব-পত্তর এই সব নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল এতদিন। তার পরে সে-সব ঝঞ্ঝাট চুকে বুকে যাবার পর, শোন বলি কী হলো...।'

বলে ব্রজ চুপ করে রইল। নিজের মনের সলিলসমাধিতে তলিয়ে গেল যেন।

'কী হলো?' আমি ওকে উসকে দিই। ব্রজের লীলাখেলার উপসংহারটা জানবার জন্য আমার আগ্রহ।

'ভাবলাম, আর কেন? সবকিছু এবার বেচে-টেচে দিয়ে টাকা-কড়ি নিয়ে এখানকার পাত্তাড়ি গুটোই। অন্য কোথাও গিয়ে নতুন করে ব্যবসাপত্তর ফাঁদি আবার। তাই ভেবে তার আগে মাধবীর একটা ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমার মনে হলো। ও বেচারীর তো কেউ নেই কোথাও। আর এতদিন ধরে ধনুর মাকে দেখেছে-শুনেছে...সেই ভেবে না, একটা মোটা টাকা দিয়ে ওর কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম।

'কিন্তু মাধবী আমায় এককথায় চমকে দিল। বলল, 'ব্রজবাবু, আপনি কি ভেবেছেন যে আপনাকে আমি চিনতে পারিনি? কিন্তু ধনুর মা মনে কষ্ট পাবে বলে, সেই ভেবে এতদিন মুখ খুলিনি আমার। ভেবেছি যে মা যখন তাঁর হারানো ছেলে ফিরে পেয়ে সুখে আছেন, তাঁর জীবনের শেষ ক'টা দিন তিনি সুখেই থাকুন। কেন আবার কষ্ট পান। তাই আমি কাউকে কিছু বলিনি। এমন কি, আপনাকেও আমি সে-কথা ঘুণাক্ষরে টের পেতে দিইনি। পাছে আপনি ধনুর মাকে ফেলে তাঁর প্রাণে দাগা দিয়ে আবার ফের কেটে পড়েন। কিন্তু এখন তো আমার মুখ খোলার কোন বাধা নেই। থানায় আমি খবর দিতে চললাম।'

'শুনেই না আমার হয়ে গেছে। আবার যেন আমি বঙ্গোপসাগরেই তলিয়ে যাচ্ছি...আমার সেই ভরাডুবির মধ্যে শুনতে পাই সে বলছে...'ব্রজ, তোমার হয়তো মনে থাকতে পারে, কলেজের ক্লাসে আমি ঠিক তোমার পেছনের বেঞ্চটিতে বসতুম। তোমার মাথার পেছন দিকটা দেখে দেখে মুখস্থ হয়ে গেছল আমার। তাই, সামনে দেখে তোমাকে ঠিক চেনা না-গেলেও পেছন থেকে...যাক্, আর সবাইকে ফাঁকি দিতে পারলেও আমাকে তুমি ঠকাতে পারনি।'

'সলিল-সমাধি থেকে ভেসে উঠে আমি বললাম—'ঠকাতে চাইও না আমি। ধনু তোমাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিল! ধনুর সেই কথাটা আমি রাখব। যখন ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ধনুর ভূমিকা নিতে হয়েছে আমায়, তার কথাও আমায় রাখতে হবে তখন।'

'শুনে সে চুপ করে রইল। তারপর আমি আরও বললাম, 'দ্যাখ মাধবী, আমাদের দুজনেরই যৌবন পেরিয়ে গেছে। এই শেষ বয়সে দুজনকেই দুজনের দরকার আমাদের। আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে আর তোমাকে ছেড়েই কি আমি থাকতে পারব? পরস্পর মিলে-মিশে আমরা ঘর বাঁধি এস।'

'আর তারপরই তোমার এই ছাঁদনাতলা?' আমি বলি, 'এখন তাহলে নতুন ঘরানায় তোমার নয়া সঙ্গীত? নতুন ঘরে নতুন সঙ্গী এখন?'

'মেয়েছেলের চোখকে কখনো ফাঁকি দেয়া যায় না ভাই! অবশ্যি, তার জন্য কোন আপসোস নেই আমার—তার প্রমাণ দেখচ তো এই—'

বলে ছাপানো কার্ডখানা আমার হাতে সে তুলে দিল।

'এই কার্ডখানা তোমায় পাঠালেই কোন গলদ হতো না আর। তুমিও আমায় ধরতে াারতে না তাহলে—আর কেউ যেমন পারেনি। কিন্তু ভাবলাম, তুমি আমার পুরনো ান্ধু, ছাপানো চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠানো উচিত হবে না তোমায়। তাই হাতে লিখে বিয়ের কথা জানাতে গেছি, আর তার ফলেই আগের অভ্যাসবশে নিজের সাবেক নামটাই াই করে বসেছি শেষটায়। তাই এই গলদটা হলো।'

'কিছু গলতি হয়নি। তোমার কোন ভাবনা নেই, কারু কাছে এ-কথা আমি ফাঁস করব না, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। তবে কোনদিন হয়তো তোমার কাহিনীটি, কাউকে গল্প না-করলেও, গল্পচ্ছলে লিখে বসতে পারি। তাহলেও কোন ভয় নেই তোমার। গল্প-কথায় কেউ কখনো বিশ্বাস করে না। আর, আমার গল্প তো ভাই, হেসেই উড়িয়ে দেয় সবাই।' আমি তাকে বলি।—'তুমি ভয় খেয়ো না ব্রজ!'

'না না না। আমি আর ব্রজ নই। ব্রজের লীলাখেলা আমার ফুরিয়ে গেছে। এখন আমি ধনু...ধনু...ধনু...।'

বারংবার ওর ধনুষ্টঙ্কার শুনতে হয়।

গৃহিণী গৃহ মুছ্যতে

দাম্পত্যকলহ যে সব সময় বহু আড়ম্বর করেই শুরু হয় তা নয়, সামান্য কথায়ও হতে পাবে।

তবে আরম্ভ-র মধ্যে বৌ না থাকলেও, তার মাঝখানে বউ থাকেই!

পূজার বোনাসেব উপবি পাওনার কী গতি করা যায় তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল দুজনাব—টাকাটা দিয়ে কী করা হবে তারই বিলি বন্দেজ।

শিখরিণী বলছিল—'টাকাটা যা তা করে উড়িয়ে দেয়া চলবে না...।'

শেখর বলল—'তা তো নয়ই। আজে বাজে খরচ করা হবে না কিছুতেই যে, তা ঠিক।'

'টাকা তো আসতে না আসতেই ফুট!' বলছিল বৌ—'কী করে কোথা দিয়ে যে খরচ হয়ে যায় টেরই পাওয়া যায় না। কর্পূরের মতই উপে যায় যেন।'

'যা বলেছ।' বৌয়ের কথায় ওর সায়।

'এবার আর তা নয়। হিসেব মতন কেনা কাটা করতে হবে সব। অনেক কিছু করা যায় এই টাকায়। কী কী কিনতে হবে তার একটা লিস্টি করে ফেলা যাক, কী বলো?'

'তোমার খান কয়েক শাড়ি তো প্রথমেই'—শেখরই পাড়তে যায়।

অনেক ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে ঘাটশিলায় এসে প্রায় কপর্দক-হীন অবস্থায় কপার মাইনের চাকরিটা পেয়েছে শেখর—তার বৌয়ের পয়েই বলতে হয়। কোম্পানির থেকে কোয়ার্টারও পেয়েছে তারপর। ঘর পাবার পর ঘরণীকেও নিয়ে এসেছে তার পরে। আর তার পরেই এই মোটা টাকার পূজা বোনাস—তার বৌয়ের পয়েই নিশ্চয়। অতএব বৌকে সুখী করার কথাই সর্ব প্রথম।

আর বৌ খুশি হয় শাড়ি পেলে—তা কে জানে? শুক আর সারি যেমন জোড়বাঁধা, তেমনি শাড়ির সঙ্গে সুখ ওতপ্রোত। জড়োয়া গয়না দেবার সামর্থ্য নেই ওর, অতএব শাড়ি দিয়েই বৌকে সুখের সঙ্গে জড়াও।

'হ্যাঁ, শাড়ি তো আছেই, কিন্তু তার আগে চাই আসবাব পত্তর—' শিখরিণীর বক্তব্য—'কোনো ঘরে এক চিলতে সামগ্রী নেই। আসবাব পত্তর না থাকলে ঘরদোর যেন মানায় না। কোন্ ঘরে কী কী জিনিস দরকার তার একটা তালিকা করে ফেলা যাক। কোন্ ঘরের জন্য কী দরকার তার লিস্টি করা যাক, কেমন?'

কাগজ আর পেনসিল নিয়ে দু'জনে দু'খানা ফর্দ করতে বসে গেল।

শেখরের লেখা শুরু হবার আগেই শিখরিণীর ফর্দের অর্ধেক প্রায় খতম্।

শেখরের তালিকায় একটা আইটেম ততক্ষণে খাড়া হয়েছে কোনো রকমে, শিখরিণী বলল, 'আমি রুম্ বাই রুম্ লিস্‌টি করছি, বুঝেচ? রান্নাঘর থেকেই শুরু করেছি আগে।'

শেখর ওর কথায় আইডিয়াটা পেল। রান্নাঘরের পরেই খাবার ঘরের কথা! সে এক নম্বর আইটেম লিখল ঃ

(১) আরো মাছ, তারপর 'আরো চিনি...' দুনম্বরে ভেবে চিন্তে বসালো সে।

'কী তোমার লেখা হলো? শেষ হল লিস্‌টি?'

'প্রায় শেষ।' জানালো শেখর।

'আচ্ছা, আমার তালিকাটা পড়ছি আমি আগে। তারপর তোমারটা শোনা যাবে। তখন কারটা বেশি জরুরি ভেবে চিন্তে ঠিক করা যাবে তারপর।'

'আচ্ছা।'

'রান্নাঘরের জন্য, একনম্বর, একটা ইলেকট্রিক স্টোভ চাই সবার আগে। তারপর এক সেট স্টেইনলেস স্টিলের বাসনকোসন, প্রেসার কুকার...'

এমনি করে প্রায় সাতাশটা আইটেম আউড়ে গেল শিখরিণী।

'তারপর বসবার ঘরের জন্য সোফাসেট, টিপয়, চেয়ার এসব না হলে চলে নাকো। শোবার ঘরে দেরাজ আলমারি ড্রেসিং টেবল...'

শেখর মনে মনে খতিয়ে দেখল, সব কিনতে প্রায় সাত হাজার টাকার ধাক্কা। আর বোনাস তো মাত্র বারোশো টাকার। সে নিজের তালিকায়, আরো একটা, তিন নম্বরের আইটেম যোগ করল তখন।

'এবার তোমার তালিকাটা শুনি তো।' ওর বৌয়ের তলব।

তালিকার লেখাটা দেখালো সে—

(১) আরো বেশি মাছ (২) আরো বেশি চিনি (৩) আরো বেশি টাকা।

'তোমার খালি খাওয়া।' ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো ওর বৌ ঃ 'খাই খাই করেই গেলে! মাছ আর চিনি? খাওয়া ছাড়া দুনিয়ায় যেন কিছুই নেই আর।'

'কী আছে আর? তাছাড়া, যা আছে তা হলো গিয়ে শোয়া। খেয়ে দেয়ে পেট ঠাণ্ডা করে শুয়ে পড়া', বলল শেখর ঃ 'কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।'

'ভারী একলষেঁড়ে লোক বাবা তুমি!'

'একলষেঁড়ে হলুম ? আমি কি একলা খাব নাকি ? তোমাকে নিয়েই খাব তো। আর শোবার কথা যদি ধরো...।'

'হয়েছে, আর বলতে হবে না। বুঝতে পেরেছি। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।' বলল শিখরিণী।

খানিক চুপ থেকে প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেয়ে মুখর হয়ে ওঠে শেখর—'কিন্তু এত আসবাব-পত্তর এনেই বা কী হবে শুনি ? আসবাব আনলেই হয় না, তা সব সময় ঝকঝকে তকতকে রাখতে হয়। নইলে, দুদিনেই নোংরা হয়ে যাচ্ছেতাই হয়ে যায়। এত সোফাসেটি দেরাজ আলমারি রোজ রোজ ঝাড়-পোঁছ করবে কে ? শুনি একবার ?'

'ঝি থাকবে না ?' বলল বৌ : 'লোক রাখব একটা।'

'কপার মাইনের এই আড়াই শো টাকা মাইনের চাকরীতে আর ঝি চাকর পোষায় না।' জানাল শেখর, 'একটা ঝির বেতন আর খোরাকীতে এই বাজারে কত পড়ে তা জানো ? ষাট সত্তর টাকা চলে যায়—তার খেয়াল আছে ?'

শিখরিণী চুপ করে কথাটা ভাবে।

'তবে হ্যাঁ, তুমি নিজে যদি আসবাব পত্তরের যত্ন নাও, ঝাড়-পোঁছ করার ভার নাও তো হয়। অবশ্যি, শাস্ত্রেও সেই কথা বলে বটে। বলে যে, গৃহিণী গৃহ মুছ্যতে, ঘর দোর ঝাড়া মোছার কাজ যা তা বাড়ির গিন্নীরই করবার...'

'বিয়ে করে ভালো বিনে মাইনের দাসী পেয়েছো, না ?' ঝামটা দিয়ে উঠল ওর বৌ : 'তোমার ভাত রাঁধব, বাসন মাজব, আসবাব পত্তর ঝকঝকে তকতকে রাখব সারাদিন দাসীবৃত্তি করে, তবে তুমি দুটি আমায় খেতে দেবে—তাই না ?'

ব্যাস্। শাস্ত্রকথার থেকে অনেক অশাস্ত্রীয় কথা উঠল তারপর। কলহ গড়ালো অনেক দূর, শেষ পর্যন্ত ধুত্তোর বলে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল শেখর।

'যথারণ্যম্ তথা গৃহম্।' আরেকটা শাস্ত্রবাক্য আউড়ে বোধকরি রোদনের জন্যেই অরণ্যের উদ্দেশে বেরুলো সে।

অরণ্যও খুব বেশি দূরে ছিল না। ঘাটশিলার চার ধারেই অরণ্য। শাস্ত্রমতে যে বাণপ্রস্থ পঞ্চাশোর্ধে হবার, পঞ্চাশের অর্ধেই তাই বরণ করে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সেঁধুল সে।

সন্ধ্যে হয় হয়। জীবনসন্ধ্যা আসার ঢের আগেই সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল তার জীবনে।

বিকেলে অফিস থেকে ফিরে চায়ের সঙ্গে এক বাটি হালুয়া খেয়েছে—খিদে তাই পাচ্ছিল না তার। আজ রাতটা না খেয়েই সে কাটাতে পারবে। কাল থেকে বনের ফলমূল তার সম্বল—জীবনের আমূল পরিবর্তন তার কাল থেকেই।

বুদ্ধি করে হালুয়াটা খেয়ে এসেছে পেট ভরে—নিজের বুদ্ধির সে তারিফ দিল। চায়ে চিনি ছিল না, চিনির অভাবে হালুয়াটাও মিষ্টি হয়নি তেমন—সেই কারণেই তার ফর্দের দুনম্বরে আরো বেশি চিনির উল্লেখ ওই।

কিন্তু চিনির যোগাড় করা যেমন কঠিন নিজের বৌকে চিনতে পারাও তার চেয়ে কিছু কম কঠিন নয় বুঝি। বহু আড়ম্বরে শুরু না হলেও এবং বউ-র দিক থেকে আরম্ভ

নাহলেও এই প্রথম কলহেই জীবনে অরুচি ধরে গেছল তার। তাই শেখরের এই যৌ-বনপ্রস্থানকে নেহাত লঘুক্রিয়া বলা যায় না হয়ত বা।

শেখর শুনেছিল, ঘাটশিলার জঙ্গলের এই ভূমিকা আদৌ সামান্য নয়, ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর হয়ে মধ্যপ্রদেশের দণ্ডক পর্যন্ত চলে গেছে এই অরণ্য। এর আনাচে কানাচে বাঘ, ভাল্লুক, বন-বেড়াল, খ্যাঁকশেয়াল, সাপ, বিছে, বাদুড়, বাঁদর সব ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ ইতস্তত ঘোরা ফেরার পর গাছের ফাঁকে চাঁদের আলোয় ঘড়ি দেখে সে জানল যে রাত দশটা হয়েছে—এবার শোবার ব্যবস্থা করতে হয় কোথাও। বনে রাত কাটাতে হলে গাছই হচ্ছে সব চেয়ে নিরাপদ এই ভেবে সে একটা গাছে উঠে তার শাখাপ্রশাখার জোড়বিজোড়ের ফোকরে কায়দা করে শুয়ে পড়ল কোনরকমে এবং প্রকৃতির ক্রোড়ে আদিম মানবদের মতই সে ঘুমিয়ে পড়ল দেখতে না দেখতেই।

খানিক বাদে এক বিরাট অজগর সেই পথে যেতে দেখতে পেল শেখরকে। 'ইস্ লোকটা কী বেকায়দায় শুয়েছে দ্যাখো দেখি! ঘুমের ঘোরে উল্টে পড়ে হাড় গোড় ভাঙবে বোধ হয় বেচারা। না, ওকে রক্ষা করা আমার দরকার।' আপনমনে আওড়ালো অজগর।

এই না ভেবে সেই পরহিতচিকীর্ষু সাপটা গাছে উঠে সাত পাকে তাকে জাপটে ধরল। এইভাবে ওকে সাপটে রাখলে আর ও গাছের থেকে পড়বে না, ভাবল সাপটা, 'আর, এখন যদি ওকে রক্ষা করি, তাহলে কাল সকালে এর আমি আরো সেবা করতে পারব। প্রাতরাশ হিসেবে নেহাত মন্দ হবে না মনে হচ্ছে।'

সকালে গাছের ফোকর দিয়ে সূর্যের আলো চোখে পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল শেখরের। ঘুম ভাঙতেই শেখর দেখল বিরাট এক অজগর তাকে জড়িয়ে রয়েছে। এক সাতপাকের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে আরেক সাতপাকের ফাঁসে এসে পড়েছে সে। সাপটা তখনো গভীর নিদ্রায় অচেতন। শেখরের ডান হাতটা মুক্ত ছিল, আর দেরি না করে পকেট থেকে তার ছোরাটা বার করে সে সাপের পিঠে বসিয়ে দিল সবলে।

সাপটা তখন আরো জোরে জাপটাবার চেষ্টা করল তাকে—আর ছুরিটাও সেই চেষ্টায় আরো বেশি গেঁথে বসল তার গায়। একটু পরেই অজগর নিজের বাঁধন আল্‌গা করে গাছ থেকে খসে পড়ে ভূমিশয্যায় দেহরক্ষা করল তার।

আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে গাছের থেকে নামল শেখর। অজগরের অধঃপতনে শাখায় শাখায় পাখির দল কিচির মিচির লাগিয়ে দিয়েছে ততক্ষণে, বাঁদররা ডালে ডালে হুপ হাপ করে লাফাতে লেগেছে। আর সামনের গাছে এক কাকাতুয়া শেখরের কাণ্ড না দেখে চেঁচিয়ে উঠেছে—কেয়া বাত! কেয়া বাত!

কিন্তু তাদের এসব উৎসাহ-প্রকাশে নজর ছিল না শেখরের। কাল রাত্রে শোবার আগে যদিও তার সংকল্প ছিল যে সকালে উঠে আরো গভীরতর বনে সে প্রবেশ করবে, কিন্তু এখন, সকলের অভিনন্দন, এমনকি, কাকাতুয়াটার সাধুবাদ সত্ত্বেও সে-মতলব সে পরিহার করল। তার মনে হলো যে, বন যতই কেন উপাদেয় হোক না, বাড়ির মতন জায়গা আর নেই।

ইত্যাকার ভেবে বন ছেড়ে ঘরের পানেই পা বাড়ালো শেখর।

আবজানো দরজা ঠেলে ঢুকতেই তার নজরে পড়লো, ঘরের নেতৃত্ব নিয়েছে বৌ। সাবানজলে ভেজানো ন্যাতা দিয়ে মেজে ঘষে ঘরের মেজে তকতকে করতে লেগেছে। গৃহিণী গৃহ মুছ্যতে-ই বটে!

বৌ তাকে আসতে দেখে বলল, 'কী কাণ্ড তোমার! অমন দুম করে কিছু না বলে চলে গেলে, আমি সারা রাত বাড়া ভাত নিয়ে ঠায় বসে কাটালুম। তোমার যে নাইট ডিউটি ছিল সেটা আমায় বলে যাবে তো?'

শেখর কিছু না বলে গুম্ হয়ে থাকে।

'চায়ের জল চাপিয়েছি। নাও, মুখ হাত পা ধুয়ে বোসো এখন—টোস্ট, ডিমসেদ্ধ নিয়ে আসছি সব।'

ডেকচেয়ারটায় গা এলিয়ে মনে হলো শেখরের, গভীরতর বনে না সেধিয়ে ভালোই করেছে সে। কেননা, পরের বন যতই কেন গভীর হোক না, পরের বোনের মতন মিষ্টি আর হয় না—যদি সে পরী মতই হয় আবার। আর যদি সে ফের ঘরণী হয়ে আসে।

একটি শ্লীলতাহানির কাহিনী

বৌয়ের দিকে তাকিয়ে হতবাক হলেন শচীন সেন।

'কীব—ব্যাপার!'

শুধু এই কথাটিই কোন রকমে তাঁর অথই বিস্ময়ের অতল থেকে উথলে উঠল।

পরীর মত হলেও, উত্তর তিরিশে, প্রায় সাঁইত্রিশে এসে তার বৌকে এখন পরিণত বয়সী বলা যায় হয়তো। প্রার্থনীয় হলেও, এমন উত্তুঙ্গ দৃশ্য সেখানে প্রত্যাশিত নয়। এই পীনোন্নত পরিস্থিতিতে তিনি যেন একটু হতচকিতই হলেন।

নয়া ব্লাউজের মোড়কে পদ্মকোরকের ন্যায় প্রস্ফুটিত হলেও দৃশ্যটা তাঁর চোখে ঠিক আলপিনের মতই ফুটতে লাগল।

মনে পড়ে, একদা এক কিশোরীকে তিনি যদুবাবুর বাজারের মোড়ে এক জোড়া পদ্মকোরক কিনে উপহার দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন, তোমাকে তো ভগবান দুটো দিয়েছেন। আমিও আর দুটো পদ্মকোরক দিলাম তোমায়!

তখন যেন তিনি পাগল হয়েছিলেন। কিন্তু সে তো অনেকদিন আগের কথা।

সেই কথা স্মরণ করে এতদিন পরে আবার তাঁকে পাগল করার মানসেই তাঁর গৃহিণী যে তাঁর এই পঞ্চাশোর্ধে এসে পদ্মিনীরূপে দেখা দেবেন তা তিনি ধারণাই করতে পারেন না। বানপ্রস্থানের বয়সে এসে আরেক প্রস্থ যৌবনলাভ? —না, না, শচীন সেন হলেও এখনও তিনি such insane হননি।

বৌকে নিয়ে বেরুচ্ছিলেন একটু, কিন্তু বৌ শাড়ি ব্লাউজ বদলে সেজে গুজে এসে দাঁড়াতেই কোথায় যে তাঁদের যাবার ছিল সেকথা স্রেফ ভুলে গেছেন বেমালুম।

'সেদিন হগসাহেবের বাজার থেকে নতুন যে ব্লাউজটা কিনে আনলে—সেইটে বুঝি ?' এই কথাই তাঁর মুখ দিয়ে বেরুলো কেবল।

'হ্যাঁ, সেইটেই।' বৌয়ের চোখে কৌতুক : 'কী রকম লাগছে তোমার বল তো ?'

'না, খারাপ নয় তেমন। তবে চোখে যা লাগছে'—বলে একটু দম নিয়ে বললেন—'তা, এ রকমটা হলো কী করে ?'

'কী রকমটা ?'

কী রকম যে, তা তিনি ভাষায় প্রকাশ করতে অপারগ। শ্লীলতায় না কোথায় যেন বাধল ; এই স্তনাঢ্যতার সামনে ব্রীড়াবোধ করে বিড়ম্বিতের মতই তিনি বললেন—'এমনি ভাবে তোমায় নিয়ে রাস্তায় বার হব কী করে ভাবছি তাই।'

'কেন, কী হয়েছে ?'

'এই বুড়ো বয়সে এক অষ্টাদশীকে নিয়ে কী করে পথে বেরুব—লোকে কী ভাববে—তাই ভাবছি', বলে তিনি আর একটু প্রাঞ্জল হবার চেষ্টা করলেন—'সামান্য একটা ব্লাউজে এমন অসামান্য পরিবর্তন...তোমাকে একেবারে অর্ধেক বয়সে এনে ফেলেছে যে ! ভাবতেই পারা যায় না।'

'ব্লাউজে নয় মশাই, ব্রা-এর জন্যেই।' বৌও একটু প্রাঞ্জল হয়, 'এবার ব্লাউজের সঙ্গে নতুন-সেই কিশোরী-তনু-ব্রা-টা পরেছি কিনা —তাইতেই।'

'কি-শো-রী-ত-নু ? !'

'হ্যাঁ, এই বিজ্ঞাপনটা দ্যাখো না, তাহলেই টের পাবে।'

বৌ পাশের ঘর থেকে একটা সচিত্র পত্রিকা এনে তাঁর হাতে দিল—'এ জিনিসটা এখন এখানে নিউ মার্কেটেও পাওয়া যাচ্ছে আজকাল।'

দেখলেন বিজ্ঞাপন। বোম্বাইয়ের এক চিত্রবহুল ইংরেজি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত ' মেইডেন ফর্ম' -এর বিশদ বিবৃতি : অনুবাদে সংক্ষেপে দাঁড়ায়—'বিজ্ঞানের নবীনতম আবিষ্কার যা আপনাকে আবার নারীত্বের পূর্ণ মহিমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। পরমাশ্চর্য রবার স্পঞ্জে প্রস্তুত আমাদের এই আধুনিকতম ব্রা-ধারণে আপনার বক্ষসৌষ্ঠবের সুষমা সবাইকে বিমোহিত করবে—এর কৃত্রিমতা অত্যন্ত খুঁটিয়ে দেখেও কারোর ধরবার সাধ্য নেই, মূল্য মাত্র...ইত্যাদি।'

'কী ? আশ্চর্য নয় ?'

'আশ্চর্য বলে ! কিন্তু এই চমকদার বক্ষবেষ্টনী কার জন্যে পরা তা কি জানতে পারি ?' শচীনবাবু শুধান, 'পাড়ার ছেলেদের মাথা খারাপ করতে চাও নাকি এই বয়সে ?'

'তোমার জন্যেই পরেচি মশাই ! আবার কার জন্যে ? কেন, তোমার কি ভালো লাগছে না মোটেই ?'

'সত্যি কথা বলতে', একটু আমতা করে তিনি ভাঙলেন, 'তোমার এই উদ্ধত যৌবন-শ্রীর চাইতে আগেকার শান্তশ্রীই আমার পছন্দ—সেই আমার ভালো লাগত আরো। বুড়ো হয়ে গেছি তো, চোখে চালসে পড়েছে কত কাল, বেশি পাওয়ারের আলোয় এখন চোখ ধাঁধায়। চোখে বড্ড লাগে—এই আর কি।'

সেদিন বৌকে নিয়ে বেরিয়ে পদে পদেই তিনি যেন বিপন্ন বোধ করেন। সারা পথটাই তাঁর বিপথ বলে মনে হতে থাকে। একবার অপাঙ্গে বৌয়ের দিকে তাকান, আরেকবার অপর পথচারীদের দিকে। আর তাকিয়ে দ্যাখেন তারাই বা কেমন করে তাকাচ্ছে তাঁর বৌয়ের পানে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিলিয়ে নিজের বৌয়ের ভাবগতিক লক্ষ্য করেন। এমন কি উঠতি বয়সের ছেলেদের চাল-চলনও তাঁর নজর এড়ায় না। যাদের দিকে কখনো ভুলেও তিনি তাকাতেন না আজ তারাও তাঁর লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে।

' লোকে মেয়েদের দ্যাখে কী? কী দ্যাখে?' কানের গোড়ায় এসে ফিসফিস করে বৌ।

'প্রথমত, তার মুখটাই দ্যাখে অবশ্যি,' বলেন উনি: 'অন্ততঃ আমি তো তাই লক্ষ্য করি।'

'তারপর, তৃতীয়ত তার হাত দুখানি দ্যাখে সে..'

'তারপরে?'

'তারপর তার পায়ের দিকে নজর দেয় মুখপদ্ম থেকে পদপল্লবে...'

'কিন্তু দ্বিতীয়ত কী দ্যাখে তাতো তুমি বললে না', মনে করিয়ে দেয় ওঁর বৌ।

'সে আর আমি কী বলব!' বলেন শচীনবাবু: 'সে তো তুমিই বলে দিয়েছ।..আর...আর তোমার নিজের কথার জবাব পাচ্ছো চারধার থেকেই। পাচ্ছো না? আমরা যতটা ভাবি মানুষের দৃষ্টি তেমন নিচের দিকে নয়। প্রায় সবারই বেশ উঁচু নজর। বুঝেছ?'

পাড়া ছাড়িয়ে ট্রাম রাস্তায় নামতেই তিনি ঘামতে থাকেন। কী ভাবছে আশপাশের সহযাত্রীরা। অচেনারাও কেমন যেন বক্রকটাক্ষে তাকিয়ে যাচ্ছে তাদের দিকে। এক পূর্ণযৌবনার সহিত আরেক প্রায়-প্রৌঢ়ের গতিবিধি তারা তেমন সুনজরে দেখছে বলে মনে হয় না।

ট্রামভর্তি যাচ্ছে কত লোক। তারাই বা কী ভাবছে রাস্তায় তাঁদের দিকে তাকিয়ে—

কে জানে! তাদের ভেতর তাঁর চেনা জানাও যাচ্ছে কত জনা। আপিসের সহকর্মীরাও রয়েছে হয়তো। তাঁদের দুজনকে দেখে কী ঠাওরাচ্ছে কী জানি! এই বয়সে এক পরস্ত্রীকে নিয়ে ঘুরচেন তিনি? না, দ্বিতীয় পক্ষে এক নব যুবতীকে বিয়ে করেছেন আবার! করেছেন বেশ করেছেন, তাই বলে সেই দ্বিতীয় পক্ষিনীকে সঙ্গিনী করে রাস্তায় বেরুতে লজ্জা করে না লোকটার! এই সবই ভাবছে তারা হয়তো বা। ফলে নিন্দামুখর আপিসে গিয়ে হয়তো কান পাতা যাবে না কালকে।

না, এর পর থেকে বৌকে নিয়ে...না, আর নয়! একলাই তাঁকে বেরুতে হবে এবার থেকে। বৌকে নিয়ে ক্রিকেট মাঠে কি সিনেমায় যাওয়ার দিন তাঁর গেল এবার!

হপ্তা চারেক বাদে ইডেনে টেস্টম্যাচ দেখতে বৌকে সঙ্গে না নিয়েই তিনি বেরুলেন। এই প্রথম একলা! মনটা খচ খচ করতে লাগল তাঁর। মনে পড়ল, এই ইডেনের মাঠেই তিনি নিজের বৌটিকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন; তাঁর পাসে বসে একদা যে অপরিচিতা কিশোরীটি ক্রিকেট ম্যাচ দেখছিল তাকেই তিনি একদিন বিয়ে করে নিজের ঘরে এনে

তুলেছেন। সেদিনের তনু কিশোরীটি আজ কিশোরীতনু পরে কেমন করে যেন তাঁর নাগালের বাইরে চলে গেল একেবারে!

মাঠের থেকে ফিরতে দেখলেন, বৌ রাজ্যের অন্ধকার মুখে নিয়ে দাঁড়িয়ে।

'আপিস থেকে সোজা ইডেনে গেছলাম কিনা টেস্ট ম্যাচ ছিল আজকে।' অনেকটা কৈফিয়তের সুরেই তিনি জবাব দেন—'আপিস থেকেই চলে গেলাম বলে তোমায় আর নিয়ে যেতে পারিনি। সেই জন্যেই এই মুখভার নাকি গো?'

'না। সেজন্যে নয়। আমার সেই ব্রা-টা কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনে।' বৌ জানায়।

'পাচ্ছ না বুঝি?'

কথা আর না বাড়িয়ে তিনি হাত মুখ ধুতে বাথরুমে গিয়ে ঢোকেন।

বাথরুমে আজ অনেকদিন পরে তাঁর মন যেন গুঞ্জরণ করে ওঠে। '...আমার মল্লিকা বনে...যেদিন প্রথম কলি...' তিনি গুণ গুণ করে উঠলেন আপন মনে...' তোমার লাগিয়া সেদিনই বন্ধু গেঁথেছিনু অঞ্জলি!'

সেদিনের সেই তন্বী কিশোরীটির মুখে শোনা তাঁর প্রথম গান। আর তারই মুখ থেকে কিছুদিন আগেকার শোনা, 'আমরা দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুল ডোরে বাঁধা ঝুলনায়। ভুল না সে কথা ভুল না!' এই গানটাও তাঁর মনে পড়ল সেই সঙ্গে।...

সে গানটির কলিও তাঁর মুখে ফুটল নাইতে নাইতে...'সেদিন প্রভাতে কী ছিল তা জানো? তোমার মনের মাধুরী মিশানো, আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা। ভুল না ভুল না।'

না, সেকথা ভোলার নয়, ভুলবেন কী করে? অতুলনীয়...অতুলনীয়...যেমন সেই হাসি তেমনি সেই গান আর তেমনিই বুঝি সেই গায়িকা!

চা জলখাবার এনে দিয়ে বৌ জানাল—'পেয়েছি আমার ব্রা-টা।' কথাচ্ছলেই বলল যেন কথাটা সে।

'পেয়েছো বুঝি?'

কথাটা তিনি এড়িয়ে যেতে চান।

'আচ্ছা, ওটা ওখানে নিয়ে গেছলে কী জন্যে গো?' গুমরে ওঠে ওঁর বৌ...'খেলার মাঠে কী কাজ দিচ্ছিল ওটা?'

'চিরদিন তুমি আমার সঙ্গে যাও তো...আজ তোমাকে যখন সঙ্গিনীরূপে পেলাম না, তখন তোমার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবেই' নিজের সাফাই দেন শচীনবাবু: 'খেলার মাঠে কে আর কবে একলাটি যায়? হয় নিজের স্ত্রী নয় পরস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই যায় তো সবাই। এই বয়সে আর আমার সঙ্গে যাবার কে জুটবে তাই'...

'তা নিয়ে গেছ বেশ করেছ, কিন্তু ওটার এমন দফা রফা হোল কী করে বল তো? পরবার কোন জো রাখোনি একেবারে।'

'একদম পরা যাচ্ছে না বুঝি?' বলতে গিয়ে শচীনবাবু ফুর্তিতে যেন উছলে ওঠেন।

'যাক্গে...নাই পরলাম আর।' বলল ওঁর বৌ: 'তুমিও তো চাও না যে ওটা আমি পরি। আমাকে এই রকমই তো তোমার ভালো লাগে! তাই না?'

'হ্যাঁ, সত্যি। এই রকমই তোমায় বেশ ভালো দেখায়।' সায় দেন শচীনবাবু: 'অ্যাতো সুন্দর দেখায় যে'...

'বুঝেছি। আর বলতে হবে না। কিন্তু ওটার এরকম দশা হলো কী করে তাই আমি ঠাওর পাচ্ছিনে।'

'গল্প করার কাউকে পাশে না নিয়ে ইডেনের ঐ কঠিন আসনে ঠায় ছ ঘণ্টা বসে থাকা যায়?—তুমিই বলো! তাই সঙ্গিনীর অভাব মোচনেই'...

তারপর আর বলার দরকার করে না। কার ধর্ষণে তাঁর কিশোরী তনুর কৈশোরধর্ম যে বিনষ্ট হয়েছে তা বুঝতে আর বিলম্ব হয় না বৌয়ের।

আসনের দুঃখ ভোলাতে কোনো তনু কিশোরীকে সঙ্গিনী না পেয়ে সেটাকে সুখাসন করে তোলার জন্যই ওই কিশোরী তনুর ওপরেই কর্তা চেপে বসেছিলেন এতক্ষণ!

বন্ধুর মতন নেই আর!

বান্ধবীরা নিতুই নব। নিত্য নবীন। দর্শনে অদর্শনে নব নবরূপে দেখা দিয়ে থাকেন, আমি জানি।

কিন্তু বন্ধুরা চিরকালীন। তাদের রূপ গুণের বিশেষ হেরফের হয় না বোধহয় কোনো দিনই। এইতো জানতাম।

তাদের সেই চিরকেলে একঘেয়ে চেহারা আর ব্যবহারের কোন দিন ভোল পালটে কখনো যে তারা অভিনব রূপ ধরতে পারে এ ধারণা আমার ছিল না। সেই বদ্ধমূল ধারণা আমার বদলে গেল অকস্মাৎ। চিরঞ্জিতের কাছে চিরদিনের মতই হার হলো সেদিন আমার...আর আমার ধারণার।

বন্ধুর মতন হয় না সত্যিই!

প্রেসিডেন্সি হাসপাতালে পীড়িত এক আত্মীয়াকে দেখে রেস-কোর্সের ধার ঘেঁষে পাশ কাটাচ্ছিলাম, ময়দানের সড়কে উঠে এসপ্ল্যানেডের ট্রাম বাস ধরবার মতলবে। ইতিমধ্যে ঘোড়-দৌড়ের খেল খতম হয়ে মাঠের ভিড় ভেঙে রাস্তায় নেমে এসেছে।

ভিড়ের ভেতর চিরঞ্জিত। দেখতে পেয়ে আমার উপর এসে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। 'এধারে যে? এমন অসময়ে?' শুধায় সে।

'সুখলাল কার্নানি থেকে ফিরছিলাম।' আমি জানালাম।

'সুখলাল থেকে? কেন হে? খাসা তো আছো। খাসীর মতই প্রায়। দেখে তো মনে হয় না তোমার কোনো অসুখ বিসুখ আছে। মনে হয় যে তোমার সুখের অবধি নেই...'

'অবধি নেই?' আমি প্রতিবাদ করি—'উচ্চরক্ত চাপে চাপিত। সর্বপ্রকার চাপল্য নিষেধ আমার—তা জানো?'

'আরে ব্লাডপ্রেসার কি আবার একটা অসুখ নাকি? চালু থাকলে কোনো ভয় নেই—বিলকুল নিরাপদ। চলতে ফিরতে পারলেই নিশ্চিন্তি। কিন্তু পড়লে কি মরলে।'

'তার মানে?'

'সেই যাত্রাপালার নায়কের মতই প্রায়। পতন আর মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে।' বলে চিরঞ্জিত: 'তবে স্ট্রোক হলেই পড়ে, না, পড়লেই স্ট্রোকটা হয় তা আমি সঠিক বলতে পারব না।'

ওর কথায়, নৈয়ায়িকদের সেই তাল পড়িয়া টিপ করে, না টিপ করিয়া তাল পড়ে—কথাটা মনে পড়ল আমার।

'হার্টফেল করলেই মরণ হয়, না, মরণদশা হলেই হার্টফেল করে— অনেকটা সেই রকম আরকি।' ওর কথায় আমার সায়।

'ঠিক তাই। আর পড়লেই তোমার হার্ট ফেল হবে। নাও যদি হয় তা, পক্ষাঘাত তো নির্ঘাত। কেউ আটকাতে পারবে না।' সে জানায়: 'তোমার পক্ষে হাঁটা চলাই নিরাপদ। তাহলেও খুব সাবধানে চলাফেরা করবে, ভিড়ের ভেতরে কদাপি যেয়ো না, কারো গায়ে ধাক্কা লেগে পড়ে যাও যদি তো সেটাই হবে তোমার নিরানব্বইয়ের ধাক্কা।'

'ভিড়ের মধ্যেই তো এসে পড়েছি এখন। একটা ট্যাক্সি ডাকো তাহলে...' আমি বাতলাই।

'এই বাজারে ট্যাক্সি মেলে নাকি?' সে অবাক হয়ে যায় আমার কথায়।—'আর, অ্যাতো খদ্দেরের ভিড়ে?'

'তাহলে ট্রাম বাস ধরা যাক, এসো।'

'কিরকম বাদুড় ঝোলা হয়ে যাচ্ছে মানুষ দেখছ? ঐভাবে যেতে যেতে যদি পদস্খলন হয় তো আর রক্ষে আছে তোমার? নিজের দুশ্চরিত্রও খোয়াবে...নিজেও খোয়া যাবে সেই সঙ্গে। নিজেই হারিয়ে যাবে এই দুনিয়ার থেকে... খসবার সঙ্গেই সঙ্গেই খসলে।'

'দরকার নেই। হাঁটাই যাক তাহলে, কিন্তু খিদে পেয়েছিল বেজায়।' আমি বলি—'হাঁটলে পরে আবার আমার খিদে বেড়ে যায় আরো।'

'চলো, কাছেই একটা রেস্তরাঁ আছে। পুলটার কাছাকাছি। সেখানে গিয়ে পেট ঠেসে খাওয়া যাবে দুজনে।' সে আশ্বাস দেয়।

'খিদিরপুরের ব্রিজ দিয়েই তো এসপ্ল্যানেডের ট্রাম যায়, ট্রাম তখন তুমি ফাঁকাই পাবে—খাওয়া দাওয়ার পর। যতো ভিড় এই এখানটাতেই...এখন এই রেস ভাঙবার মুখটায়।' সে প্রায় আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—'দ্যাখো না, আপ ডাউন দুদিকের গাড়িতেই লোক উঠেছে এখন। ভিড়ে ভিড়াক্কার।'

সত্যিই তাই। অগত্যা সেই রেসকোর্সের থেকে হাঁটতে হাঁটতে উঠলাম গিয়ে রেস্তরাঁয়। দুজনকার ছোট্ট একটি টেবিল দখল করে চিরঞ্জিত খাদ্যতালিকাটা এগিয়ে দিলো আমার দিকে—'নাও, ঢালাও হুকুম করো। যা খেতে চাও...যা খেতে তোমার প্রাণ চায়।'

মাঠের থেকে মোটামুটি বেশ কিছু মেরেছে নিশ্চয় মনে হয়। পকেটে রেস্ত না থাকলে ওর মতন কঞ্জুষ কখনো রেস্তারাঁয় আসে না, তথাকথিত কোনো বন্ধুকে নিয়ে অন্ততঃ। প্রাণ ভরে খাওয়াতে চায় না অপরকে।

সুপ-এর থেকে কফি পর্যন্ত একগাদা ফরমাশ দিয়ে বসলাম পরম্পরায়।

'রেসে আজ বেশ লাভ করেছো বোঝা যাচ্ছে। কটা বাজি মারলে শুনি?' জিজ্ঞেস করি।

'একটাই। একটা ঘোড়ার ওপরই যথাসর্বস্ব ধরে দিয়েছিলাম। মানে, পকেটে যা কিছু ছিল আমার।' বলল সেঃ 'তবে বাজি জেতার কথা যদি বলো এমন জিত আর হয় না।'

'ক লেংথে জিতল তোমার ঘোড়া?'

'লেংথে কিহে? ফারলং বলো। দেড় ফার্লং এগিয়ে ছিল সবার থেকে...'

'বলো কি হে! সে কি সম্ভব?' আমি অবাক হয়ে যাই। 'রেসের দিন ঘোড়াদের 'ডোপ' দিয়ে থাকে জানো কি? কাকে 'ডোপ' দেওয়া বলে তা জানো?'

'শুনেছি যেন কথাটা। মাছের টোপ ফেলার মতই কিছু একটা হবে বোধহয়?'

'আরে না, ট্রেনাররা পালা করে নিজেদের স্টেবলের ঘোড়াদের জেতায় সব। এক এক দিনে কয়েকজনের জিতবার পালা। নিজেদের মধ্যে গোপনে সেটা ঠিক করে যেদিন যে ঘোড়াটাকে জেতাবে তাকে ডোপ দেয়। তার পরে সবাই মিলে সেই ঘোড়াটার ওপর মোটা টাকার বাজি ধরে। তাতে আর সব ঘোড়ার হার হলেও মাঠসুদ্ধ রেসুড়েরা সবাই মার খেলেও ট্রেনারদের, জকিদের আর জানাশোনার ভেতরের লোকদের লাভ হয় খুব। যেটার ওপর বাজি ধরেছিলাম তাকে আজ ডোপ দেবার কথা ছিল। একেই বলে ঘোড়ার মুখের খবর—খবরটা আমি পেয়েছিলাম।'

'ঘোড়াটা বুঝি বলেছিল তোমায়?' আমি আরো অবাক হয়ে যাইঃ 'ঘোড়াটার সঙ্গে খুব ভাব ছিল বুঝি তোমার?'

'আরে, ঘোড়া বলবে কেন হে? ঘোড়ার মুখ দেখলেই তো বোঝা যায়। রেসের দিন সকালে যারা ঘোড়াদের স্পার্ট দেখতে ময়দানে যায় তাদের ভেতর যারা সমঝদার তারা ঘোড়াদের মুখ চোখ চাল চলন হাব ভাব দেখেই টের পায় কোনটার আজ জেতার পালা, কাকে সেদিন ডোপ দেওয়া হয়েছে।'

'বটে বটে?'

'ডোপ মানে, কী একটা উত্তেজক ইনজেকশন, ঘোড়াকে সকালে দিয়ে দেয়। তাতে দৌড়বার সময় তার খুব তাগদ্ হয়, খুব এনার্জি দেখা যায়। একেবারে অস্বাভাবিক রকমের। তাতে হয় কি, যে ঘোড়ার আগের দুটো বাজিতে হার হয়েছে পর পর, মানে জেতানো হয়নি যেটাকে, অবশ্যই মতলবমাফিক, সেই ঘোড়াটাই ডোপ নেবার দিন তিন লেংথে সবাইকে হারিয়ে বাজি মেরে দেয়—তার ফলে সব কিছু আপ্‌সেট হয়ে যায়। একেই বলে রেসের আপসেট। আগের হেরো ঘোড়ার ওপর সেদিন তো কেউ বড়ো আর বাজি ধরে না—তাই। বহুত লোকের হার হলেও খবর পেয়ে যারা বাজি ধরেছিল মোটা টাকার টোট জেতে তারা—তাদের বেলায় বাজিমাৎ!

'আর ডিগবাজি-মাত বাকী সবার?'

'তা বলতে পারো। তবে আমারটা যে কী হলো তা আমি ঠিক বলতে পারব না, বাজিও বলা যায়। আবার ডিগবাজিও বলা যায়।'

খাবার মুখে গল্প চলছিল আমাদের। বেয়ারা বিল রেখে গেছল টেবিলে—খানার দাম ঊনত্রিশ টাকায় উঠেছে। উঠুক গে, বিল মেটাবার দায় তো আমার নয় আর।

'তার মানে?' আমি শুধাই: 'তোমার ঘোড়াটা তিন লেংথে, না কি, তিন ফার্লংয়ে জিতেছে এইমাত্র বললে যে! তাহলে?'

'বলেছি ঠিকই। তিন ফার্লংয়ের এক ইঞ্চি কম নয়। বরং কিঞ্চিৎ বেশিই হতে পারে। কিন্তু হলে কী হবে, ওটাকে ঠিক বাজি জেতা হয়তো বলা যায় না...'

'মোটামুটি মেরেছ বেশ আজ। নইলে তুমি আমার মত রাক্ষসকে নিয়ে আজ এই রেস্তরাঁয় এসেছ!' ওর কথায় আমি হাসি।

'হয়েছে কী, বলি তোমায়। খেলাটা খতম্ হয়ে যাবার পরই খবরটা পেলাম ঐ মাঠেই একটু আগে। ঘোড়ার মুখের খবর নয় এবার, আমার মতই এক গাধার মুখ থেকে পেয়েছি খবরটা। সে-হতভাগাও বাজি ধরেছিল ঐ ঘোড়ার ওপরেই—ডোপের খবর পেয়েই বোধহয়।'

'কী বললো সে ডেঁপো—না—ডোপো লোকটা?'

'বলল যে, ঘোড়ার ডাক্তার আজ সকালে ডোপ দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ভুল করে...ব্যাটা নিজেই নেশা করেছিল কিনা কে জানে! ..ভুল করে করেছে কী, ঘোড়াটাকে ইনজেকসন না দিয়ে ঐ ইনজেকসনটা দিয়ে বসেছে তার জকিকে। ফলে মাঠে নেমে ঘোড়াটা তেমন দৌড়চ্ছে না দেখে জকি...ডোপের মাথায় ছিল তো সে...ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে না নিজেই দৌড়তে শুরু করে দিয়েছে। লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে এসেচে সে...রেকর্ড টাইমে...আর সব ঘোড়ার থেকে তিন লেংথে নয়, তিরিশ লেংথ আগে। কিন্তু তাকে তো আর ঘোড়ার জিত বলা যায় না।'

'নিশ্চিত না।' তার কথায় সায় দিতে গিয়ে আমার ভিত কাঁপিয়ে দিয়ে পেল্লায় এক ঢেঁকুর উঠল।

'নাঃ, এতটা খাওয়া ভালো হয়নি ভাই! হাই-ব্লাডপ্রেসারে এত বেশি খাওয়ার ধকল সইবে না হয়তো। ভেজিটেবল চপটা অবশ্যি কিছু নয়, আমার পক্ষে নিরাপদ, ফ্রিশফ্রায়েও কিছু যায় আসে না। কিন্তু মোগলাই পরোটা, মাটন চপ, চিকেন কাটলেট, মুর্গির দোপেঁয়াজি. ডকরোস্ট্ এত সব খাওয়া—রক্ত চাপের ওপর এতখানি খাদ্য চাপানো আমার ঠিক হয়নি। ডাক্তার বলেছে আমায় খাওয়ার খুব ধরাকাট করতে...'।

'ধরাকাট করতে? ডাক্তার বলেছে? তা তুমি তো টেবিলের কাঠ ধরেই খাচ্ছ হে? তোমার ভাষায় বলতে গেলে—এই তো যথেষ্ট খাওয়ার ধরাকাঠ।'

'এত খেয়ে এই বর্ধমান রক্তচাপের ওপর মাথা ঘুরে যদি রাস্তায় পড়ে যাই তাহলেই আমার কাল না, আমি কাঁটোয়া, মানে কাটলাম। পড়লাম কি মরলাম—তুমিই বলছো। না মরলেও পক্ষাঘাত তো নির্ঘাত!'

'সেকথা ঠিক।' বলে আমার কথায় সায় দিয়ে সে বিলের দিকে তাকায়—'তিরিশ টাকার বিল উঠেছে। যাঁহা ঊনত্রিশ তাঁহা ত্রিশ। এক টাকা তো টিপ্স-ই দিতে হবে বয়টাকে।'

'তাতো হবেই।' আমিও টেবিলের দিকে তাকাই—'তুমি নিশ্চয় বলছ না যে, হুজ্ হুজ্ হিজ্ হিজ্? যার যার তার তার। আমার ভাগেরটা আমাকে দিতে বলছ না নিশ্চয়? তাই বলছ নাকি? আমার কাছে কিন্তু আমার বাড়ি ফেরার ট্রাম ভাড়াটাই আছে কেবল।'

'আমার আবার তাও নেইকো।' সে সখেদে জানায়ঃ 'তবে আমার বাড়ি তো কাছেই। এটুকু আমি হেঁটেই মেরে দিতে পারব।'

'তুমি তো হেঁটে মারবে! কিন্তু টাকা না পেলে কি এরা রক্ষে রাখবে? আমাকেই পাকড়াবে। আমিই যে খাবারের সব হুকুম দিয়েছি আবার। এরা আমায় মারতে মারতে হাঁটাবে তাহলে।'

তারপর বয় এসে আমার কাছে বিলের টাকা চাইতেই আমি তাকে পকেট উল্টে দেখিয়ে দিলাম—'আমার কাছে এই সিকিটা শুধু আছে ভাই! আমার বাড়ি ফেরার ট্রাম ভাড়াটাই। তার বেশি আর কিছু নেই আমার।'

শুনে বয়টা আমাকে কিছু না বলে সেখান থেকেই এক হাঁক ছাড়ল। এক হুঙ্কারে সমস্ত ব্যাপারটা বিশদ করে জানিয়ে দিল সে কাউন্টারে বসা রেস্তরাঁর মালিককে।

মালিক সেখান থেকে হাঁকলেন, 'দাঁড়া। যেতে দিসনি লোকটাকে। আমি গিয়ে উচিত শিক্ষা দিচ্ছি ওকে।'

আস্তিন গুটিয়ে আমার সামনে এসে হাজির হলো সে—'সিকি? সি কি বলছেন মশাই? বিরাশি সিক্কির ওপর সাঁটিয়ে সিকি দিচ্ছেন এখন? দাঁড়ান। উচিত শিক্ষা দেব আপনাকে। এই হাতের বিরাশি সিক্কার একখানা খেলেই ঠিকমত শিক্ষা হবে আপনার। আর কোনো রেস্তরাঁয় এভাবে সিকি পকেটে নিয়ে খেতে আসবেন না। অন্ততঃ, আমার এ রেস্তরাঁতে তো নয় আর।'

বলেই সে আমার জামার কলার ধরে টেনে তুলল। তবে আমার বীরোচিত চেহারা দেখে বোধ করি পাছে প্রাণে মারা পড়ি, সেই আশংকায় বিরাশির মাপের একখানা না দিয়ে উনিশ বিশ আন্দাজের চড়-চাপড়ের চোটে ঠেলে নিয়ে চলল আমায় দরজার দিকটায়। এক চোটে ঠিক না হলেও মোটের ওপর ওর মারগুলো সব টোট্যাল করলে বিরাশিকে ছাড়িয়ে যায় নিশ্চয়। এইভাবে অনেকগুলো সিকি ছাড়বার পর রেস্তরাঁর দোর গোড়ায় এসে সে একখানা আধুলি ঝাড়ল। তার সেই অর্ধচন্দ্রের ধাক্কায় আমি রাস্তায় গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

'আপনার বিলের টাকা তো আপনি উশুল করে নিলেন বাবু! বেশ করে হাতের সুখ মিটিয়ে।' বলল তখন বয়টা, 'কিন্তু আমার বক্সিসের কী হবে? আমার টিপ্সটা?'

'তোমার টিপ তুমি আদায় করে নাও বাপু।' ঢালাও হুকুম মালিকের।

আমি গায়ের ধুলো ঝেড়ে সোজা হয়ে না দাঁড়াতেই আমাকে টিপসই করার মতলবে সে ঘুষি পাকিয়ে আমার সামনে এসে খাড়া হলো। বক্সিসের বদলে তার বক্সিংয়ের চোট থেকে নিজের দাঁত চোখ নাক বাঁচাতে আমি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলাম। বাধ্য হয়ে সে তখন পৃষ্ঠদেশেই...আমার অপর পৃষ্ঠায় তার স্বহস্তের স্বাক্ষর রাখল। তার সেই অটোগ্রাফের দাপটে আমি সাত হাত এগিয়ে গেলাম সটান।

'ধরে নিয়ে আয় লোকটাকে।' হুকুম করলেন মালিক : 'আমি এক্ষুনি ও-সিকে ফোন করে দিই—পাহারোলারা এসে পাকড়ে নিয়ে যাক থানায়। সেখানে দস্তুরমতন ধোলাই হলে তবেই ওর হাড়ে হাড়ে শিক্ষা হবে।'

'তার কোনো দরকার হবে না', চিরঞ্জিত আমাদের মাঝখানে এসে পড়ল এতক্ষণ বাদ—'আমিই নিজের হাতে শিক্ষা দেব ওকে আজ—বাছাধন আর জীবনে এমন কম্মো করবে না। ভুলবে না আর জীবনে। নেমতন্ন করে নিয়ে এসে....ছি ছি...এমন অপমানিত আমি কোনো দিন হইনি।'

এবার সে স্বয়ং এসে আমায় এক গলাধাক্কা লাগাল। গলদেশে তার সেই তাড়নায় আমার তলদেশ পর্যন্ত আলোড়িত হয়ে উঠল—আমি চোদ্দহাত এগিয়ে গিয়ে রাস্তার উপর উপুড় হয়ে পড়লাম। সে এসে ধরে তুলল আমায়, তারপর বেশ করে ঘা-কতক কসিয়ে আবার আমার গলার ওপর এক চোট...আবার আমায় তুলে ধরল, ফের ঘা-কতক...আবার আরেকখানা...এমনি দ্রুত তালে তার হস্তক্ষেপ আর আমার পদক্ষেপে চালু হয়ে...উঠতে পড়তে...পড়তে উঠতে...উঠে পড়ে আমি এই পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থাটা (বন্ধুর পন্থাই বটে!) পার হয়ে ট্রাম রাস্তার ওপর এসে দাঁড়ালাম।

তখন সে ছাড়ান দিল আমায়।

হাঁপ ছেড়ে দম নিয়ে আমার বাক্যস্ফূর্তি হলো তখন। আমি বললাম : 'চিরঞ্জিত! চিরদিনই তোমার জিৎ, আর তোমার কাছে আমার হার। কিন্তু তাই বলে তোমার হাতে এমন মার আমি খাব কোনোদিন আমার ধারণা ছিল না। তোমাকে আমি বন্ধু বলেই জানতাম এতদিন। কিন্তু বন্ধুর কাছে এই ব্যবহার...' আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে।

'বন্ধুর কাজ করিনি আমি? বন্ধু আবার বলে কাকে?' বলল চিরঞ্জিত : 'কেন, খারাপটা কী করেছি? মারার ছলনা করে থানার ফাঁড়া থেকে কাটিয়ে, কেটে বেরিয়ে এসেছি তোমায় নিয়ে...'

'মারার ছলনা?...ওদের মারে আমার তেমন ধারা লাগেনি। গায়ে লাগলেও প্রাণে লাগেনি আমার...কিন্তু তোমার এই ছলনার মার কোনোদিন আমি ভুলব না ভাই, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি আমি...এখন ঠিক না পেলেও বাড়ি গিয়ে টের পাব ঠিকই, যদি বাড়ি গিয়ে পৌঁছতে পারি। গায়ের ব্যথায় কাল বিছানা ছেড়ে উঠতে পারব কিনা কে জানে!'

'তাহলেও তুমি আস্তই রয়েছো দাদা! হাড়গোড় কিছুই বরবাদ যায়নি—সবই তোমার অটুট রয়েছে এখনো। এই এলাকার দারোগা আননবাবুকে তো জানো না ভাই! থানায় নিয়ে গেলে আর সেখানে রামধোলাই খেলে তোমার রামত্ব লোপ হয়ে শিবত্বলাভ ঘটত।... গুন্ডারা পর্যন্ত আননবাবুর ভয়ে কাঁপে। তা জানো?'

'আমার ভয় কিসের? আমি কি গুণ্ডা?'

'বড়ো বড়ো গুণ্ডাকেও থানায় নিয়ে গিয়ে কম্বলধোলাই দিয়ে হাড় গুঁড়িয়ে গুণ্ডি বানিয়ে ছাড়েন তিনি। কিন্তু সে তো পরে...এহ বাহ্য...তার আগে তাঁর অন্তর্ধৌতি আছে। নিজস্ব পেটেন্ট পঞ্চগব্য খাইয়ে পেটের কথা টেনে বের করেন তিনি আসামীর। পঞ্চগব্য কাকে বলে জানো?'

'কেন জানবো না? দই, ঘি, দুধ, গোবর আর গোরোচনা—কে না জানে? তাই খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, জানে সবাই।'

'পঞ্চগব্যের ঐ প্রথম তিনটে বাদ, তার বিকল্পে ঘোড়ার নাদ, কুইনিন, ছাগলনাদি যদি পাওয়া যায়, সেইসঙ্গে কেরোসিন আর ফিনাইল—পছন্দসই ফ্লেভার দেবার জন্যেই। ওই তিনি মুখ হাঁ করিয়ে গাঁট্টার চোটে ঢক্‌ঢক্ করে গিলিয়ে দেন, তখন আপনার থেকেই পেটের কথা সব বেরিয়ে আসে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তোলাস সামনেই ধরা থাকে তো, তাই দেখেই না!'

'আমার পেটের কথা টেনে বের করার কী আছে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'নেই-ইত। কাজেই কোনো কথাই বেরুবে না। বাধ্য হয়েই তোমায় পাঁচ সাত গেলাস গিলতে হবে। কথা কিছু না বেরুলেই, একটু আগে বিনেপয়সায় ভালো মন্দ যা খেয়েছো তার সবটাই তোমার বেরিয়ে আসত নির্ঘাত। সেটা কি ভালো হতো? তারপর সেই অন্তর্ধৌতির পর, আসল সেই ধোলাইয়ের 'এহ বাহ্য' তো রয়েই গেল; তার চোটে নির্বিকল্প সমাধি না হলেও অর্ধবাহ্য দশা তো হতোই তোমার আলবাৎ। গন্ধে গোটা পাড়া মাত হয়ে যেত তখন। প্রায় সবার বেলাই সেটা হয়ে থাকে শুনেছি, তেমন ধারণা-শক্তি তো নেই সবার! তখন তোমার সেই হতজ্ঞান গন্ধমাদন ঘাড়ে করে তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিতে হতো আমায়। তার বদলে এই একটুখানি মারামারি—কী এমনটা বাড়াবাড়ি হয়েছে শুনি?'

'মারামারি? মারামারিটা হলো কখন?' কথাটার আমি মৃদু আপত্তি না করে পারি না: 'মারাই তো হয়েছে শুধু, মারি-টা হলো কোথায়? তোমরাই আমায় ঠেঙালে, আমি কি তোমাদের গায় হাত তুলেছি নাকি?'

'এই কথা! আচ্ছা, আমি তোমার গায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি...' বলে আবার সে আমার গলায় পিঠে হস্তক্ষেপ করে...এবার মন্দাক্রান্তা ছন্দে। তাতে আমার ' জ্বলে যায় আরো! আমি ছিটকে ওর নাগাল থেকে সরে যাই।

'রাগ হয়েছে? আচ্ছা, তাহলে মারো তুমি আমায় ঘা কতক, বেশ করে কসে মারো, খুব জোর জোর লাগাও। তাহলে হবে তো?' বলে সে আমার সামনে পিঠ পেতে দেয়।

'খুব হয়েছে। আর ন্যাকামো করতে হবে না।' এতক্ষণ হয়নি, কিন্তু এবার আমার সত্যিই রাগ হলো—'আমার না উচ্চ রক্তের চাপ? পড়ে গেলেই পক্ষাঘাত না নির্ঘাত? তুমি নিজেই তো বলেছো।'

সঙ্গে সঙ্গে তারও মনে পড়ে যায় কথাটা—'তাই নাকি? তাই তো হে! মনেই ছিল না আমার। আশ্চর্য, তোমার তো খাবি খাবার-কথা এতক্ষণ! কিন্তু কই, খাবি তো খাওনি! কতবার তো পড়লে হে! পক্ষাঘাতও হয়নি তো দেখছি।'

'আহা! হলে যেন খুব খুশি হতে মনে হচ্ছে।'

'আশ্চর্য! এখনো তুমি আস্ত আছো, সটান খাড়া রয়েছো সামনে! নো পক্ষাঘাত, নষ্ট কিচ্ছু। এই শক ট্রিট্মেন্ট করে ব্যারামটা তোমার সারিয়ে দিলাম বোধ হচ্ছে। আমার

এক ঘুষিতে...এক না হোক একাধিকই হলো...থানার পক্ষপাত আর নিশ্চিত পক্ষাঘাত দুটোর থেকেই এক-চোটে বাঁচিয়ে দিয়েছি তোমায়। তাতেও তুমি খুশি নও ভাই? এটা কি বন্ধুর কাজ করিনি আমি, বলো? নইলে তুমি কী বলতে চাও?'

আমি আর কিছু বলতে চাই না তারপর। চুপ চাপ পা চালাই।

বন্ধুর মতন হয় না! সত্যি!

ঢং থাকলেই দমকল হয় না

আগুনটা লাগতেই গোবর্ধন ক্যাশবাক্সটা হাতিয়ে আর হর্ষবর্ধন ভাইকে বগলদাবাই করে বেরিয়ে এসেছেন কারখানাব থেকে।

'কী সর্বনাশ হলো বল্ দেখি!' প্রজ্জ্বলন্ত কারখানার দিকে চেয়ে বললেন হর্ষবর্ধন।

'আরো সর্বনাশ হতো যদি ক্যাশবাক্সটা না বাগাতে পারতাম দাদা!' দাদার কথায় সায় দেয় ভাই।

'আরো সর্বনাশ হতে পারত যদি তোকে হাতের কাছে না পাওয়া যেত সময়মত', জানালেন শ্রীহর্ষ: 'অকালে ভ্রাতৃহারা হতে হতো আমায়।'

'কী করা যায় এখন?' গোবরার জিজ্ঞাসা। 'আগুন না নেভাতে পারলে গোটা কারখানাটাই তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।'

ওর গোটা মুখটাই যেন একটা প্রশ্নপত্র হয়ে ওঠে।

'কে নেভাতে আসবে আগুন এখানে?' দাদা বলেন: 'একি তোর সেই দেশ পাড়াগাঁ পেয়েছিস্ যে আগুন লাগলো আর অমনি চারধারের যতো লোক এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, হোস্টেল ইস্কুলের সবাই ছুটে এল, পুকুর থেকে হাতাহাতি করে বালতি বালতি জল এসে পড়ল আর সকলে মিলে নিভিয়ে দিলো আগুন! এ হচ্ছে শহর কলকাতা, এখানে কি তোর পুকুরটুকুর আছে রে? তাছাড়া আগুন নেভাতেই বা আসছে কে হেথায়!'

'শহরের লোকরা বেজায় একলাষেঁড়ে হয় দাদা! সব সময় নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত তারা।'

'এখানে আগুন নেভাতে কেউ আসে না। এমনকি গায়ে পড়ে আগুন লাগাতেও নয়।' হর্ষবর্ধন বিরক্তি প্রকাশ করেন।

'তাহলে কী করে নেভে আগুন এখানে?'

'দমকলরা এসে নেভায়। সেই যে দেখিসনি, ঢং ঢং করে ছুটে যায় রাস্তা দিয়ে?'

'দেখেছি। সেই সঙ্গে আরো দেখেছি...তোমার কথায় মনে পড়ে গেল দাদা! কিন্তু ঢং থাকলেই কিন্তু দমকল হয় না। অনেক মেয়ের তো ঢং আছে, তারা কিন্তু দমকল নয়।'

'নয়ই তো।' কথাটা দাদা মেনে নেন নির্বিবাদে, 'নিজের বাড়িতেই দেখছি দুবেলা, সে আর তোকে বেশি করে দেখাতে হবে না।'

'আমি অন্য বাড়ির কথা বলছিলাম কিন্তু...'

'সব বাড়িতেই আছে রে...দু'বেলাই দম দিচ্ছে কর্তাদের... বেদম-করা কল সব। কিন্তু এখন, দমকলকে তো খবর দিতে হয় আমাদের। কী করে দেয়া যায় বল্‌তো?'

'কেন, ফোন করে, কী করে আবার?' গোবর্ধন বাতলায়ঃ 'পাড়াগাঁর ডাকাডাকিতে যেমন হ্যাঁলো হ্যাঁলো, মেয়েদের বেলাতেই অবশ্যি...এখানে কলকাতায় কাউকে ডাকতে হলে তেমনি ওই ফোনে কান পেতে হ্যালো হ্যালো!'

'তাতো বুঝলাম। কিন্তু ফোন করবি কোথা থেকে? আমাদের ফোনটা তো আপিস ঘরেই...কারখানার ভেতরেই আবার...'

'ক্যাশবাক্সের পাশেই তো ছিল ফোনটা...বুদ্ধি করে তখুনি তখুনি যদি ফোনটা করে দিয়ে আসতাম...'

'বুদ্ধিটা খরচ করিসনি যে, কী ভাগ্যি! তাহলে তুইও খর্চা হয়ে যেতিস এতক্ষণ।'

'খর্চা হয়ে যেতাম? বললেই হলো?'

'অবিশ্যি, আরো একটু বুদ্ধি খরচ করে দমকলের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সকেও ফোন করে আসতিস যদি...'

'অ্যাম্বুলেন্সকে? কেন, অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন আবার?'

'আধ-ঝলসে শিককাবাব হয়েই বেরিয়ে আসতিস তো—দেরি করলে আরেকটুখানি। অ্যাম্বুলেন্স করে হাসপাতালে চলে যেতে পারতিস সঙ্গে সঙ্গে তখুনিই।'

শিকাকাবাব-এর দৃষ্টান্ত দ্বারা ভাইয়ের শিক্ষাভাব মোচনের প্রয়াস দাদার।

দাদার শিক্ষাদানে ভাই কিন্তু বিচলিত হয় না—'ছুটে গিয়ে খবরটা দিলে হয় না?' জিজ্ঞেস করে সে।

'হয়; দমকলের মতই ছুটতে পারিস যদি, তাহলে হয়।' ঘাড় নাড়েন দাদা—'কিন্তু তা কি তুই পারবি? না, তা হয় না, দমকলকেই খবর দিতে হবে। আর কোনো উপায় নেই তাছাড়া। ফোন করেই দিতে হবে খবরটা। কিন্তু ফোন এখন পাওয়া যায় কোথায়। শহরতলীর এই এলাকায় কি ফোন রাখে কেউ? মনে তো হয় না?'

আগুনের লেলিহান ছটায় আকৃষ্ট হয়ে কিছু লোক এসে জমেছিল আশে পাশে। তাদের প্রশ্ন করেও হর্ষবর্ধন সেই একই জবাব পেলেন।

'বস্তির ভেতর ফোন রাখবে কে? তবে হ্যাঁ, সামনের এই বাগানওয়ালা বাংলো বাড়িতে চেষ্টা করে দেখতে পারেন, ফোন আছে সেখানে।' জানালে একজন।

'মালিক কে বাড়ির? নাম কী তাঁর?'

মালিক যে কে, কেউ জানে না। তাঁকে কেউ দ্যাখেনি কখনো তবে গিন্নী একজন আছেন বটে বাড়ির। জানালে একজন।

'জানি আমি।' গোবরাও বলল—'তোমার ঢং-এর কথাতেই মনে পড়েছিল কথাটা। ফোন আছে বটে তাঁর। দেখেছিও ভদ্রমহিলাকে কিন্তু তাঁর ঢং বেজায়।'

'তাহলে যা না তুই। ফোনটা করে আয় সেখান থেকে।' হর্ষবর্ধন বলেন।

'কিন্তু ঐ যে বললাম, ঢং তার খুব।'

'তাঁর ঢং তাঁর ঢং—তোর কী! তুই ফোন করবি চলে আসবি। ছেলেমানুষই তে

বলা যায় তোকে এখনও—অনায়াসেই লোকের, মানে যে কোনো স্ত্রীলোকের বাড়ির মধ্যে যেতে পারিস তুই।'

'না বাবা!' বলেই জিভ কেটে গোবরা ভুলটা শুধরে নেয়—'না দাদা! অমন জাঁদরেল মেয়ের সামনে এগুবার সাহস হয় না আমার। তুমি যাও বরং।'

দাদাকেই যেতে হলো অগত্যা।

গেট পেরিয়ে ফুলবাগান ভেদ করে ঝোপঝাড় লতাপাতার কেয়ারি ধরে এঁকে বেঁকে নানাজাতের ফুলের সুরভি শুঁকে শুঁকে রাজ্যের গোলাপের অট্টহাসির ভেতর দিয়ে বাংলোর সম্মুখে গিয়ে তিনি পৌঁছলেন।

সামনের ড্রইংরুমেই বসেছিলেন ভদ্রমহিলা। হর্ষবর্ধন তাঁর সমীপে গিয়ে নমস্কার করে বললেন—'আমি হর্ষবর্ধন। আপনার এই বাগানবাড়ির সামনেই আমাদের কাঠচেরাইয়ের করাতি কারখানা। এখন যেজন্য এসেছি এখানে...আমাদের কাঠগুদামে আগুন লেগেছে হঠাৎ...'

'অ্যাঁ? আগুন?' আঁতকে উঠলেন ভদ্রমহিলা, 'কী সর্বনাশ!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সর্বনাশ তো বটেই...'

হর্ষবর্ধনের দ্বিরুক্তিতে কর্ণপাত না করে ভদ্রমহিলা ততক্ষণে ফোন তুলে ধরেছেন...'হ্যালো, দমকল...দমকল আপিস? হ্যালো...'

মেঘ না চাইতেই জল! বলতে না বলতেই দমকল। এমন দয়াবতী সহানুভূতিপরায়ণা মহিলার ঢং-এর কথা বলছিল নাকি গোবরা? কিন্তু ঢং কোথায় ওঁর? ঢং তো কোনো দেখা যায় না। শোনাই যায় বরং। হর্ষবর্ধন নিজের দিব্যকর্ণে ঢং ঢং যেন শুনতে পান দমকলের...তাঁর কাঠগুদামের সামনেই...

'হ্যালো, দমকল আপিস? হ্যালো হ্যালো...শুনছেন?'

'হ্যাঁ বলুন।' সাড়া এলো দমকলের থেকে।

'দেখুন, অনেক সখ করে বাগানটা করা আমার। অনেক খর্চা হয়েছে এই বাগান করতে..'

'কী বলছেন?'

'বাগানের কথাই বলছি। যতো দুর্লভ জাতের ফুল টুল, লতা পাতা এনে এনে লাগিয়েছি আমার বাগানে।'

'আগুনটা কোথায়? তাই বলুন!'

'এমন সব গোলাপের চারা এনে বসিয়েছি এখানে, যা আপনি আর কোথ্থাও পাবেন না...তার ওপর এমন করে কেয়ারি করা...এতখানি কেয়ার নেওয়া...'

'আগুন কি আপনার বাগানেই নাকি?'

'না, বাগানে কেন আগুন লাগবে?...কতকগুলো চারা এনে বসিয়েছি সুদূর অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড নিউগিনির থেকে, এসব আনাতে বসাতে অনেক পয়সা গেছে আমার...'

'কিন্তু আগুনটা কোথায় লাগলো বলছেন না তো?'

'এই ফুলবাগানই আমার দিনের কাজ, রাতের স্বপ্ন...আমার অবসরের বিলাস...আমার

বাগানের ফুল যদি আপনারা দ্যাখেন তো দু চোখ জুড়িয়ে যাবে আপনাদের—অবশ্যি যদি ফুল দেখবার চোখ আপনাদের থাকে...ঝোঁক থাকে আপনাদের।'

'শুনুন মশাই...' সঙ্গে সঙ্গেই দমকলওয়ালার প্রুফ সংশোধন শোনা গেল...'শুনুন ম্যাডাম, আপনাকে বলি, ভুল জায়গায় ফোন করেছেন আপনি। ফুলের সখ থাকলে আপনার ফোন করা উচিত গ্লোব নার্সারি কি হর্টিকালচারের আপিসে, কিংবা সেই বোটানিক্যাল গার্ডেনে। নাকি, কোনো ফুলের দোকানের খবর পেতে চান আপনি? ফুল যদি বেচতে চান তাহলে...'

'মোটেই না। ফুল বেচবার দরকার নেই আমার। তার প্রয়োজন কী বলুন? ফুল কি বেচবার বস্তু? তার কখনো দাম হয় নাকি? ফুল হচ্ছে আরাধনার জিনিস।...'

'আচ্ছা ফুলের পাল্লায় পড়া গেল তো', হর্ষবর্ধন আওড়ান আপন মনে। তারপর স্বগতোক্তির থেকে সম্ভাষণে আসেন...'আগুন লাগার কথাটা জানান না একবারটি দয়া করে?'

হর্ষবর্ধনের কথার কোনো জবাব না দিয়ে তিনি বলেই চলেন...'আর আপনারা যে সামনের বাড়ির আগুন নেভাতে এসে আমাব সাধের বাগান লণ্ড ভণ্ড করে দেবেন, ফুলের গাছ-টাছ মাড়িয়ে কেয়ারি টেয়ারি সব তছনছ করে দেবেন সেটি হচ্ছে না...।'

'কিন্তু আগুনটা কোথায লেগেছে বললেন না তো? ঠিকানাটা দিন না!' দমকলের থেকে তথাপি শুধালো। হর্ষবর্ধনের মনের প্রশ্নটাই পাড়লো যেন।

'কোথায় আগুন? কোথায় না! হাটে আগুন, বাজারে আগুন, চালে আগুন, ডালে আগুন, পটলে আগুন, বেগুনে আগুন, আলুতে আগুন'...আগুনকে আলুলায়িত করেও তিনি ক্ষান্ত হলেন না...'আমার মাথায় আগুন! আপনাদের ক্যাঁথায় আগুন!' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন অবশেষে।

বিরস মুখে ফিরে এলেন হর্ষবর্ধন। 'কী হলো দাদা?' শুধালো গোবরা।

'তুই যা বলেছিস.... বেজায় ঢং মেয়েটার...'

'বলেছিলাম তো! ঢং থাকলেই দমকল হয় না।'

'হলোও না। হলো না দমকল।' বলে পথের ওপরেই বসে পড়লেন হর্ষবর্ধন। বসে বসে আগুনের ঢং দেখতে লাগলেন চোখের সামনে।

যবনিকা পতন

'লোকে কয় অভিনয় কভু নিন্দনীয় নয়, নিন্দার কারণ শুধু অভিনেতাগণ'—বলে গেছেন নটগুরু গিরিশচন্দ্র। অভিনেতৃত্ব নিন্দার কারণ তো বটেই তার চেয়েও কিছু বেশিই বরং; নিতান্ত মারাত্মকভাবেই কথাটা ফলে গেল নটবর পুলকেশের জীবনে। সে নিজেই যেন উদাহরণ-স্বরূপ হয়ে দাঁড়ালো মহাকবির ঐ মহাবাক্যের।

অভিনয় করার শখ তার বাল্যকালের থেকে। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে একটা সুযোগ পাবার জন্যে কতো না ঘোরাঘুরি করেছে একসময়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, নেপথ্যে কোলাহল

কিংবা জনতার একজনের ভূমিকার চেয়ে বেশিদূর আর এগুতে পারেনি। অবশেষে বিরক্ত হয়ে পার্টের মত পার্ট পাবার আশায় যাত্রাদলে গিয়ে যোগ দিল সে।

যাত্রাপালায় এক আধটা পার্ট পেলেও তার পার্ট অব স্পীচই একটা বাধা হয়ে দাঁড়ালো—সংলাপাংশেই মার খেলো শেষটায়। মদ কি গাঁজা খাওয়ার হেতু নয়, হয়তো কানে একটু খাটো বলেই যাত্রার আসরে সে বেহুঁশ হয়ে পড়ল একদিন। অভিনয়ের শিক্ষানবিশির সূচনাতেই তার অভিনেতা-জীবন বিষিয়ে দিল সেই ঘটনায়।

প্রম্পটিং ঠিক ঠিক শুনে সেটা সঠিকভাবে ওগরাতে পারাটাই নবিশ (কিংবা নভিস্)-দের অভিনয়-পটুতার গোড়ার কথা। 'নহুসের প্রেতাত্মা কাঁদিছে' এই কথাটা বলতে গিয়ে সে বলেছিল 'বেহুঁশের প্রেতাত্মা কাঁদিছে।' কথাটা নাকি ঠিক হয়নি। কিন্তু কেন যে হয়নি তা তার বোধগম্যের বাইরে। যাত্রাদলের অধিকারীকে সে তর্ক করে বোঝাতে গিয়েছিল যে, নহুস মানেও যা বেহুঁশ মানেও তাই। ওটা বলায় তার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি, তারতম্য হয়নি এমন কিছু। প্রেতাত্মার কোনো হুঁশ থাকবার কথা নয়, এইটেই এখানে আসল কথা।

অধিকারী আর কথা না বাড়িয়ে পত্রপাঠ আসর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন তাকে।

আসর থেকে সরে আসতে হলেও অভিনয় থেকে সরবে না এই হচ্ছে তার প্রতিজ্ঞা। যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে—এই অভিনয় ধরেই সে উঠবে, বাঁচবে, বিখ্যাতও হবে হয়তো বা কোনোদিন।

না, মুক্তাঙ্গনেই সে অভিনয় করবে এর পর থেকে। মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চে নয়, পৃথিবীর মুক্ত অঙ্গনে।

কিন্তু কিছু টাকা তো চাই। পকেটে একটা কানাকড়িও নেই। অধিকারী তো মাইনে না দিয়েই ভাগিয়েছেন। কলকাতার পথে-ঘাটে ঘোরাফেরা করতেও পয়সা লাগে—ঘোরালো অভিনয়ের কথা তো পরে। পৃথিবীর অঙ্গন চারধারেই বিমুক্ত বটে, কিন্তু একটা টাকা ধার দেবার লোক কোনোধারেই নেইকো।

অগত্যা, সে তার এক কম্পাউণ্ডার বন্ধুর কাছে গিয়ে, না, কোনো টাকাকড়ি নয়, এক ফালি ব্যাণ্ডেজ মাত্র ধার চাইল কেবল। তারপর তার সাহায্যেই সেইটে নিজের মাথায় বেঁধে নিয়ে একটা নামকরা হাসপাতালের গেটে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসল সে।

একটু পরেই এক পথচারী এইভাবে ম্লানমুখে তাকে সেখানে বসে থাকতে দেখে সদয় হয়ে শুধালেন, 'কী হে! হাসপাতালে অ্যাডমিশন পাওনি বুঝি?'

'না স্যর। সেরে যাবার পর তারা বার করে দিয়েছে আজ আমায়।'

'হয়েছিল কী? কী করে চোট লাগল তোমার মাথায়?'

'আজ্ঞে, ট্রাম থেকে পা ফসকে পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে গেছল আমার।' কাতর স্বরে সে জানায়।

'বিচিত্র নয়! যা ভিড় বাপু ঐ ট্রাম-বাসে আজকাল। ঝুলতে ঝুলতে যেতে একদিন আমিও তো প্রায় পড়ে যাই আর কি! পড়ে গেলে আমারও ঠিক ঐ দশাই হতো।

কি, মারা যেতাম কিনা তাই বা কে বলবে!' বলতে গিয়ে শিউরে উঠলেন ভদ্রলোক : 'তা, এখানে বসে আছো কেন এমন করে? বাড়ি যাও।'

'আজ্ঞে, ছাড়া পেয়েছি বটে, কিন্তু বাড়ি যাবার গাড়ি ভাড়া তো কাছে নেই, তাই...' বলে সে চুপ করে বসে থাকে।

'বাড়ি কোথায় তোমার?'

'খিদিরপুরের দিকটায়, সেই মোমিনপুরেই। আনা চার পাঁচ পেলেই আমি ট্রামে কি বাসে চেপে চলে যেতে পারি।'

'আবার ট্রাম! এই ব্যাণ্ডেজবাঁধা মাথা নিয়ে—অ্যাঁ?' ফের সর্বাঙ্গ-শিহরণ হলো ভদ্রলোকের : 'এবার পড়লে আর তোমার বাঁচন নেই বাপু! তুমি বরং একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাও তার চেয়ে।'

পুলকেশ কোনো জবাব দেয় না। তাকে যেন আরো বেশি ম্লান দেখায়। আরো যেন সে দমে যায় কথাটায়।

'মোমিনপুর যেতে হলে কত পড়বে ট্যাক্সিতে? যাইনি কখনো তো। আচ্ছা, এই নাও, পাঁচটা টাকা ধরো।' সদয় ভদ্রলোক পুলকেশের অনিচ্ছুক হাতে নোটখানা ধরিয়ে দিয়ে বলেন, 'নাও, নিতে কোনো কুণ্ঠাবোধ কোরো না। তুমি আজ আমায় খুব শিক্ষা দিয়েছ ভাই! তোমার দশা আমারো তো হতে পারত কোনোদিন। বাঁচিয়ে দিয়েছ তুমি আমায়। তার বিনিময়ে এই সামান্য পাঁচ টাকা মাত্র তোমায় দিলাম...না, আমি আর কোনোদিন ওই ট্রামে বাসে চাপছি না। অন্ততঃ ভিড়ের সময় ওই ভাবে ঝুলতে ঝুলতে তো কখনই নয়।'

রোমাঞ্চিত হতে হতে বিদায় নিলেন ভদ্রলোক।

অন্তরে পুলকিত হলেও পুলকেশ আরও বেশি বিষণ্নতর হয়ে বসে রইল। সেইখানেই। তার পরেও।

একটু পরে আরেক শিকার এসে পড়ল তার অভিনয়ের আসরে। তাঁকে তেড়ে গিয়ে ধরতে হলো না, তিনিই নিজগুণে ধরা দিলেন তার ফাঁদে।

সব শুনেটুনে একটা টাকা তার হাতে দিয়ে বললেন—'নাও, বাড়ি যাও এবার। তার আগে কোথাও কিছু খেয়েটেয়ে নিয়ো, কেমন? তোমার ট্রামভাড়ার চাইতে কিছু বেশিই দিলাম সেইজন্যে।'

এই করে এক বেলায়ই তার মন্দ রোজগার হলো না। তারপর রোদ একটু চড়ে উঠতেই চাড়া দিয়ে উঠল সে—ভার ভার মুখ ফেলে...বেশ ভার ভার পকেট নিয়ে।

সেরা এক হোটেলে গিয়ে খানাপিনা সেরে একটা সিনেমা দেখতে বেরিয়ে পড়ল পুলকেশ। মনের পুলকেই!

এমনি করে খোশখেয়ালে চলতে লাগল খাসা তার। দিনের পর দিন এই অভিনয় করেই।

ভালো ব্যবসা ফেঁদেছে সে! পালাযাত্রার আপিস থেকে বিদায় নিয়ে পালা করে নিত্য নতুন এই যাত্রার পালা তার—শহরের বিভিন্ন আরোগ্যশালার মুক্তাঙ্গনে। অভিনয় নিয়ে

ব্যবসা করে অনেকে, ব্যবসার অভিনয়ও করে বিস্তর-জনা, কিন্তু অভিনয় আর ব্যবসা একাকার করে একাধারে এই টু পাইস উপায় করতে একমাত্র সে-ই পেরেছে।

এই ব্যবসায় বাড়তি খরচাও নেই এমন। আপিস ভাড়া, কর্মচারীর বেতন ইত্যাদি লাগে না। হাসপাতাল বানিয়েছেন সরকার বাহাদুর, তার সামনের ফুটপাথ সবাইকার, সেই ফাঁকা ফুটপাথেই তার আপিস খোলা। ইস্টাব্লিশমেণ্ট খরচা কিছু নেই, আর ওভারহেড এক্স্পেনস্, সধরতে গেলে, মাথার এই ব্যাণ্ডেজ।

এই মূলধন নিয়েই তার ফলাও কারবার।

মাথার ব্যাণ্ডেজটা কেবল পরিষ্কার করতে হয় মাঝে-সাঝে—যাতে হাসপাতালের টাটকা-ছাড়া-পাওয়ার মতই তাকে দেখায়। সার্ফ কিংবা লাক্স্ পাউডার দিয়ে সাফ করতে হয় দু তিন দিন অন্তর—নিজের পক্ষে এইটুকুই তার সাফাই—এতখানিই মেহ্নত। তারপর দিনভোব এনতার লাক্সারি। রেস্তরাঁয় খাও, সিনেমায় যাও—ইতস্ততঃ গতিবিধি করো—যা তোমার প্রাণ চায়।

হাসপাতালও কিছু কম নেই কলকাতায়। সরকারী বড় বড় হাসপাতাল কয়েকটা তো রয়েছেই, তাছাড়াও, শহরের এখানে সেখানে আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে বেসরকারী ছোট মাঝারি আরো অনেকগুলো। দৈনন্দিন তার যাত্রাপালা পালটে পালা করে সেইসব মুক্তাঙ্গনের আসরে গিয়ে বসলেই হলো। শহরে সহৃদয় বোকা লোকের অভাব নেই বিশেষ।

নতুন নতুন ভূমিকায় নব নব রূপ ধরে অভিনয় করার প্রয়োজন সে অনুভব করেনি। একই দর্শক বা দাতার দুবাব দর্শনদানের সম্ভাবনা বিরলই ছিল। কলকাতার রাস্তায় নিজের তাডাহুডায ব্যস্ত সবাই! কে কার দিকে নজর দেয়? কে কাকে মনে করে রাখে? তাছাডা তাব নিজেব নজব বেজায় সাফ, একব্যক্তিকে দুবার দোহন করে ধবা পড়ার ভয় ছিল না তার। এই বিরাট শহরে পঞ্চাশ লাখ লোক, একজনের ওপর দুবার কোপ মাবে এমন ব্যাড লাক হবার সাধ্য কি? বকরিদ-পরবের পরদিন কোন মুর্গি কি বক্রি-র বেঁচে থাকার মতই সেটা অবাস্তব!

শহরের প্রান্তে প্রান্তে তার অজান্তে ছোটখাট আরও কতো শিকারক্ষেত্র রয়ে গেছে। অচেনা এলাকায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন এমনি একটা নজরে পড়ে গেল তার। প্রথমে সে খেয়াল করেনি, কিন্তু তার সামনে দিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি সেখানে গিয়ে সেঁধুতেই সে ঠাওর করে দেখল, হ্যাঁ, একটা হাসপাতাল গোছেরই তো বটে ওই বাড়িটা।

ব্যাণ্ডেজ মাথায় বাঁধাই ছিল তার, শীর্ষদেশে তাই নিয়ে সে ঘুরে বেড়াত আজকাল, কোথায় কী তাক লেগে যায় কখন। কলকাতার পথেঘাটে তো টাকা ছড়ানো; ভালো করে তাকালেই হয় একবার। কিন্তু কোনো হাসপাতালের সামনে ছাড়া আর কোথাও কারো কাছে তার ওই মাথা খেলিয়ে সে হাত পাতে না ভ্রমেও। বড়ো বড়ো গাইয়ে আসরের বাইরে গায় নাকি কখনো? অভিনয়সজ্জা মাথায় আর 'অভিনয়বৃত্তি তার মজ্জায়। ভাবল, এই ফাঁকে একটুখানি বসে এখানে দু পয়সা উপায় করে নিলে মন্দ কী?

বসেছে খানিকক্ষণ, এমন সময় এক ভদ্রলোক হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তার কাছে এসে—'এখানে এমন করে বসে আছো যে বাপু?'

'আজ্ঞে, এই হাসপাতাল থেকে আজ ছাড়া পেয়েছি কিনা, বাড়ি যাবার গাড়িভাড়া কাছে নেই আমার, তাই'...

'ও! সেইজন্যেই? তা কদ্দিন ছিলে এখানে?'

'দিন পনেরো থাকতে হয়েছে মশাই। ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে মাথাটা দু ফাঁক হয়ে গেছল আমার!'

'বটে?' বলে অদূরে কী যেন দেখতে পেয়ে একটু আশান্বিত হয়েই তিনি বললেন—'আচ্ছা, তোমার বাড়ি যাবার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি এক্ষুনি।'

একটা পুলিস ভ্যান যাচ্ছিল এখন সেখান দিয়ে সেই সময়। হাত বাড়িয়ে গাড়িটাকে থামিয়ে, কাছে গিয়ে কী যেন তিনি বললেন তার ড্রাইভারকে।

'যাও, ওঠোগে। ও-ই তোমায় বাড়িতে পৌঁছে দেবে এখন। পয়সা লাগবে না।'

উঠতে হলো পুলকেশকে। নিখুঁত অভিনয়ের প্রয়োজনেই উঠতে হলো। অভিনয়ে যেমন প্রবেশ আছে, অবস্থান আছে, তেমনি তার অঙ্গহিসেবে প্রস্থানও রয়েছে যে। অভিনয় সর্বাঙ্গীণ করতে হলে সেটাকে বাদ দেওয়া যায় না।

থানায় যেতেই যেন হাসির ধুম পড়ে গেল তাকে নিয়ে। বড় দারোগা মেজ দারোগা ছোট দারোগা সবাই হাসলেন খুব খানিক। এত হাসাহাসি ভারী খারাপ লাগলো তার। হাসপাতালের সদ্য ছাড়া পাওয়া মাথায় চোট খাওয়া হতভাগ্য এক রুগী—তাকে দেখে এমন হাসবার কী আছে! হাসির অভিনয় তো করছিল না সে, করুণ-রসের ভূমিকাই তো ছিল তার। কিন্তু এই হাসির ধাক্কায় তা যেন ভূমিসাৎ হবার যোগাড়! পুলিসের লোকের কোনো রসকস নেই বলে যে, তা মিথ্যে নয়। সত্যি, এমন হৃদয়হীন হয় তারা যে...

হাসির চোট থামলে একজন তাকে জিজ্ঞেস করলেন—'এমনধারা গর্ব করা তোমার ঠিক হয়নি বাপু হে! এই গর্ব তোমার কতদিনের?'

'গর্ব! কিসের গর্ব স্যর?' কাঁচুমাচু হয়ে সে জানতে চায়।

'পুরুষমানুষের কি গর্ব করা সাজে ভাই? এমনধারা গর্ব করা কি উচিত হয়েছে তোমার? সত্যি, তুমিই বলো না!' আরেকজনের তলব।

'আমি তো কোনো গর্ব করিনি হুজুর।' তার করুণ সুর আরো যেন করুণতর শোনায় কেমন।

'করোনি তো ওখানে মরতে গিয়েছিলে কেন?' আবার এক চোট হাসি।

'এই গর্বটা তোমার কতদিনের হে? শুনি তো একবার।' আরেকজনের জিজ্ঞাসা। আরেক হাসির ধুম।

৫ 'আমার গর্ব! গর্ব কোথায় দেখলেন স্যর আমার?'

'ছি ছি ছি! গর্ব কেবল মেয়েদেরই শোভা পায়...তুমি পুরুষ-মানুষ হয়ে এই গর্ব করতে গেছ...সাতপুরুষে এমন কাণ্ড দেখিনি শুনিনি।' বলেন ও-সি পুলকেশকে: 'ভিক্ষে

করবে করো কিন্তু তাই বলে কি কেউ বৃথা গর্ব করে ভিক্ষে করে নাকি?'

'ঠিক কথা স্যর। ভিখিরির আবার গর্ব কিসের।' সায় দেয় সে তাঁর কথায়ঃ 'গর্ব করেও ভিক্ষে করতে নেই, ভিক্ষে করেও গর্ব করা ঠিক নয়—কারণ ভিক্ষে করাটা গর্বের কিছু নয়।'

'তোমার এই গর্বটাই তোমার এই পতনের কারণ হলো, বুঝেচ?'

'পতনের কারণ হলো?' পুলকেশ শুনে অবাক হয়।

তিনি জানানঃ 'হ্যাঁ, এর জন্যে হাজতে তো যাচ্ছই এখন—হয়তো বা জেলে যেতেও হতে পারে।'

'জেল! জেল কিসের জন্যে হুজুর?' এবার যেন সে চমকে ওঠেঃ 'গর্ব করলে পতন হয় জানি, কিন্তু তাই বলে কি জেল? তাছাড়া, আমি যখন মোটেই কোনো গর্ব করিনি'...

'গর্ব করলে পতন হয় এটা যখন জানো'...

অন্য একজন অফিসার মাঝখান থেকে ফোড়ন কাটেন—'মেয়েদের বেলা অবশ্যি পতন হবার পরই গর্বটা হয়ে থাকে'...

'তখন এটাও তোমার জানা উচিত ছিল যে, অধঃপতনের শেষ সীমায় জেল ফাটক অনিবার্যই।'

'গর্ব দূরে থাক আমি গর্বের কোনো ভানও করিনি স্যর'...তবুও সে বলতে চায়।

'আরে, গর্ব যদি তোমার নাই হয়ে থাকে তাহলে ওই বাড়িটার ধারে কাছে গিয়েছিল কেন? দশ মাসের গর্ব হলেই তো যায় ওখানে কেউ'...

'তোমার এই গর্বটা ক' মাসের ছিল হে?' অন্য একজনের ওপর-টিপ্পনী। —'নাকি তোমার গর্বপাতের জন্যেই গিয়েছিলে সেখানে?'

গর্বপাতের কথাটায় পুলকেশের কোথায় যেন খটকা লাগে কেমন। ভাষাটা যেন কেমনতরো। তবু সে খট করে কিছু বুঝতে পারে না। ওর গর্ভে আরো যে কী নিহিত আছে তার কোনো আঁচ পায় না সে। কিন্তু না আঁচালে, সে যে বিচ্ছিরি কিছু করে বসেছে তা সে বিশ্বাস করবে কী করে? তবু কিছু টের না পেয়েই সেই নাটের মধ্যে আরো সে এগিয়ে যায়—

'আপনারা গর্ব গর্ব বলছেন বটে হুজুর কিন্তু আমি তো নিজের কোনো গর্ব দেখতে পাচ্ছি না। গর্ব কাকে বলে—গর্বের মানে কী, তাই আমি জানি না এখনো।'

'গর্ব কাকে বলে জানো না?' বলে তিনি নিজের বিপুল ভুঁড়ির দিকে তার নজর টানেন—'এই যে! এই হচ্ছে এর মানে। তুমি এটা জানো না?...একেই বলে থাকে গর্ব।'

'আপনার গর্বের কারণ আছে। আপনি পদস্থ কর্মচারী, আপনার গর্ব হতে পারে কিন্তু আমি সামান্য নগণ্য লোক, এহেন কথা বলে এমন করে আমায় অপদস্থ করা আপনাদের উচিত নয় কখনো। দয়া করে তা করবেন না স্যর। এই আমার বিনীত অনুরোধ।'

পুলকেশ বিনয়ে গলে পড়লেও দারোগাবাবুদের আদৌ পুলকিত দেখা যায় না। তিনি

খাপ্পা হয়ে ওঠেন—'কী গর্ব গর্ব করছো তখন থেকে! গর্ব কাকে বলে জানো না? গর্বের মানে কী, তাও বুঝি তোমার জানা নেই? গর্ব বানান করতে পারো? নাকি, তাও একদম্ জানো না?'

'আচ্ছা গাধা তো!' অপর দারোগার টিটকিরিঃ 'নাকি গাধা সেজে ন্যাকামো করা হচ্ছে এখানে।'

'লম্বকর্ণটাকে আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে ভাগিয়ে দিন স্যর। এই পাগলের নামে কেস করে আর কী হবে? কোর্টে পাঠালে তো সেখানে হাসাহাসি পড়ে যাবে একচোট। আর এমন অপদার্থকে পাঠানোর চোটটা শেষে সামলাতে হবে এই আমাদের।'

লম্বকর্ণ-গালটায় পুলকেশের প্রাণে লাগে। কানে সে একটুখানি খাটো হতে পারে, কিন্তু তাই বলে তার কানকে লম্বা বলা, কেবল তার কানেরই নয়, তার নিজেরও যেন মানের লাঘব। দস্তুরমতন মানহানি।

'কিসের কেস হুজুর?' সে জানতে চায়ঃ 'কেন আমায় দায়রায় সোপর্দ করবেন? কিসের দায়ে? আমি তো কোনো কসুর করিনি আপনাদের কাছে।'

'চিটিং কেস। আবার কিসের দায়? চিটিং চার্জ রয়েছে তোমার নামে। চিটিংবাজি করলে জেলে যেতে হয় তা জানো না?'

'চিটিংবাজি? কাকে আমি চিট করতে গেলাম স্যর?' এবার সে দস্তুরমতই হতভম্ব হয়।

'কেন পাবলিককে। গর্বের কোনো কারণ না থাকলেও গর্ব করা—গর্ব বানিয়ে ভিক্ষে করা—সেটা কি একটা চিটিংবাজি নয়? নয়তো কী তাহলে?'

'এখনো আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি স্যর, কারো কাছে আমি কোনো গর্ব করিনি।'

'ফের গর্ব গর্ব করছো, গর্ব বানান করো তো'..

'গ আর ব-য়ে রেফ'...

'গ আর ব-য়ে রেফ? আস্ত একটা গবেট তুমি...।' তারপর তিনি প্রাঞ্জল করেনঃ 'গ আর ভ-য়ে রেফ দিলেই গর্ভ হয়। মেয়েদের হয়ে থাকে। পুরুষদের কখনই হয় না, হতে পারে না। তুমি যে-হাসপাতালের সামনে গিয়ে বসেছিলে, যেখান থেকে খালাস পেয়েছো বলছিলে তুমি, মেয়েরাই সেখানে গিয়ে থাকে কেবল। সেখানে গিয়ে খালাস হয়; দশ মাস হলেই যায়...এই এমনিতরটা হলেই'...

বলে আবার তিনি নিজের সুবিপুল সুবিন্যস্ত ভুঁড়ির দৃষ্টান্তে নিজেকে উদাহরণস্থল করেন।

থানায় এসে, অ্যাদ্দুর এগিয়ে, এতক্ষণ পরে জানল পুলকেশ—যে কথা ঘুণাক্ষরেও জানা ছিল না তার—নিজের প্রয়োগনৈপুণ্য প্রকট করে অভিনয়শিল্পের solo-কলা দেখাতে গিয়ে যেখানে সে আজ বসেছিল, হাসপাতাল হলেও আসলে সেটা একটা মেটার্নিটি হোম।

গর্ব্বোযন্ত্রণা আর কাকে বলে?

শূন্যমার্গ

'আমি পাকিস্তানী।' আদাব করে জানালেন তিনি আমায়—'আমি একজন শিয়া...'

আমিও বেয়াদবি করলাম না, সালাম জানিয়ে বললাম—'জানি। আপনাদের মধ্যে যে দুটি সম্প্রদায়—শিয়া আর সুন্নী তা আমার অজানা নয়।'

'না। সেদিক থেকে আমি সুন্নী।' বললেন ভদ্রলোকঃ 'আপনি সাংবাদিক তো? অনেক খবর রাখেন, অনেকের খবর রাখেন। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছি আমি—কী কারণে তা বলছি—এখানে উঠেছি এই আপনাদের এলাকাতেই, ঠনঠনের পাশে ওই কলাবাগানের বস্তিতে। আপনি কাছাকাছি থাকেন জানতে পেরে খোঁজ নিতে এলাম...আপনার কাছেই খবরটা পাব বলে আমি আশা করি!'

'পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছেন?' আমিই উল্টে খোঁজ করলাম—'কিন্তু কেন? যদ্দুর জানি সেখানে তো অ-হিন্দুদের ওপরে তেমন কোনো অত্যাচার হয় না।'

'ব্যাপারটা বলি শুনুন তাহলে।' তিনি শুরু করেনঃ 'আমি পূব বাংলার মুসলমান। একজন বৈজ্ঞানিক। নিউক্লিয়ার ফিজিকস্ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে আমার। অ্যাটম বম-টম নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি বহুৎ। কিন্তু সে কথা থাক, একটা জরুরি প্রয়োজনে আমাকে রাওয়ালপিণ্ডির সরকারী দপ্তরখানায় যেতে হয়—বিশেষ একটা আর্জি নিয়ে। সেখান থেকে আমাকে পাক-বাহিনীর কম্যাণ্ডার ইন চীফ-এর কাছে পাঠিয়ে দিল তারা...।'

'জেনারেল মুসো না মেসো কে যেন সে?' আমি শুধোলাম।

'আপনার মেসো কি মুসো তা জানিনে, তবে মাসি যে নয় তা হলফ করে বলতে পারি মশাই। —ইয়া ইয়া লম্বা-চৌড়া গোঁফ রয়েছে জনাবের।'

'বটে!' বলেই আমার মনে পড়ল, পাকিস্তানের জেনারেল ইয়া-ইয়ার নামটা যেন শোনা আমার।

'...এত্তেলা দিয়ে ঢুকলাম জেনারেলের কামরায়।' বলতে লাগলেন পাকিস্তানী বিজ্ঞানীঃ 'তিনি সেখানে একলাই ছিলেন তখন। প্রকাণ্ড এক টেবিলের সামনে বসে নিজের গোঁফে তা দিচ্ছিলেন এক মনে। আমাকে দেখে তা থামিয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন—বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্যে? বাংলায় নয়, চোস্ত উর্দুতেই বললেন কথাটা। বাঙালী হলেও এবং উর্দু তেমন ভালো কইতে না পারলেও বুঝতে পারি মোটামুটি রকম।

'তাঁর কথার জবাবে আমার নক্সার খোলটা আমি তাঁর টেবিলের এক পাশে রাখলাম। তিনি শুধোলেন—চীজটা কী? আমি বললাম, জনাব, এটা একটা গোপনাস্ত্রের নক্সা। এই অস্ত্রের সাহায্যে এক চোটে কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই উড়িয়ে দেওয়া যায়। 'ইয়াল্লা! ই কভি হো শকতা' শুনে তিনি যেন আঁতকে উঠলেন মনে হলো।'

'আপনার কথায় শক পেলেন মনে হয়?' আমি বলি।

'হতে পারে। তখন আমি তাঁকে পরিষ্কার করে জানালাম। আমার আবিষ্কারের কাছে রুশ-মার্কিনের ঐ অ্যাটম বমও একেবারে কিচ্ছু না।'

আমার কথায় হাসতে লাগলেন জেনারেল—'কী সব আজে বাজে বকছেন। ওদের আণবিক হাতিয়ারের ধারে কাছে আগামী দুশো বছরের ভেতর কাউকে আর আসতে হবে না। এমন কি আমাদের পরম দোস্ত ঐ চীনকেও নয়।'

'ঠিকই বলেছেন জনাব। কী করে আসবে।' ওঁর কথায় সায় দিতে হলো আমায়—'সেই সব দেশে তো এই বান্দার মত কেউ পয়দা হয়নি এখনো। এহেন অস্ত্রের আইডিয়া তাদের মগজেই আসেনি এখন তক।'

বলে আমার নক্সার রোলটা খুলে তাঁর টেবিলের ওপরে বিস্তারিত করে দিলাম তখন...তিনি নাক সিঁটকে তাকালেন তার ওপর।

আমি বললাম—'এটা হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় প্রজেক্ট-জে। জে মানে আমি। আমার নাম জালালুদ্দিন। তাই আমার নামেই এটার পেটেন্ট। বলে আমি অস্ত্রটির সব বিষয় বিশদ করে তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করতে লাগলাম।'

শুনতে শুনতে তাঁর উৎসাহ জাগল। তিনি আগ্রহের সঙ্গে আমার কথার সঙ্গে মিলিয়ে নক্সাটার সব কিছু লক্ষ্য করতে লাগলেন। প্রজেক্ট-জেকে আরও বিস্তারিত করতে হলো আমায় তখন—সবটা খুলে টেবিলের ওপরে ছড়িয়ে দিলাম। টেবিল ছাড়িয়ে গেল নক্সাটা। তখন তিনি নক্সাটা নিয়ে মেজের কার্পেটের ওপরে বিছিয়ে নিজে তার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

আধঘণ্টা ধরে নক্সাটার আগাপাস্তলা সব কিছু দেখে শুনে বুঝে নিয়ে তিনি খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন। আমার করমর্দন করে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন—'বাহাদুর আপনি! আপনার এই নয়া হাতিয়ারটা অদ্ভুত বটে সত্যিই...'

'হ্যাঁ। একচোটে দিল্লী কলকাতা বোম্বাই উড়িয়ে দেবার কিম্মত রাখে।'

'তা রাখে। তবে সেইখানেই যা একটু...তা সে কথা যাক। এর জন্যে কত দিতে হবে আপনাকে? দশ হাজার।'

'দশ? দশ কি বলছেন জনাব? একশ বলুন।' বলে আমার প্ল্যান আমি গুটিয়ে নিলাম।

'পঞ্চাশ হলে হয় না?'

'পঞ্চাশ! মাত্র পঞ্চাশ হাজার? বলেন কী জনাব? হিন্দুস্থানের মতন এক দুশমনকে দুরস্ত করতে মাত্র মোটে পঞ্চাশ হাজার? আমি পাঁচ লাখ টাকা পাবার আশা করে এসেছিলাম। পাঁচই আমার চাই, তার কমে ছাড়ব না।'

'আড়াই লাখ।' বললেন তখন তিনি।

'অলরাইট। আমি রাজি।' বলে নক্সাটা তাঁর হাতে আমি সঁপে দিলাম।

জেনারেল আড়াই লাখের একখানা চেক লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন—'এটা ট্রেজারিতে জমা দিলেই ভাঙিয়ে দেবে।' বলে তিনি আমার করমর্দন করলেন আবার।

করমর্দনের ফাঁকে আমি চেকের ওপরটায় চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়েছি—শূন্যিগুলো

তিনি ঠিক ঠিক দিয়েছেন কিনা। না, পঁচিশের পর...পর চারটে শূন্যই রয়েছে বটে, দেখা গেল।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আমাকে বিদায় দেবার আগে তিনি বললেন—'আবার যদি এমনি বড়িয়া কিছু আবিষ্কার করতে পারেন, একটুও বিলম্ব না করে সোজা চলে আসবেন এখানে। আমরা উচিত মূল্যে তা কিনে নেব। এমনধারা যদি কিছু থাকে আপনার আর...।'

'আছে আমার।' আমি জানালাম।

'আছে আপনার ?'

'আমার কাছেই আছে।' বলে আমার ব্রিফ কেসটা খুলে আরেকটা নক্সা বার করলাম। —'এ হাতিয়ারটা প্রজেক্ট-জের চেয়েও জব্বর।'

সন্দিগ্ধ নেত্রে তাকালেন জেনারেল—'তা কি কখনো হতে পারে ? যেরকম বুঝলাম, এবং আপনি বোঝালেন তাতে মনে হলো প্রজেক্ট-জের ওপরে আর কোনো কথা নেই।'

'আছে বই কি ! বিজ্ঞানের শেষ কথা কি কেউ বলতে পারে কখনো ? আবিষ্কারের কি ইয়ত্তা আছে ?' বলে আমার নতুন নক্সাটাকে তাঁর চোখের সামনে মেলে ধরলাম—'এটি হচ্ছে প্রজেক্ট-এম। প্রজেক্ট জালালুদ্দিনের সঙ্গে মোলাকাত করার এক্তিয়ার রাখে বলেই এর নাম প্রোজেক্ট-এম।'

'বটে ? এর কেরামতিটা শুনি তো একবার ?' শুধালেন জেনারেল তখন।

'প্রজেক্ট-জের চেয়েও দ্রুতগতিতে যাবার ক্ষমতা আছে এর। ঐ প্রজেক্ট-জে তার টারগেটে গিয়ে পৌঁছবার আগেই এ গিয়ে শূন্য পথেই তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে।'

'তাজ্জব !' বলে খানিকক্ষণ তিনি হাঁ হয়ে রইলেন, তারপর বললেন—'ও জিনিসের আমাদের দরকার হবে বলে আমি মনে করি না। কেননা, এই প্রজেক্ট-জের মতই কেউ কিছু বহুৎদিন বানাতে পারবে না, তারপরে তো তার সঙ্গে মোলাকাতের কথা।'

'ঠিকই বলেছেন জনাব।' বললাম আমি তখন—'কিন্তু লড়াইয়ের কায়দাকানুন নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে—আমার চেয়ে ঢের ভালোই জানেন আপনি জনাব যে, যতক্ষণ সেই হাতিয়ারের জবাব আপনার হাতে নেই ততক্ষণ তা ব্যবহার করতে যাওয়াই উচিত নয় আপনার। কেননা, অপর পক্ষের হাতে আপনার সেই হাতিয়ারের জবাব থেকে যেতেও পারে হয়তো বা।'

'ইয়াল্লা !' জেনারেলের মুখ অতঃপর আর আগের মতন মোলায়েম রইল না, দারুণ গম্ভীর হয়ে গেল এবার—'তার মানে, তোমার জাহান্নামের ঐ মোলাকাতও আমাকে হাত করতে হবে, নইলে হয়তো তুমি ঐ প্ল্যান অপর পক্ষকে গিয়ে বেচবে।'

আমি তাঁর কথায় কোনো প্রতিবাদ না করে চুপ করে রইলাম। তিনিও চুপচাপ—অনেকক্ষণ। এই নীরবতার ভেতর নিজের গোঁফের দুই প্রান্ত তিনি চিবুতে লাগলেন চটেমটে।

অবশেষে গুম্ফ চর্বণ থামিয়ে আরেকটা চেক লিখলেন তিনি—আড়াই লাখের।

আমার হাতে চেকটা দিয়ে তিনি বললেন—'চলুন, এবার আমাদের অফিসারস ক্যানটিনে গিয়ে একটু কিছু খানাপিনা করা যাক এখন। এক কাপ কফি অন্তত।'

লম্বা করিডর ধরে যাবার পথে একটা বিরাট হলঘরের সামনে এসে আমরা দাঁড়ালাম। ইস্পাতের কলাপসিবল গেট ছিল হলটার। জেনারেল দেওয়ালের একটা বোতাম টিপতেই গেটটা দু ফাঁক হয়ে সরে গেল দুধারে। যমদূতের মতন দুজন লোক ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। এসেই পাকড়ালো আমাকে।

'একি! এরা আমায় ধরছে কেন হুজুর? ছেড়ে দিতে বলুন এদের!' চেঁচিয়ে উঠেছি আমি।

আমার জবাব না দিয়ে তিনি লোক দুটোকে বললেন—'হুঁশিয়ার! হরবখৎ নজর রাখতে হবে লোকটার ওপর। যেন পালাতে না পারে। তবে ভদ্রলোকের কোন তকলিফও যাতে না হয়। খানাপিনা গোসল উসলের বিলকুল সুবন্দোবস্ত চাই। ইনি এখানে বরাবরের জন্য আমাদের মেহমান—সম্মানিত অতিথি। খেয়াল থাকে যেন।'

'চিরদিনের জন্য কয়েদখানায় পুরছেন আপনারা আমায়? কিন্তু কেন? কী ক্ষতি করেছি আমি আপনাদের? আমি তো আপনাদের ভালোর জন্যই...।'

আমার কথা শেষ হতে পেল না, মোক্ষম জবাব পেলাম আমার কথার—'আপনি ভয়ঙ্কর লোক।' বললেন তিনি—'আপনার মত মানুষকে বাইরে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। পাকিস্তানের স্বার্থেই আপনাকে এইভাবে ইনটার্ন করতে হচ্ছে আমায়।'

'কিন্তু আমি তো পাকিস্তানের স্বার্থেই...আমার এই আবিষ্কার তো পাকিস্তানের স্বার্থেই দিতে চেয়েছিলাম জনাব। আমাকে কয়েদ করে...আমার এই প্রজেক্টগুলি নিয়ে আপনারা কী করবেন?'

'কিচ্ছু করব না।' তিনি আশ্বাস দিলেনঃ 'আপনার কোনো ভয় নেই। এসব কোনো কাজেই লাগাবো না আমরা—কাজেই লাগবে না আমাদের।'

'সে কী! দুষমন হিন্দুস্থানকে জবেহ্ করতে হলে...।'

'কে চাইছে জবেহ্ করতে? হিন্দুস্তান না থাকলে আমরাই কি থাকব? হিন্দুস্তানের আকাশ বাতাস যদি আণবিক বোমার ঘায় ঝলসে যায় তো তার আঁচে কি আমরাই বাঁচব? তা কি আমাদের পাকিস্তানকেও লাগবে না? একই বাতাস পূব থেকে পশ্চিমে বইছে। পশ্চিম থেকে পূবে। একই নদীর জলধারায় দু দেশের মাঠে ফলছে ফসল। না না, হিন্দুস্থানের ধ্বংস আমরা চাই না। তার সঙ্গে লড়াই করেই আমরা বাঁচতে চাই বরাবর। কিন্তু হিন্দুস্থান যদি না থাকে তো লড়ব কী নিয়ে, লড়াই করব কার সঙ্গে? মিলিটারি ডিপার্টমেন্টই উঠে যাবে, আমাদের চাকরি বিলকুল খতম্।'

তিনি আদাব জানিয়ে বিদায় নিতেই তারপর সেখান থেকে ছাড়ান পাবার জন্যে সেই যমদূত দুটোকে চেক দুখানা আমি ঘুষ দিয়েছি। সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেছি দিল্লীতে। যদি হিন্দুস্থানের প্রতিরক্ষা দপ্তরে বেচতে পারি আমার প্রজেক্ট। আরো চড়া দামে গছানো যায় যদি তাদের। কিন্তু না, দিল্লী আমায় হতাশ করেছে। সেখানকার কর্তাদের কারোই এ ব্যাপারে কোনো গা দেখা গেল না। আমার কোনো প্রজেক্ট সম্বন্ধেই তাঁরা আগ্রহী নন।'

'না জালালুদ্দিন—না মোলাকাত?' আমি শুধালাম।

'না। এই জালালুদ্দিন মিঞা সবার সঙ্গেই মোলাকাত করেছে—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী—কিন্তু...কিন্তু কী আর বলব!'

'কাউকেই কাত করতে পারেননি?' আমি বললাম।

'একদম্ না। পাকিস্তানী জেনারেল তবু তো আমার প্রজেক্টগুলি খুঁটিয়ে দেখেছিলেন, এঁরা একেবারে তাকাতেই চাইলেন না। নক্সাটা খুলতেই দিলেন না কেউ। সবার মুখেই এক কথা। আমরা পাকিস্তানের ধ্বংস চাই না, তার শ্রীবৃদ্ধিই আমাদের কাম্য, তাদের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে সহাবস্থান করতে চাই আমরা। একজন তো দস্তুরমত সদুপদেশই দিলেন আমায়। বললেন, আপনার এসব পাগলামি ছাড়ুন, এ পথ ভালো নয়।'

'এই কথা বললেন?'

'শুনুন কথা! বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে, বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে বলে কিনা পাগলামি? যাক, এখানে কেউ আমায় গারদে দেবার চেষ্টা করেনি এটাই ভালো বলতে হবে। ...বোধ হয় সেটা গণতন্ত্রের গলদ। ...তারপরেই আমি সেখান থেকে চলে এসেছি এই কলকাতায় ...দিল্লীর থেকে সটান।'

'উঠেছেন আমাদের কলাবাগানের বস্তিতে?' আমি বললাম : 'তা ওটা তো পাকিস্তানই প্রায়, বলতে গেলে।'

'এসে অব্দি একজন সাংবাদিকের খোঁজে আছি, যিনি তামাম দুনিয়ার খবর রাখেন। সব কিছুর...সবাইকার খোঁজ-খবর। আই ওয়ান্ট এ সিয়া...সিয়ার খবব পেতে চাই।'

'তাহলে বড ভুল জায়গায় এসেছেন মশাই। সংবাদপত্র পড়ে থাকি বটে, প্রত্যহই পড়তে হয়, অল্পবিস্তর লিখেও থাকি কাগজে, তবে সত্যি বলতে আমি সাংবাদিক নই। একান্তই এক বিসম্বাদিক। বাংলা মুল্লুকের খবর দূরে থাক, এই কলকাতারই খবর আমি রাখি না। এসিয়ার খবর আপনাকে আমি কী বাতলাব!'

'আপনি কি প্রখ্যাত সাংবাদিক এম শিবরাম নন তাহলে?'

'কী বললেন? এম শিবরাম? তিনি আবার কে?' আমি ঘাড নাড়লাম—'না মশাই না। আমাব কোনো এম নেই—না নামে না জীবনে। আমি শুধুই শিবরাম।'

'বস্তির লোকরা কি তাহলে ভুল বাতলেছে আমায়!' তিনি যেন অবাক হয়ে গেলেন—'শিবরাম কি নানারকমের হয়ে থাকে নাকি?'

'কে জানে! কেউ কেউ আমাদের মধ্যে হয়তো এমবিশাস থাকতেও পারেন! তবে আমি নই। আমি নিতান্তই শিবরাম। সামান্য...নামমাত্র।'

'আপনি শিয়ার কোনো খবর রাখেন না তাহলে? শিয়ার কিছু জানেন না আপনি?'

'জানব না কেন? খবরও পাই মাঝে মাঝে। শিয়া সুন্নীর লড়াই তো বেধেই থাকে প্রায়। এমন কি আপনাদের পাকিস্তানেও তো লেগে যায় বলে শুনেছি!'

'আহা, সে শিয়া নয় মশাই! মার্কিন মুল্লুকের সিয়া। সি আই এ—সিয়া! নাম শোনেননি তার? তামাম দুনিয়া জুড়ে দু হাতে যারা টাকা ছড়াচ্ছে, রাজা উজীর মারছে, পলিটিক্যাল পার্টিদের কিনছে, রাজ্য লোপাট করছে—শোনেননি নাকি?'

'শুনেছি বটে! তবে ঐ খবরের কাগজেই। তাদের কাউকে চাক্ষুষ করিনি কখনো।'

'তাদের এজেন্টদের একজনকেই আমি খুঁজছিলাম। আমার এইসব প্রজেক্ট কিনতে পারে তারাই কেবল। দু পাঁচ লাখ কি, এমন জিনিস পেলে ক্রোড়খানেক টাকা ঢালতেও তারা কসুর করবে না।'

'ওঃ, সেই CIA-র খোঁজ করছেন? বরাত ফেরাতে সবাই তাদের খোঁজে ফিরছে বলে শুনতে পাই, কিন্তু আমার জানাশোনার মধ্যে কেউ তাঁদের কৃপালাভ দূরে থাক, দর্শন পেয়েছেন বলে আমি জানি না। বিধাতার মতই তাঁরা সর্বদা অন্তরালে; হয়তো কৃপা করে কিংবা কৃপা করবার জন্যই কোনো কোনো ভক্তকে কখনো-কদাচ দর্শন দেন। তবে চেষ্টা করে তাঁদের পাত্তা পাওয়া যায় না, নিজগুণে দেখা দিলেই দেখা মেলে। এই রকম শুনেছি।'

'সেই সিয়ার কোনো খবর তাহলে আপনি আমায় দিতে পারলেন না!' বলে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

'গোড়াতেই আপনি বললেন না যে শিয়া নন, আপনি সুন্নী; সেই কথাই আমি বলতে চাই আপনাকে শেষটায়। সিয়ার দিক থেকে আমিও শূন্যি! লাখ লাখ টাকা দেনেওয়ালা কেউ আমার ত্রিসীমানায় নেই—চারধারেই শূন্য আমার, বুঝেচেন?'

পৃথিবী গোল

পৃথিবী যে গোল তার পরিচয় পেলাম সেদিন।

আর গ্লোব-এর মত মানুষের মাথাও যে গোলাকার কিছু কম নয়, তার ভেতরেও গোলের কিছু কমতি নেই তাও আমি টের পেলাম সেই সঙ্গে।

অনেককাল পরে আমার বাল্যবন্ধু তারাপদর এক চিঠি এল হঠাৎ—তাতে লেখা—

'জীবন-পরিক্রমার পথে ঘুরতে ঘুরতে তোমার 'অদ্বিতীয় পুরস্কার' গল্পগ্রন্থের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। তাতে আমাদের ইস্কুলে পড়ার সময়কার সেই ভূত দেখার গল্পটা লিখেছ দেখলাম। আমাদের সবার নাম-ধাম দিয়ে লিখেছ। তোমার সঙ্গে আমি-হেন লোকের আবাল্য পরিচয়টা আমার নিজ এবং পাড়াতুতো নাতি-নাতনীরা বিশ্বাসই করে না। তোমার ঐ গল্পটাতে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তোমার ঐ সব ক্ষুদে ভক্তরা—আমার সঙ্গে তোমার পরিচয়ের সুযোগে সশরীরে স্থূল শরীরে তোমার দর্শনের ভীষণ অভিলাষী।

জানি না এখনও মুক্ত-আরামে তুমি মুক্তারামে বিরাজ করছ কিনা। তোমার জবাব পেলে আমার এই নাতিবৃহৎ পরিবার নিয়ে তোমার ওখানে গিয়ে হাজির হব একদিন—'

চিঠির মাথায় ডায়মণ্ড হারবার রোডের ওপরেই কাছাকাছি একটা জায়গার ঠিকানা।

চিঠিটা পড়ে আমার মনে হলো, আমি কখন কলকাতায়, কখন পাটনায়, কখন বা ঘাটশিলায় তার যখন কোন ঠিক-ঠিকানা নেই, তখন সপরিবার শ্রীতারাপদকে বিড়ম্বিত না করে বরং তার ঠিকানায় গিয়ে হানা দেওয়াটাই ঠিক হবে।

তাছাড়া, চক্রবরতিরা কনজুষ হয়, কে না জানে! অবশ্যি, চকরবরতিদের ভেতর যাঁরা রাজতুল্য সেই রাজচক্রবর্তীরা কেমন হয়ে থাকেন জানি না, তাঁদের কথা নিশ্চয়ই

আলাদা। তাঁদের হৃদয় আর পকেট দুই-ই হয়তো বেশ দরাজ হবে। তবে আমি খোদ আমাকে তো জানি, খোদার ওপর খোদকারি-করা আমার আত্মানং বিদ্ধি হয়ে গেছে, তাই এই বাজারে নিজেকে বেশি করে আর বিদ্ধ করতে চাই না। ভেবে দেখলাম সেই নাতিবৃহৎ পরিবারের আতিথ্য করতে আমায় যতখানি আরাম থেকে বিমুক্ত হতে হবে, তার চেয়ে আগে-ভাগে আমিই যদি তাদের ঠিকানায় যাই তাহলে তাদের ঘরে এবং ঘাড়ে গোটাকতক সন্দেশ বসিয়ে আসতে পারি। তাতেই আমার লাভ বরং, অন্ততঃ কোনই লোকসান নেই।

চলে গেলাম পুতুলদের বাড়ি। বললাম, 'চ, তোদের গাড়ি করে ডায়মণ্ড হারবার থেকে একটু ঘুরে আসবি চল। শহরতলীর শোভা দেখে আসা যাবে।'

'শহরের বাইরে যাবে তুমি? বল কি গো?' পুতুল যেন হতবাক, 'তুমি না প্রকৃতির ওপর হাড়ে-হাড়ে চটা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একদম নাকি তোমার সহ্য হয় না? তোমার এমন বিমতি হলো যে হঠাৎ?'

'প্রকৃতির প্রতি হাড়ে চটা—আমি? কে বললে? সে হলো গে অচলা প্রকৃতি। যে প্রকৃতি নড়ে-চড়ে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়, যেমন গাছ-পালা পাহাড় -পর্বত ইত্যাদি পদার্থ জাতীয় এই সব। যাদের রূপ একটুখানি দেখলেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতির লীলা কি সেইখানেই শেষ নাকি? সচলা প্রকৃতি নেই? তাদের প্রতি তো ভাই আমার অচলা ভক্তি। কবির প্রতিভার ন্যায় মুহূর্তে মুহূর্তে যার রূপের নব নবোন্মেষ সেই সব অপদার্থ প্রকৃতির প্রতি আমার টান তুই কখনো কিছু কম দেখেছিস?'

'কিন্তু অ্যাতো জায়গা থাকতে হঠাৎ ডায়মণ্ড হারবার কেন দাদা?' ইতু শুধোয়, 'কলকাতার আর কোনদিকে কি কোন শহরতলী নেইকো?'

'আমার এক বাল্যবন্ধুর খবর পেয়েছি। তার বাড়ি যাব।' চিঠিখানা দেখালাম তাদের।

'বাল্যবন্ধুর কাছে কেউ আবার যায় নাকি কখনো?' ইতু দ্বিরুক্তি করে।

'সে বন্ধুত্ব তো বাল্যকালেই খতম হয়ে যায়।'

'তার মানে?'

'তোমার বাল্যবন্ধুর কাছে যাবার আমাদের উৎসাহ হয় না।' সে ব্যক্ত করে, 'সে তো তোমার বয়সীই হবে প্রায়। তার কাছে গিয়ে আমাদের লাভ?'

'আরে, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দ্যাখো তাই, পেলেও পাইতে পার লুকনো রতন। কে বলেছিল একথা?' আমি জানতে চাই।

'আমি বলিনি।' পুতুল বলে।

'আমি কাউকে এমনধারা কথা বলতে শুনিনি কখনো।' ইতু জানায়।

'কী করে শুনবি! তোদের কালে তো পাঠ্য-বই পাল্টে গেছে। ইস্কুলে কি পদ্যপাঠ পড়ায় আর—জানবি কী করে! আমরা পড়েছি ইস্কুলে। ঈশ্বর গুপ্ত কি মদনমোহন তর্কালঙ্কার এদের কেউ একজন বলে থাকবেন। বিদ্যাসাগর মশাইও হতে পারেন।'

নিজের বিদ্যার বহর শহরৎ করি।

'তোমার লঙ্কার খবরে আমাদের কাজ নেই।' ইতুর সাফ জবাব। —'সাগরের খবরও চাইনে।'

তখন বাধ্য হয়ে আমি গুপ্তকথার সহজ ব্যাখ্যায় চলে আসি—'মানে হচ্ছে কি, বিধাতা এই দুনিয়ায় ধানে-চালে মিশিয়ে দিয়েছেন। তোমাকে একটু কষ্ট করে সেটা বেছে নিতে হবে কেবল। তুই সেখানে একটা আধবুড়ো লোক আছে বলে ঘাবড়াচ্ছিস, ভাবছিস যে গিয়ে কী লাভ হবে। কিন্তু তার পেছনে এই নাতিবৃহৎ পরিবারটি রয়েছে, বৃহৎ বৃহৎ নাতিও রয়ে গেছে নিশ্চয়—সেদিকটা তো নজরে পড়ছে না তোদের।'

বলে দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি নিজেকেই উদাহরণ-স্থল করি, 'আগে তো আমি ছেলেদের গল্প লিখতাম কেবল। তাই ছেলেরাই গায়ে পড়ে মিশতে আসত আমার সঙ্গে। তাদের সঙ্গেই আলাপটা হতো প্রথম। তারপর ভাব জমলে তাদের বাড়ি গেলে মেয়েদের দেখা পেতাম না কি? যেমন বোনান্তরালে ভাইরা থাকে তেমনি ভাইরাস্-এর পেছনে বোন। বিধাতার এই নিয়ম। ঘোড়া ডিঙিয়ে কি ঘাস খাওয়া যায় কখনো? এই তোদের বেলাই দ্যাখ্ না। প্রথমে তো তোদের দাদার সঙ্গেই ভাব হয়েছিল আমার। গোরাই আমায় ল্যাজে বেঁধে ঘোরাত গোড়ায়। তারপরে তো তোদের সঙ্গে মিশলাম। কিন্তু গোড়ায় তার সঙ্গে ভাব না হলে কি তোদের আর পাত্তা পেতাম কোনদিন! তারপরে যখন তোদের সঙ্গে ভাব হলো, তারপর থেকে তোদের সঙ্গেই ঘুরছি তো! গোরাকে নিয়ে কি সিনেমায় রেস্তরাঁয় যাচ্ছি আর? আর, গোরাই কি আমার সঙ্গে ঘুরছে আরো? সে তো এখন সবিতার সঙ্গে...'

'হয়েছে, হয়েছে! বুঝতে পেরেছি। তোমায় আর ব্যাখ্যানা করতে হবে না।'

ইতু আর পুতুলকে নিয়ে ওদের গাড়ি করে ডায়মণ্ড হারবার পাড়ি দেওয়া হলো।

অকুস্থলে পৌঁছে দেখা গেল, সেখানে এক চায়ের দোকান—'নটবর কেবিন'...রাস্তার ঠিক ওপরেই—চাতকদের অপেক্ষায়।

চৌরাস্তার মাথার ওপর দোকানটা—কোনদিকে যাই এখন?

'ওই চা-ওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও না কেন?' বাতলালো ইতু। 'এখানকার হদিশ ও-ই তো ভাল দিতে পারবে।'

তা বটে। চায়ের দোকানে সবাইকে আসতে হয়। ওখানেই সব খবর, সবার খবর মেলে।

নামলাম গাড়ির থেকে। শুধালাম গিয়ে দোকানীকে।

অশীতিপর এক ভদ্রলোক।

ঠিক সময়ে এসেছিলাম, ভাগ্যিস্। এই শীতের পর আর ওঁর দেখা মিলত কিনা সন্দেহ।

'কার ঠিকানা চান?' ঘাড় নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন।

'তারাপদবাবু!' এইখানেই কোথাও থাকেন।' আমি জানালাম।

'ও! তারাপদবাবু!' বলে বৃদ্ধটি যেন কেমন গুম হয়ে গেলেন। আর কোন কথাটি নেই তাঁর।

'তুমি আর লোক পেলে না—ওই বুড়োর কাছে জানতে গেলে।' ইতু ফিসফিস করে, 'একটা বাচ্চা-টাচ্চা কারো কাছে জানতে হয় বরং!'

'বাচ্চারা কি বয়স্ক লোকের খোঁজ রাখে নাকি? ধার ধারে বয়সীদের? উনি সাবেক লোক, উনি বলতে পারবেন বরং।' বলে আমি ভদ্রলোককে উস্‌কে দিলাম আবার: 'প্রভাত-কুটিরটা এখানে কোথায় বলতে পারেন?'

'প্রভাত-কুটির, ও!' বলে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন আবার।—'ও! সেই প্রভাত-কুটির।'

'হ্যাঁ, তার হদিশটা বাতলাতে পারেন আমাদের?'

'কার হদিশ?'

'প্রভাত-কুটির। তারাপদবাবুরা থাকেন যেখানে।

'অ! তাঁরা নতুন এসেছেন বুঝি?'

'না, না। গত যুদ্ধের সময় থেকেই আছেন মনে হয়।'

'গত যুদ্ধের সময় থেকে?'

'হ্যাঁ, তাই হবে।' সায় দিই আমি।

'তাহলে ঠিক হয়েছে। গত যুদ্ধের সময় থেকে।' আবার তিনি ঘাড় নাড়েন, 'হ্যাঁ, তারাপদবাবুই বটেন। আমরা এখনো তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। তবে ওই নাম বটে।'

'তাঁবা এখন কোথায় আছেন সেইটে জানতে চাইছি।' আমি বলি।

'প্রভাত-কুটিরেই আছেন বটে। বেশিদিনের নয় বাড়িটা। হালেরই বলতে হয়। সন তেরোশো তিন সালে তৈরি। বাড়ির মাথাতেই খোদাই করা আছে তারিখটা। প্রভাত-কুটিব! সেইখানেই তাঁরা থাকেন।'

বলে তিনি পিছন ফিরতেই আমরা তাঁকে ফিরে ডাকলাম, 'আজ্ঞে, দযা করে তাঁব বাডির পাত্তাটা যদি জানাতেন আমাদের।... প্রভাত-কুটিব যেতে হলে...'

'প্রভাত-কুটিরে যেতে চান?' তিনি ফিরে দাঁড়ালেন ফের: 'এই পাশেব বাস্তাটা ধরে চলে যান সোজা। ইমদাদ আলির বাডিটা পেরুলেই...'

'তা, সেই আলি সাহেবের বাড়িটা কোন্ জায়গায়?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করতে হলো আবার।

'আলিসাহেব? ও, ইমদাদ আলি!..' বলে বৃদ্ধলোকটি এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন—'তিনি আব সেখানে থাকেন না। তাঁর সঙ্গে যদি দেখা করতে এসে থাকেন তো মিছে বববাদ করলেন সময়টা। ছ'বছর হবে তিনি কবরখানায়। তাঁকে পেতে হলে আরো ঢেব আগে আসতে হতো।'

তখন আমাদের বলতে হলো যে, না, আমরা ইমদাদ আলিকে চাইনে, কবরখানায় যাবারও ইচ্ছা নেই আমাদের, প্রভাত-কুটিরেই যেতে চাই আমরা।

'ও! ...তা, যদি প্রভাত-কুটিরেই যেতে চান তো এই পথ ধরে সোজা চলে যান, খানিকটা গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরবেন—তারপর আবার খানিকটা গিয়ে ফের আবার বাঁ

দিকে—সেই মোড়ের ওপরের বাড়িটাই হচ্ছে যেখানে ইমদাদ মিঞা থাকতেন। বললাম তো আমি।'

'মোড়ের ওপরেই?' আমি আওড়ালাম। 'তারপর বাঁ দিকে টার্ন্ নিতে হবে?'

'হ্যাঁ, যেখানে সেই সাইনবোর্ডটা ছিল।' তিনি জানালেন ঃ 'তার থেকে আর খানিকটা গেলেই...না, ভুল হবার কিছু নেই।'

'সেই সাইনবোর্ড-বরাবর যাব বলছেন?'

'সেই সাইনবোর্ড কি আর সেখানে আছে মশাই? সেই আশ্বিনের ঝড়ে উড়ে গেছে কোন্‌কালে।'

'যাক্‌গে, সেই স্বর্গত সাইনবোর্ডের পাশ দিয়ে খানিকটা গেলে তারপর?...'

'ডান দিকে লিচুগাছটা রেখে ফের আবার বাঁ দিকে ঘুরতে হবে।'

'লিচু গাছটা ডান দিকে পড়বে তো?' জেনে আমার উৎসাহ হয়। লিচুগাছ চিনতে ভুল হবে না আমার কিছুতেই—কত ওদের ডালে ডালে ঘুরেছি লিচু ফলার ঋতুতে। পেয়ারাগাছ না হয়েও সে আমার পেয়ারের গাছ। বছরের এ সময়টায় গাছটা একটু মাফলেষু হলেও পুরনো পরিচয় বিস্মৃত হবার নয়। চিনতে পারব ঠিক।

'পড়ত, গাছটা সেখানে থাকত যদি।' বলে তিনি আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন—'সেটাও সেই ঝড়ে পড়ে গেছে কিনা! তারপর কারা এসে তার ডাল-পালা কেটে-কুটে নিয়ে চলে গেছে কবে যেন। চিহ্নমাত্রও নেই এখন।'

'লিচুগাছটাও নেই!' শুনে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল আমারও।

'না। তবে গাছের গুঁড়িটা আছে। পাশ দিয়ে যেতে নজরে পড়বে। ভুল হবার যো নেই।'

'বেশ। তারপর সেখান থেকে বাঁ ধারে বাঁক নেব আবার?'

গোড়াগুড়ি সোজা বলেই মনে হচ্ছে পথটা—এই গোড়ার থেকে ওই গুঁড়ি পর্যন্ত অন্ততঃ।

'বাঁ ধারেই বেঁকেছে রাস্তাটা। তারপর সেখান থেকে সোজা চলে যাবেন সেই শহীদ-স্তম্ভ অব্দি। পাড়ার ছেলেরা কোথ্থেকে একটু উঁচু পাথর নিয়ে এসে খাড়া করেছিল সেখানে। বিয়াল্লিশের শহীদদের স্মৃতিচিহ্ন।'

'উঁচু পাথরের শহীদ-স্তম্ভ?' আমি ঘাড় নাড়ি—'না, এবার আর ভুল হবার কিছু নেই।'

'সেই শহীদ-স্তম্ভটাই কি আছে নাকি আর? লরির ধাক্কায় কাত হয়ে পড়েছিল কবে। ও-পাড়ার বনমালী মুদি সেটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার মুদিখানার পৈঠা বানিয়েছে।'

শহীদ-স্তম্ভের কথায় ইতু যাও বা একটু উৎফুল্ল হয়েছিল, বনমালীর কাণ্ডে মুদিত হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। প্রস্তরীভূত শহীদদের পরিণামে—পাদপীঠে এই পরিণতিতে আমিও স্তম্ভিত।—'সেই পাথরটাও নেই আর!'

'না। তবে সেই জায়গাটা আছে। চেনবার জো আছে কি না জানি না, তবে সেইখানটা

ছেড়ে বাঁ ধারে একটু গেলেই আপনার সেই প্রভাত-কুটির। সোজা রাস্তা, ভুল হবার কিছু নেই।'

সোজা বলে তো বাতলালেন নটবরবাবু। কিন্তু যাওয়া মোটেই সোজা না, এমনি করে মোড় ঘুরে ঘুরে—এইভাবে বাঁ ধারে চক্কর নিতে নিতে যাওয়া কোনো চক্করবরতির পক্ষেও সহজ নয়। যাই হোক, ঘুরপাক খেতে খেতে এগুলাম।

'ভালো লোক পাকড়েছিলে দাদা।' বলল পুতুল।

'লোকটার বয়সের গাছ-পাথর নেই!' মুখ ব্যাঁকাল ইতু। 'বাব্‌বাঃ!'

মিনিট পাঁচেক বাদে একটা মোড়ে এসে পৌঁছলাম, মনে হলো সেই বাড়িটার সামনেই এসে পড়েছি, আলিসাহেব যে বাড়িতে মরেছেন, তারপর সেখান থেকে বাঁ মোড় ধরে খানিক এগুতেই সেই যেখানে সেই সাইনবোর্ডটা ছিল সে জায়গাটা পেরুলাম মনে হয়, তার খানিক বাদে বিয়াল্লিশের শহীদরা যেখানে দ্বিতীয়বার শহীদ হয়েছিলেন সেখানটাও পেরিয়ে গেল বোধ করি, ইতিমধ্যে কোনো ফাঁকে অন্তর্হিত সেই লিচুগাছটাও ছাড়িয়েছি সম্ভবতঃ; তারপর আরেক চক্করের পর সোজা এসে পড়লাম বড় রাস্তায় আবার। ডায়মণ্ড হারবার রোডে। সেই নটবর কেবিনের সামনেই সটান।

আমাদের দেখে নটবরবাবু নড়বড় করে এগুচ্ছেন দেখা গেল।

কিন্তু আমরা আর গাড়ি থামালাম না। নটবরকে নট করে দিয়ে কলকাতার পাড়ি ধরলাম সোজা।

খট্টাঙ্গপুরাণ

বহুদিন পরে আবার ভাইদুটিকে দেখা গেল। আবির্ভাবের মতই দেখতে পেলাম। গোলদিঘী কফি হাউসের কোণ ঘেঁসে বসে।

আমিও ওদের কোল ঘেঁসে পাশের টেবিলে গিয়ে বসেছি। আমাকে দেখে হর্ষবর্ধন—ঠিক হর্ষধ্বনি নয়,—প্রায় অর্ধপরিচিতের মতই অভ্যর্থনা করল—'এই যে!'

বলেই আবার ভাইয়ের সঙ্গে মশগুল হয়ে গেল খোস গল্পে।

অনেকদিন পরে দেখা। মনে হলো, হয়তো আমায় চিনতে পারেনি ঠিক। কিংবা হয়তো বা হাড়েহাড়ে চিনেই—? নইলে শুধু এই ভাষণ—এই শুষ্ক সম্ভাষণ—এত কম ভাষণ নিতান্তই হর্ষবর্ধন-বিরুদ্ধ, কিন্তু ও নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে নিজের কফির পেয়ালায় মন দিলাম। আর কান দিলাম ওদের কথায়...

'বুঝলি গোবরা, এ রকমের আরেকটা কফি হাউস আছে কলকাতায় চৌরঙ্গীর কাছে। কিন্তু সাবধান, সেখানেঁ যেন ভুলেও কখনো যাস না—।'

'কেন, যাব না কেন?' কানখাড়াকরা ভাই মাথা চাড়া দিয়েছে: 'কী হয় গেলে?'

'গেছিস কি মরেছিস। এ কফি হাউস তো ভাল। এখানে খালি বাঙালী। বাঙালী ছেলে মেয়েরাই আসে। নিতান্ত নিরাপদ। কিন্তু সেখানে বাবা, যা মারাত্মক!'

বলে ভারাত্মক ভাবের চোখখানা তিনি ভাইয়ের ওপর রাখেন।

'মারাত্মকটা কিসে শুনি ?'

'মেমরা আসে সেখানে।' হর্ষবর্ধন বিশদ হন—'মেমরা দেখা দেয়।'

'দিলেই বা। মেম তো আর বাঘ নয় যে গিলে ফেলবে !'

'বাঘেরা বেশি না গিলেই হজম করতে পারে। তবে আর বলছি কী !...সেদিন একটা মেমের পাল্লায় পড়েছিলাম রে ! ধরেছিলো আমায়।'

'কী করেছিলে তুমি ?'

'কিছু না। সবেমাত্র সেখানে ঢুকে একটা খালি জায়গা পেয়ে বসেছি। অতো বড় হলটা গিসগিস করছে মানুষে। বাঙালী, পাঞ্জাবী, চীনেম্যান, সাহেব মেমে ভর্তি। হলের মাঝামাঝি একটা থাম ঘেঁষে দুটি মাত্র চেয়ার খালি একখানা ছোট্ট টেবিল ঘিরে। তারই একটিতে গিয়ে বসেছি আমি। একটু পরেই একটা মেম এসে আমার সামনে চেয়ারটায় বসলো।'

'ও এই ধরা ! সে তোমাকে ধরবার জন্যে নয় গো দাদা, বসবার আর জায়গা ছিল না বলেই--' বলতে যায় গোবর্ধন। নিজের দাদাকে সে ধর্তব্যের মধ্যে জ্ঞান করে না।

'শোন্ না আগে। সবটা শোন্ তো', হর্ষবর্ধন বাধা দেন—'মেমটা বসেই না আমাকে বললো—'গুড্ ইভিনিং মিষ্টার।' আমি তার জবাব দিলাম—'গুড নাইট মিসেস্।'

'তুমি গুড নাইট বলতে গেলে কেন ? গুড নাইট তো বলে লোকে বিদায় নেবার সময়।'

'তখন কি আর ইভিনিং ছিল নাকি ? সন্ধ্যে উতরে গেছে কতক্ষণ ! আটটা বাজে প্রায়। আমি শুধু মেমটার ভুল শুধরে দিয়েছি। কিন্তু বলতে কি, আমি অবাক হয়ে গেছি বেশ। মেমরাও ইংরাজিতে ভুল করে তাহলে ? আশ্চর্য !'

'তারপর ? তারপর ?'

'তারপর মেমটা কী যেন বলল ইংরাজিতে, তার একটা কথাও যদি আমি বুঝতে পেরেছি— !'

'নিশ্চয় খুব ভুল ইংরেজি ?'

'ক্যা জানে ! তারপরে কী করলো মেয়েটা। তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা নোটবই বার করলো ; আর ছোট্ট একটুকরো পেনসিল। কী যেন লিখলো কিছুক্ষণ ধরে, তারপর সেটা দেখালো আমায়।'

'তুমি পড়তে পারলে ?'

'পারবো না কেন, ইংরেজি তো নয়। পেয়ালা।'

'পেয়ালা ? পেয়ালা আবার কোনদেশী ভাষা দাদা ?'

'এই পেয়ালারে বোকা !' হর্ষবর্ধন কফির পাত্রটা তুলে ধরেন—'এই বাংলা কাপ ডিশ। এই না এঁকে মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। যাকে বলে সপ্রশ্ন নেত্রে।'

'তুমি কী করলে ?'

'আমি বুঝলাম মেমটা এক পেয়ালা কফি খেতে চাইছে। আমিও আর দ্বিরুক্তি না করে বেয়ারাকে কফি আনতে বললাম—দু'পাত্তর আমাদের দু'জনের জন্য।'

'মেমটা দেখতে কেমন?'

'মেম-মেম। আবার কেমন! মেমরা যেমন হয়ে থাকে। তবে বয়েস বেশি নয়। পঁচিশ কি ছাব্বিশ। বাঙালীর মেয়ের মত অত সুন্দর না হলেও দেখতে বেশ ভালোই।'

'তাই বলো।' গোবর্ধন সমঝদারের মত ঘাড় নাড়ে, 'প্রেম করবার মত মেম? তা বলতে হয়।'

'কী যে বলিস! তোর বৌদি যদি জানতে পারে। তারপর শোন। আমি ভাবলাম একটা মেয়েকে কি শুধু শুধু কফি খাওয়ানোটা ঠিক হবে? সেটা যেন কেমন দেখায়। তাই ওর খাতাটা নিয়ে একটা পাতায় টোসটের মতন কতকগুলো আঁকলুম। এঁকে দেখালাম ওকে! দেখে সে বল্‌লো—ইয়েস্ ইয়েস্। থ্যাংকু।'

'ইয়েস্ ইয়েস্ মানে?' জানতে চায় গোবরা।

'মানে তুই যা করেছিস এখন। হাঁ', দাদা জানায়—'ইয়েস্, মানে জানিসনে বোকা? তারি ডবোল, বুঝেছিস এখন? আর থ্যাংকু মানে—'

'জানি জানি। আর বলতে হবে না। তাহলে মেমটা তোমার কথায় হাঁ হাঁ করে উঠলো বলো?'

'করবে না? তারপরে মেমটা করলো কী, একজোড়া ডিম এঁকে দেখালো আমায়। বুঝলাম যে টোসটের সঙ্গে ডিমসেদ্ধ খেতে চাইছে। তাও আনতে বললাম বেয়ারাকে।'

'বাঃ বেশ তো!' বলে গোবরা সুরুৎ করে জিভের ঝোল টানে।

'মেমের কথা শুনে যে তোর জিভ দিয়ে জল পড়ছে দেখছি।'

'মেম নয়! মেমলেটের কথা ভেবে দাদা। মেমটা মেমলেট খেতে চাইল না? মেমলেট বা মামলেট যাই বলো!'

'ওর ডিম পাড়বার পর তারপর আমি খাতাটা নিলাম। নিয়ে এক প্লেট কাজু বাদাম আঁকলাম। আর ও আঁকলো কতকগুলো চ্যাপটা চ্যাপটা কী যেন। মনে হলো পাঁপড় ভাজা। কিন্তু বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করায় সে বললো পাঁপড় ভাজা সেখানে মেলে না। আলুভাজা হতে পারে। সে আলুভাজা নিয়ে এলো। আর কাজু বাদামও। আলুভাজা খেয়ে মেয়েটাকে খুশি দেখে তখন বুঝলাম যে সে আলুভাজাই চেয়েছিল।'

'আলুভাজার আর পাঁপড় ভাজার কি এক রকম চেহারা নাকি?' গোবরা নিখুঁত চিত্রসমালোচকের ন্যায় খুঁত খুঁত করে।

'তা কি হয় রে? কিন্তু ছবি দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। এই যে মশায়, আপনাকে বলছি'—হর্ষবর্ধন সম্বোধন করেন আমাকে—'আঁকার বিষয়ে আপনি কিছু বলুন তো, আঁকতে গেলে এমনটা কেন হয়? পাঁপড় ভাজার সঙ্গে আলুভাজা এমন মিলে যায় কেন?'

'আঁকের বেলায যেমন এক এক সময মিলে যায না ? তেমনি আব কি! তেমনি আঁকের মতই অনেক সময় মেলেও না আবাব! ভালো আঁকিয়ে হলে তবেই মেলাতে পারে। এমন ইঁদুব আঁকবে যে মনে হবে যেন হাতি। আবাব উটপাখিকে মনে হবে যেন একটা মুর্গি। এইখানেই আঁকার বাহাদুরি।'

'কী করে তা হযে থাকে ?' দুই ভাই একসঙ্গে শুধায। দু'জনেব মুখে ডবোল ইয়েস দেখা দেয় তখন।

'ব্লকেব কেরামতি [illegible]—কিছুই নয। আঁকিযে তো একটুকবো কাগজে ছোট্ট একটুখানি আঁকে। যাব [illegible] তাবাই হচ্ছে ওস্তাদ। তাবাই মাথা খাটিয়ে দরকাব মাফিক সেটাকে বাড়িযে ক[illegible] যাব যে ছবিটি চাই তার মনেব মতন বানিযে দেয। ধরুন, আপনি লিচু এঁকেছেন [illegible] আপনাব দরকাব কাঁঠালেব। ব্লকমেকাব সেই লিচুকেই বড করে—বাড়িযে কাঁঠাল বান[illegible] ব্লকে আনতে পাবে। একই আঁকাকে ছোট কবলেই লিচু আব বড়ো কবলেই কাঁঠাল।'

'ছোট কবলেই লিচু আব বড়ো ক[illegible]লেই কাঠাল ? বাবে!—'গোবরা অবাক হয।

'তাহলে আমি যে কাজু বাদাম এঁকেছিলাম, ব্লকওযালা ইচ্ছে কবলেই সেই ছবিব থেকেই কুমড়োর ঝুড়ি কবতে পাবতো ?'

'পাবতোই তো।'

'যাকগে।' আমাদেব শিল্পতান্ত্রিক [illegible] গোবর্ধন বাধা দেয়।—'তাবপব কী হলো বলো না দাদা।'

'তাবপব অনেক কিছুই খেলুম আমবা—একটাও কথা না কযে—শুধু কেবল ছবি চালিযে। প্রায টাকা পনেবোব মতো খাওযা হলো। তাবপব বেযাবা বিল নিযে এলে আমি একটা একশো টাকাব নোট দিযেছি আব সে ভাঙ্গানি আনতে গেছে এমন সময় দেখলাম কী —একমনে মেযেটা কী যেন আঁকছে তখনো।'

'তোমাব চেহারা বুঝি ?' গোববাব মুখে বেযাড়া হাসি দেখা দেয়।

'এই চেহারা আঁকা কোনো মেযেব কম্মো নয়—ছোট্ট একটু খাতাব পাতায। তোব মত রোগা পাতলা হলেও হতো হযতো। আঁকা শেষ কবে ছবিখানি সে আমাব হাতে দিলো। দিয়ে একটুখানি—যাকে বলে সলজ্জ হাসি—হাসলো।'

'ওর নিজের ছবি বুঝি ?'

'না, দেখলাম একটা খাট এঁকেছে সে।'

'খাট! খাট কেন! খাট কি কোন খাবার জিনিস ? শোবার তো জানি!' গোবরা অবাক হয়,—'ও, বুঝেছি, তোমাকে খাটাবার মতলব ছিল মেয়েটার।'

'আমি কি মশারি যে আমাকে খাটাবে। অত্তো সোজা নয়।' হর্ষবর্ধন আপত্তি করেন। 'কিন্তু কেন যে সে খাট আঁকলো তাই আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম।'

'কিরকম খাট ? দুগ্ধফেননিভ ?' আমি শুধাই।

'বেশ বড়ো খাট। জোড়া খাট যেমন হয়ে থাকে। কিন্তু সেজন্যে নয়, আমার তাক লাগলো এই ভেবে যে, আমি যে খাটের জন্মদাতা, কাঠের ব্যবসা যে আমাদের, তা

সেই মেয়েটা টের পেল কী করে? এর রহস্য ভাই আমি এখনো অব্দি বুঝতে পারিনি। 'থ হয়ে রয়েছি সেই থেকে—রহস্যের থই না পেয়ে, বুঝলেন মশাই?'

নামডাকের বহর

কলেজে উঠেই প্রিসিলা এসে ধরল আমায় একদিন, 'মেজমামা, একটা টাকা রোজগারের উপায় করে দাও।'

'টাকা রোজগার?' ওর কথায় আমি অবাক হয়ে যাই; 'তোর আবার টাকা রোজগারের দরকার কী! রোজকার খরচ রোজ রোজ মিটে গেলেই তো হলো। তা কি তোর মিটছে না আর?'

'তাহলে কি আর আমি বলি তোমায়।' তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

'খাওয়া পরার ধান্দাতেই মানুষ রোজগার করতে বেরোয়।' আমি বলিঃ 'তোর তো সে-ধান্দা নেইকো। বাড়িতে খাস, খাস বাড়িতে বাস, আমার মতন বাসায় না। পেটে ভাত, মাথায় ছাতের ভাবনা নেইকো তোর। আমার মতো মেসখর্চা যোগাতে হয় না তোকে। আর মা মাসির দৌলতে শাড়ি ব্লাউজ তো এনতারই পাচ্ছিস—পরারও তোর কোনো ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। তাহলে?'

'বাড়িব খাওয়া খেলেই হয়ে গেল। বাইরে খেতে হয় না বুঝি?'

'সেই জন্যেই তো তোকে কেএডুকেশনের কলেজে অনেক কাটখড় পুড়িয়ে ভর্তি করে দিলাম। আবার কী চাই? বাইরেব খাবাব ভাবনা তো মিটেই গেল তক্ষুনি।'

'কী করে শুনি?'

'সহপাঠী বন্ধুরাই তো খাওয়াবে তারপর। তোর মতন স্মার্ট মেয়ে কি পড়তে পায় নাকি? মানে, কলেজে পড়তেই পারে কেবল? তাকে উড়তেও হবে না সেই সঙ্গে? উড়তির সঙ্গে ফুর্তি—ফুর্তির সঙ্গে উড়তি। সহপাঠীরাই তো এটা ওটা সেটা খাওয়াবে—যা তুই খেতে চাস। কফি হাউসে, রেস্তরাঁয় কি যেখানে তোর প্রাণ চায়।'

'বারে! খেলেই হলো বুঝি? খাওয়াতে হবে না ছেলেদের? তাহলে তাদের কাছে মান থাকবে কেন?'

'মান রাখার দায় নয় তোদের।' আমি জানাইঃ 'মুখরক্ষা হলেই হলো।'

'মুখরক্ষা?'

'তারা কি তোর কাছে তুচ্ছ জিনিস খেতে চাইবে রে? যেসব খাবার পয়সা ফেললেই কিনে খাওয়া যায় তোর কাছ থেকে তারা তা খাবে কেন? বরং এমন জিনিসই খেতে চাইবে যা নাকি পয়সা দিয়ে মেলে না, পেলে ওমনি পাওয়া যায়...আর খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খাওয়ানো হয়ে যায় ওমনি। হ্যাঁ, সে-খাবার তো পরের থেকে খেতে হয়রে, পরীর থেকেই খাবার।' উপযুক্ত ভাগনির কাছে এর চেয়ে বেশি পরিষ্কার করে বলার আমি প্রয়োজন বোধ করি না।

'যাও! তোমার যতো সব আজে বাজে কথা। আমি চাইছি পার্ট টাইমের কোন কাজ-টাজ করে কিছু টাকা উপায় করতে...আমার পার্সোনাল খরচ মেটানোর জন্যে। আর তুমি কিনা...বড় হয়েছি না? চিরকাল কেন মা বাবার গলগ্রহ হয়ে থাকবো বলো? বড় হইনি কি? কলেজে পড়ছিনে? তুমি একটা সেলফ্‌মেড ম্যান, তাই তোমার কাছে পরামর্শ চাইতে এলাম আর তুমি কিনা যতো...'বলে প্রিসিলা ফোঁস করে উঠল।

'আমি সেলফ্‌মেড ম্যান!' আমার অবাক হবার পালা এবার।

'না? বলোনি যে, তুমি বারো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে কলকাতায় খবর কাগজ বেচে বড় হয়েছ? বলোনি তুমি?'

'বড়ো হয়েচি? বয়সে বড় কিন্তু কার্যত নয়। তখন খবর কাগজ বেচে দিনগুজরান করতাম এখনও সেই খবর কাগজের দৌলতে বেঁচে রয়েছি—এই মাত্র। তা, তুইও কি সেই খবর কাগজ বেচতেই চাস নাকি?'

কথাটা আমার কেমনতরো লাগে যেন। শাস্তরে নরানাং মাতুলক্রম বলে বটে, ভাগনেরা মামার মতই হয়ে থাকে নাকি, কিন্তু ভাগনেরা মামার চরিত্রের ভাগ পেলেও ভাগনিদের ভাগ্যে তেমনতরো দুর্ঘটনা ঘটে বলে আমি শুনিনি কখনো। বরাতের ফেরে এককালে কাগজ ফেরি করতে হয়েছে বটে, সেজন্যে আমি দুঃখিত নই আদপেই, কিন্তু আমার জীবনে সেসব ফের ফিরে আসবে—ভাগ্যের এতখানি ফেরেব্‌বাজি আমি ভাবতেই পারিনে।

'তা কেন? খবরের কাগজ বেচতে যাব কেন?' সে বলেঃ 'আমি ভাবছি গোয়েন্দাগিরি করলে কেমন হয়?'

'গোয়েন্দাগিরি করবি! তুই?' বিস্ময়ে থই পাই না।

'মানে, অ্যামেচার গোয়েন্দা আর কি! এই তোমার বিমল কুমাব কি ব্যোমকেশের মতই।' দুম্ করে সে যেন আমার সামনে একটা বোমা ফাটায়। 'সখের গোয়েন্দাগিরিতেও তো পয়সা পাওয়া যায়। যায় না?'

'অ্যাঁ? তুই করবি গোয়েন্দাগিরি?' আমার শক্-টাও ব্যক্ত না হয়ে পারে নাঃ 'গোয়েন্দাগিরির জানিস কী তুই?'

'সবকিছু। বিস্তর পড়াশুনা করেছি এই বিষয়ে।'

'বলিস কিরে? কোথায় পড়লি? কোথায় শেখানো হয় এই গোয়েন্দাগিরি?' আমি বিস্মিত হইঃ 'কই, আমি তো এর কিছু শুনিনি—জানিনে।'

'কোথাও শেখায় না। বই পড়ে নিজে নিজে শিখতে হয়। আমি লাইব্রেরি থেকে বইটই আনিয়ে ঘরে বসে রপ্ত করলাম তো! পাঁচকড়ি দে-র থেকে শুরু করেছি, তারপর রবার্ট ব্লেক সিরিজ সারা করলাম, তারপরে দীনেন্দ্রকুমার রায় থেকে হেমেন্দ্রকুমার রায়ে চলে এলাম, বিমল কুমারদের সব কীর্তিকাহিনী পড়ার পর ব্যোমকেশে পড়লাম এসে শেষটায়। এমন কি, তোমার ওই নীহার গুপ্ত, গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুকেও বাদ দিইনি।'

'তাহলে তো তুই পাকা গোয়েন্দা হয়ে গেছিস', মানতে হয় আমায়।

'তাহলে এইবার আমায় লাগিয়ে দাও একজায়গায়।' প্রিসিলা বলেঃ 'তোমার তো বিস্তর জায়গায় জানাশোনা...'

'কোথায় যে গোয়েন্দা লাগায় তাই আমি জানিনে, আমি কী লাগাব!' আমি বলিঃ 'বিলেতে বড় বড় স্টোর হাউসে মেয়ে গোয়েন্দা রাখে বলে শুনেছি। সেখানে অনেক মেয়ে খদ্দের সেজে এসে দোকানের মালপত্র সরায়, তাদের ধরার জন্যে তারা গোয়েন্দা রাখে। কিন্তু এখানে তেমনটা রাখে কিনা তা তো আমার জানা নেই ভাই!'

'এখানকার বড় বড় স্টোরে কি চুরি যায় না জিনিস? গোয়েন্দা লাগায় না তারা?'

'কী করে বলব। তুই এক কাজ কর বরং, তুই নিজের থেকেই লেগে যা না কেন? কলকাতার নামকরা কোনো বড় স্টোর বেছে নিয়ে ছদ্মবেশে গিয়ে নিজের থেকেই খদ্দেরদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে থাক। তারপর হাতে নাতে কাউকে ধরতে পারলে বামাল সমেত ম্যানেজারের কাছে নিয়ে ছেড়ে দিবি। তখন নিশ্চয়ই তিনি খুশি হয়ে তোকে মোটা রকম পুরস্কার দেবেন। চাই কি, পুরস্কার স্বরূপ, মাস মাইনেয় গোয়েন্দাগিরির কাজটাও পাকাপাকি পেয়ে যেতে পারিস ওখানেই।'

'এ কথাটা মন্দ বলোনি তুমি।' বলল প্রিসিলাঃ 'তোমার মাথায় বেশ আইডিয়া খ্যালে মেজমামা। সত্যি।'

বলেই সে বেরিয়ে পড়ল—আইডিয়াটাকে আরো ভালো রকম খেলাবার জন্যেই বোধ করি।

কিন্তু আইডিয়াকে যেমন খেলানো যায় তেমনি আইডিয়ারও নিজের একটা খেলা থাকে—সেও আবার নিজের আইডিয়ামাফিক তার খেলোয়াড়কে খেলায় কিনা!

সন্ধ্যেবেলায় প্রায় অশ্রুপ্লুত লোচনেই ফিরে এল প্রিসিলা।

প্রিসিলার আইডিয়া ছিল, কলকাতার নামজাদা বড় স্টোরগুলোর কোন একটায় সে খদ্দেরের ছদ্মবেশে প্রবেশ করবে। আমি অবশ্যি বলেছিলাম যে, খদ্দেরকে কোনো ছদ্মবেশ নিতে হয় না, খদ্দেরের বেশে গেলেই হয়।

'তা জানি। তাহলেও আমি যে সত্যিকারের খদ্দের, কোনো গোয়েন্দা টোয়েন্দা নই সেটা জানাবার জন্যই কেনা-কাটার প্রয়োজন বোঝাতে বড় একটা ব্যাগ সঙ্গে নিয়েছিলাম। আসলে আমি গিয়েছি তো যত সন্দেহজনক চরিত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখতেই, তাহলেও তাদের সন্দেহ যেন ঘুণাক্ষরেও আমার ওপরে না পড়ে—সেই জন্যেই, বুঝলে কিনা মেজমামা? সব লোকের ওপরেই লক্ষ্য রাখব, তাদের গতিবিধিতে নজর থাকবে আমার, আর যেমনি না তাদের কাউকে কোনো জিনিস অলক্ষ্যে সরাতে দেখেছি অমনি গিয়ে হাতে নাতে পাকড়েছি তাকে—আর তার পরেই তাকে সোজা নিয়ে স্টোরের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে হাজির করে দেওয়া—এই তো আমার কাজ? তাই না?...

'কলেজে দুটো ক্লাসের পরে বাকী দুই পিরিয়ডের প্রক্সির ব্যবস্থা করে প্রায় দুটো নাগাদ তো ঢুকলাম গিয়ে সেই স্টোরে। প্রথমেই স্টোরের সব কটি বিভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁটিয়ে দেখলাম। কোথাও ছোটদের পোষাক-আশাক, কোথাও শিশুদের খেলনা-সামগ্রী, কোনোখানে বড়দের শার্ট প্যান্ট ইত্যাদি, কোনখানে স্টেশনারি, কোথাও আবার মেয়েদের প্রসাধনদ্রব্য। বিভাগগুলো সব ঘুরে ঘুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেই দু'ঘণ্টা কেটে গেল, কিন্তু সন্দেহজনক চরিত্রের একজনকেও চোখে পড়ল না আমার। সবাই আসছে, জিনিস

দেখছে কিনছে, দাম ফেলে দিচ্ছে, ক্যাশমেমো আর প্যাকেট নিয়ে চলে যাচ্ছে—অলক্ষ্যে সরাবার মতলব দেখা গেল না কারোই। দু'ঘণ্টা ধরে এইসব দেখেশুনে আমার উৎসাহ প্রায় নিবে যাবার মতন, এমন সময় একটা জাঁদরেল গোছের মহিলাকে দেখতে পেলাম—আমার চেয়েও বড়ো এক ব্যাগ হাতে—সর্বত্র হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।'

'ব্যাগ হাতে মেয়েটিকে দেখবার পরই তুই বেশ ব্যগ্র হয়ে উঠলি বোধ হয়?' আমি শুধাই।

'নিশ্চয়। এত বড়ো ব্যাগ নিয়ে কেউ কি টুকিটাকি জিনিস কিনতে বেরোয় নাকি কখনো? মোটা রকম মাল সরাবার তালেই রয়েছে মেয়েটা—বুঝতে পারলাম এক নজরেই। এতক্ষণে বলতে কি, একটুখানি আশার সঞ্চার হলো আমার।

'মেয়েটা করছিল কি, প্রত্যেক কাউণ্টারে গিয়ে সাজানো জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল, দেখেশুনে আবার রেখে দিতে লাগল যথাস্থানে—একটা জিনিসও নিজের ব্যাগের মধ্যে পাচার করতে দেখলাম না তাকে। তাহলেও আমি তাকে তাকে রইলাম। ফাঁকতালে সরাবার মতলবে রয়েছে—বেশ দামী গোছের কিছু একটা ওর হাতের নাগালে এলেই সরিয়ে ফেলবে—টের পেলাম বেশ। সেই কারণেই নানান জিনিস এইভাবে পরীক্ষা করে দেখবার ওর ছলনা।

'সেও যেখান থেকে যেখানে যাচ্ছে, আমিও একটু দূর থেকে ওর অগোচরে পিছু পিছু রয়েছি ওর। দেখি না কোথায় যায় কী সরায়—কোন জিনিস হাত সাফাই করে।

'দেখা যাক ওর বাছবিচার শেষ পর্যন্ত। আমার কড়া নজর এড়াবার সাধ্য নেই ওর। এতক্ষণে একটা খাঁটি মেয়ে বদমাইস আমার হাতের মুঠোয় এসেছে বাবা! কিছুতেই ওর রেহাই নেই আজ আর।

'মেয়েদের শাড়ি ব্লাউজের ডিপার্টমেণ্ট থেকে বাচ্চাদের পোশাকের ডিপার্টমেণ্টে গেল মেয়েটি। আমিও চলেছি ওর পিছু পিছু। ও যেমন একটা জিনিস তুলে নিয়ে দ্যাখে আমিও আরেকটা তুলে দেখি—ও যে-ধারে যায় আমিও সেইধারে।

'যেতে যেতে যে-ধারটায় সারি সারি সব ওয়াটারপ্রুফ ঝুলছিল তার ভেতরে গিয়ে মেয়েটা যেন হারিয়ে গেল হঠাৎ। এতক্ষণে আমি ওর বিরুদ্ধে একটা প্রুফ পেলাম।'....

'ওয়াটারপ্রুফ?'

'অপরাধীরাই তো গাঢাকা দিয়ে থাকে সাধারণতঃ। তাই না, মেজমামা? ও যদি ক্রুক না হবে তো চোখের উপর থেকে উপে যাবে কেন এমন করে?'

'তা বটে।' সায় দিতে হয় আমায়।

ওয়াটারপ্রুফগুলো যেন ওকে গিলে ফেলল মনে হলো আমার। ওর ভেতরে কী রহস্য আছে পরীক্ষা করার জন্য ঝোলানো বর্ষাতিগুলো নেড়ে চেড়ে দেখতে গেছি আমি, এমন সময়ে আমার পেছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল—হ্যান্ডস্ আপ্।

পেছন ফিরে দেখি ওমা! সেই মেয়েটাই!

আর তার পিস্তলের নল আমার দিকে বাগানো।

'এর মানে?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করি। হাত ফাত না তুলেই।

'মানে এক্ষুনি তুমি বুঝতে পারবে খুকি! তোমাকে ম্যানেজারের কামরায় নিয়ে যাই আগে।' বলল সে। —'টের পাবে তখন।' বলে বেশ শক্ত করে আমায় পাকড়ে ধরে ম্যানেজারের সামনে নিয়ে গিয়ে সে খাড়া করল। এমন খারাপ লাগতে লাগলো আমার যে কী বলবো তোমায়!

'এটা আপনাদের কীরকম ভদ্রতা মশাই?' বললাম আমি ম্যানেজারকেঃ 'এই মেয়েটা কোত্থেকে হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে উঠে এমন করে আমায় পাকড়ে আনল যে এখানে? এর মানে আমি জানতে চাই। আমায় থামিয়ে দিয়ে ম্যানেজার সেই মেয়েটির দিকে চোখ তুলে তাকালেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

আমায় দেখিয়ে সে বললে—'এই মেয়েটাকে আমি প্রায় আড়াইটার সময় আমাদের স্টোরে ঢুকতে দেখেছি। কোনো কিছু কেনাকাটার নাম নেইকো, এঘরে ওঘরে ঘুরঘুর করছে খালি! তখন থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছে, লুকিয়ে লুকিয়ে লক্ষ্য রেখেছি ওর ওপর। তারপর ও করেছে কী শুনুন!...'

'কিচ্ছু করিনি আমি।' প্রতিবাদ করতে হলো আমায়—'আমিই বরং ওই মেয়েটার ওপর নজর রেখেছিলাম। কী করে ও, দেখছিলাম তাই। আপনার স্টোর থেকে মালপত্তর সরাবার মতলব ছিল ওর। আসলে ও হচ্ছে একটা আস্ত বদমায়েস। মেয়ে বদমায়েস।'

'বদমাস নয়, ডিটেকটিভ।' বাধা দিয়ে জানালো ম্যানেজারঃ 'আমাদের স্টোরের তরফ থেকে নিযুক্ত। খদ্দেরদের কেউ কোনো জিনিসপত্র না সরায় সেদিকে লক্ষ্য রাখাই ওর কাজ।'

ম্যানেজারের কথায় তখন তার আসল পরিচয় পেয়ে আমি আকাশ থেকে পড়লাম! আমায় থানায় নিয়ে জমা দেওয়া উচিত কি না সেই বিষয়ে ওদের মধ্যে আলোচনা চলল তখন।

থানায়! শোনা মাত্রই আমি চমকে উঠেছি। গোয়েন্দা যে থানায় সোপরদ্দ হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না।

ম্যানেজার আমার পরিচয় জানতে চাইলে আমি তোমার নাম বললাম তখন।

'শিব্রামের তুমি ভাগনি! সেকথা বলতে হয়!'

'তোমার নাম শুনে আমার পরিচয় জানবার পর থানায় না দিয়ে ছেড়ে দিল সে আমায়।'

'বলিস কী?' নিজের নামডাকের গৌরবে আমি একটু গর্ব বোধ করি, বলতে কি!

'শিব্রামের ভাগনি তুমি? ভারী আশ্চর্য তো!' বলে সে হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ!'

'মুগ্ধ দৃষ্টিতে?'

'মোটেই মুগ্ধ দৃষ্টি নয় মামা! বরং বেশ বিরূপ নেত্রেই তাকালো বলতে পারো। সবিস্ময়ে সে বলতে লাগল বার বার—আশ্চর্য, ভারী আশ্চর্য তো!'

'কেন, আশ্চর্যটা কিসের? আমার ভাগনি কি কেউ হতে পারে না নাকি? কতো

কালো কালো ভূতদের আহামরি আহামরি ভাগনি হয়ে থাকে। তাতে অবাক হবার কী আছে!' শুনে আমি নিজেই আশ্চর্য হই।

'সেই শিব্রাম?' আমার কথা শুনে যেন তাজ্জব হয়ে গেল সে—'সেই চারশো বিশ? তুমি তার ভাগনি? সেই ফোরটোয়েন্‌টি শিবরামের ভাগনি তুমি? ভারি আশ্চর্য তো!'

'কিন্তু, এটা আবার কেমনতরো কথা যেন? এর মানে?' প্রিসিলার খবরে আমিও যে একটু হতবাক হইনে তা নয়।

'আমিও তো সেই কথাই শুধিয়েছিলাম, ম্যানেজারকে। তাতে তিনি বললেন—'ছেলেরাই তো মামার মতন হয়ে থাকে এই জানি। নরাণাং মাতুলক্রম, বলে থাকে কথায়। কিন্তু ভাগনিরাও যে মামার চরিত্রের ভাগ পায়, তাই নিয়ে জন্মায়, তা আমি এই প্রথম দেখলাম।'

'আমার মামাকে আপনি চারশো বিশ বলছেন যে, এ আপনার কেমনধারা কথা?' আমি খাপ্‌পা হয়ে উঠেছি তখন।

'আমার কোন কথা নয়, এটা পেনালকোডের ধারা।' বলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমায়—'তোমার নাম কী শুনি?'

'আমি বললাম—প্রিসিলা বোস।'

'তোমার কোনো ভাই-টাই আছে আর?'

'আছে এক ভাই। টিক্‌লু তার নাম। টিক্‌লু মিত্তির।'

'মিত্তির? তুমি বোস আর সে মিত্তির কেন গো? তোমার তো বিয়ে হয়নি যদ্দুর দেখছি।' আমার কপালের ওপর কটাক্ষপাত করে তার বলা।

'মাস্তুতো ভাই যে।'

'ওহো! তাইতো হবে। তোমাদের যে মাস্তুতো ভাই-ই হয়ে থাকে। তাই বটে—তাই হবে তো....তাহলে শোনো, তোমাদের নামটা আমি একটু পালটে দিচ্ছি, বুঝলে? তুমি হলে মিস্ টুটেন বোস, আর সে হলো গে মাস্টার টুটেন মিত্তির। টুটেন বোস আর টুটেন মিত্তির—এখন থেকে, কেমন?'

'টুটেন বোস আর টুটেন মিত্তির! তার মানে?' কথাটার আমি মর্মভেদ করতে পারি না—যদিও কথাটা কেমন যেন মর্মভেদী বলেই আমার বোধ হতে থাকে।

'তুমি ধরতে পারছ না মেজমামা?' প্রিসিলা বলে—'আমি তো বলবামাত্রই বুঝেছিলাম। তুমি অঙ্কে বেজায় কাঁচা মামা।'

'অঙ্কের সঙ্গে এর সম্পর্ক?'

'আহা, আমরা তোমার ভাগনে ভাগনি না? তোমার চরিত্রের ভাগ আমরা পেয়েছি তো? আর তোমাকে, মানে, ফোরটোয়েনটিকে দু-ভাগ করলে কী হয়? টু টেন টু টেন হয় না?'

কথাটায় তাক লাগলেও অবাক হবার কিছু নেই, সত্যি! আমার গুণপনার ভাগাভাগি

করলে তাই দাঁড়ায় বটে, আমি ভেবে দেখি। ফের ওদের দু'জনের যোগবলে আমাকেই পাওয়া যায় বার বার।

টুটা ফুটা এই আমাকেই!

বড়োদিনের বাড়ন্ত দিন

চঞ্চল রায় আমার বন্ধু। ওর চঞ্চলতা একদা আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলো। সে ভাবটা অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছে। ভীত হবার কথা এখন ওরই। পরস্মৈপদী জিনিসকে যারা আত্মনেপদী করে নেয়—তাদের আত্মায় বিপদের আশঙ্কা থেকেই যায়। পরকীয়া রস পরখ করার রোখ, ভালো কি মন্দ জানিনে (বৈষ্ণবসাহিত্যে ওর গুণব্যাখ্যা দেখে ওটা অহিংস প্রেমের সগোত্র বলেই জ্ঞান হয়),—তবু এটা ঠিক যে, ওর আসল কথাটা হচ্ছে পরের সঙ্গে জড়ানো—এই কারণে, যেমন পরের প্রতি করতে হয় তেমনি আবার পরেও নাকি করে থাকে। তরোয়ালটার দু'ধারেই বেশ ধার।

চঞ্চলের অসুখের খবর পেলাম—ইনফ্লুয়েঞ্জা না হুপিং কাশিতে বড়্ডো ভুগছে নাকি। যাই হোক, মোটের উপর এখন সে বেশ কাহিল, এই খবর পেয়ে আমার মতো বন্ধুবৎসল লোকের পক্ষে অচঞ্চল থাকা কঠিন। অতএব বড়োদিনের ছুটির সুযোগ পৌঁছতেই ছুট্ দিলাম। বিকেলের ঢের আগেই রওনা হওয়া গেল। যদিও কাছেই থাকে, কাশীপুরে ওদের নিজেদের বাগান বাড়িতেই, তবু একজনের অসুখের সময়ে যাচ্ছি, কিছু সময় হাতে নিয়ে যাওয়া ভালো। ভগবান না করুন, যদি কাশীপুর থেকে কাশী মিত্রে যেতে হয়! মিত্রতার বোঝা তো, এই কাঁধে করেই বইতে হবে—বাধ্য হয়েই।

লোকের অসুখবিসুখ সারাবার আমার নাকি আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। আমার পদার্পণেই অনেক রোগ সেরে যায়, হস্তক্ষেপ করলে তো কথাই নেই। এমনিই জনরব। চঞ্চলের বেলাও তার অন্যথা হবে না, আমার আশা ছিল। এবং এ সম্বন্ধে (অর্থাৎ আমার আরোগ্যকারিতা সম্বন্ধে) লোকের ধারণা যে নিতান্ত ভুল নয় তার পুনশ্চ প্রমাণ পেলাম রাতারাতি ওর সেই ইনফ্লুয়েঞ্জা—না হুপিং কাশি—কেবল ওকে নয়, ওদের কাশীপুরের তল্লাট ছেড়ে চম্পট দিল। কী করে এই মিরাকল্ ঘটল, অথবা আমি ঘটালাম শুনলে আপনারা অবাক হবেন।

ওদের গেটে পা দিতেই শ্রীমতী রায়কে দেখতে পেলাম, বাগানে ঘুরছেন। শ্রীমতি রায় আর আমি এককালে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম—অবশ্যি অনেকদিন আগে, তাঁর বিয়ের আগেই। কৌমার্যদশায় তখন উনি ছিলেন নিছক মায়া সেন। তখনো কোনো যাবজ্জীবনের রায় পাননি। আমাকে মায়ামুক্ত আর ওকে ইন্‌সেন্ করার জন্য একমাত্র চঞ্চল ছাড়া আর কাউকে আমি দায়ী করতে পারিনে। চঞ্চলই সেই মায়াবী।

অবশ্যি শ্রীমতী রায় এবং আমার মধ্যে এখন আর সেই সৌহার্দ্য যে নেই তা নয়, এখনো আমরা বন্ধুই বটে, তবু ঠিক ততটা অন্তরঙ্গ হয়তো বলা যায় না। সত্যি বলতে বিয়ের পরে মাত্র একবার আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। চঞ্চল এমনই হিংসুটে প্রকৃতির যে—কিন্তু না, সে কথা থাক্।

শ্রীমতী রায়ের পুনরায় দেখা পেয়ে সত্যিই আমি পুলকিত হলাম। চিরকালই উনি চমৎকার। বিয়ের পরে সেই চমৎকারিত্ব আরও যেন বেড়েছে। আমার তো মনে হলো আমাকে দেখে উনিও তদ্রূপ চমৎকৃত হয়েছেন। মেয়েদের চোখে আইবুড়োদের জন্যে একটুখানি স্নেহদৃষ্টি থাকেই। বেচারীরা নিজের বা যারই ক্ষতি করুক, মেয়েদের কোনো ক্ষতিকর তো নয়। মেয়েদের তো সাধারণতই দুঃখের জীবন, তবু অন্ততঃ একটি মেয়েকে ইহলোকে তারা সুখী করতে পারে, যাকে তারা বিয়ে করে না। নিজের জীবনের অকূলে জলাঞ্জলি না দিয়ে যাকে বাঁচায়। যাকে না ভাসিয়েই চলে যায় তারা। পুণ্যকর্মের একটা প্রতিফল রয়েছেই, এই জন্যেই নিখিল নারীর একটু দরদ ওদের লভ্য।

'একি, শ্রীমতী রায়, আমিও এলাম তুমিও বেরিয়ে যাচ্ছো?' ওকে সুসজ্জিত দেখে আমি না বলে পারলাম না—'না, এ কখনো হতে পারে না।'

'সত্যি যেন যাচ্ছি! সত্যিই যেন আমি যেতে পারি।' হেসে উঠলেন মায়া রায়, হাসলে টোল্ খায় ওর গালে—এখনো সেই রকম—'এম্‌নি এই বাগানেই বেড়াচ্ছিলাম। এখানে বেড়াতেই আমার ভালো লাগে। সারাদিন এমনি সেজেগুজেই থাকি আমি। উনিও সেটা ভালোবাসেন!'

'হ্যাঁ, কেমন আছে চঞ্চল?' —মায়ার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে আমি খোঁজ নিলাম। কিন্তু খবর নেবার আগেই—'বাঃ, কী চমৎকার গোলাপ ফুটেছে, বাঃ! ভারী সুন্দর তোমাদের এই বাগানটি তো!'

—আমার উচ্ছ্বাসে আমার কথাটা চাপা পড়ে গেল আপনিই।

'তুমি বুঝি ফুলের ভারী ভক্ত হয়েছো আজকাল?' আমি জিজ্ঞেস করি ওকে।

'হ্যাঁ,—তা কিছুটা,' শ্রীমতী রায় প্রকাশ করেন, 'বাগানে শখটা ওঁরই বেশি। আমার তেমন মন্দ লাগে না।'

'ও বাবা! এধারে যে বাঁধাকপিও দেখছি আবার।' চমকে উঠতে হলো আমায়।

'ফসল আরো ফলাও করার জন্যই। গ্রো মোর ফুড আন্দোলনের উনিও এক পাণ্ডা কিনা। ধানগাছও লাগানো হয়েছিলো ওধারটায়। কোথা থেকে তুলে এনে লাগিয়েছিলেন উনিই জানেন। ওঁর ধারণা এই ভাবে সাধ্যমত উনি দেশের সেবা করছেন! অবশ্যি ধানগাছগুলোয় ধান মোটেই ফললো না, কেন জানিনে। আর কপিগুলোও কেমন যেন দর্‌কচা মেরে গেছে, কদ্দুর ওতরাবে কে জানে।'

বেড়াতে বেড়াতে বাগানের একধারের বেঞ্চে আমরা বসলাম।

'বাঃ, বেশ সুখেই আছে চঞ্চল।' আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো; একাধারে দেশলক্ষ্মী আর এমন গৃহলক্ষ্মীর সেবা করার সুযোগ যে পেয়েছে তার মতন সুখী কে? এমন লক্ষ্মীর দশা ক'জনার হয়?

মায়ার হাতখানা বেঞ্চির উপরে পড়েছিল। অকস্মাৎ, কিছু ইচ্ছে করে নয়, একান্তই দৈবাৎ আমার হাতখানা তার হাতের গায়ে গিয়ে ঠেকল।

তারপর নেমে এল আশ্চর্য এক নীরবতা—ভাবালু এবং বাঙ্ময়—যার রহস্য নিয়ে

কবিরা কবিতা লিখেছেন, গাল্পিকেরা গল্প জমিয়েছে, মনস্তাত্ত্বিকেরা পাগলামি করার কসুর করেনি। ভাবগর্ভ সেই নীরব মুহূর্তগুলি লঘুপায়ে আনাগোনা করতে লাগলো।

'এক এক সময়ে আমি ভাবি', বললেন ভূতপূর্ব মায়া সেন, 'কেন যে তুমি আর বিয়ে করলে না।'

আমি বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়লাম : 'মানুষ জীবনে একবারই ভালোবাসে। বিয়ে অবশ্যি সে হাজার বার করতে পারে—যখন তখন—যাকে খুশি ; কিন্তু ভালোবাসা সেই একবারটিই হয়। আর আমার কথা যদি বলো, আমি লোকটা হচ্ছি একনিষ্ঠ। এক সময়ে—অর্থাৎ কিনা এক জীবনে—দু'জনের অনিষ্ট আমার দ্বারা হবার নয়। স্বভাবতই আমি অদ্বৈতবাদী, এক বই দুই জানিনে।'

ঘাড় ফিরিয়ে আড়চোখে একটু তাকিয়ে নিলাম। না, আশপাশ চারধার ফাঁকা। পাড়ার লোকেরা এখন চাল, চিনি, কেরোসিনের দরবারে সার বেঁধে দাঁড়াতে গেছে হয়তো। উঁকিঝুঁকি মারবার কেউ কোথাও নেই। সারা বাগানে খালি আমরা দু'জন।

মায়ার হাতখানা আমার নাগালেই পড়েছিল, তেমনি অবস্থায়—তখনো। ঠিক একখানি আমন্ত্রণ-লিপির মতই।

আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলাম। ললিত আঙুলগুলিকে ঈষৎ দলিত করে বললাম : 'এই একনিষ্ঠ ধাতেব জন্যেই আমার মনে হয় এ জীবনে আমি কাউকে বিয়ে কবতে পারব না। এক যদি কবি, কোন বিধবাকে করব। কিন্তু ভেবে দেখলে সেও এখন আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন...চঞ্চল অনেকটা সেরে উঠেছে তুমি বললে না?'

'অনেকটা ভালো এখন। যদিও জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়েনি, তবু কাশিটা অনেক কম।' জানালো মায়া : 'চলো না, তোমাকে দেখলে উনি খুশি হবেন খুব।'

'হবেন বইকি', আমি সায় দিয়ে বলি : 'হবার কথাই। চঞ্চল আর আমি ছেলেবেলার বন্ধু। অবশ্যি, ওর বিয়ের পর থেকে আর তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই। সাধারণতঃ কারো বিয়েব পর তা বড়ো থাকেও না আর। হয়, তার বৌ তোমাকে পছন্দ করে না, নয়তো তুমি তার বৌকে বেশি পছন্দ করো।'

এই অবকাশে আমার চোখে মুখে একটা আলুথালু ভাব জেগে উঠল (আমি নিজে ঠিক দেখতে না পেলেও) আর আমার গলায় যেন আশাবরী সুর বাজতে লাগল (স্বকর্ণেই শুনলাম) : 'মায়া, সেই আগের দিনগুলি তোমার মনে পড়ে? কী সুখের মুহূর্ত সব গেছে! সেই বিকেল বেলায় দু'জনের গঙ্গার ধারে বেড়ানো?'

'এই কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যে হাত ধরে থাকার কোনো দরকার করে না।' হাত না ছাড়িয়েই বলল সে : 'তা ছাড়া এ হাত তোমার ধর্তব্যই নয় আর। হ্যাঁ, আমার মনে পড়ে। কিন্তু আজকাল আমি আর গঙ্গার ধারে যাই না। উনি সেটা পছন্দ করেন না।'

কেবল উনি আর উনি। এর মধ্যেই প্রায় উনিশ বার শুনতে হলো আমায়। প্রায় পড়-পড় দীর্ঘনিঃশ্বাসকে কোনোরকমে আমি সামলে নিলাম। বাস্তবিক, অদ্ভুত এই মেয়েরা!

বিনা অস্ত্রে কি নিপুণ লড়াই না এরা করে, এমন অকাতরে এত লোককে হতাহত করে যায়, ভাবলে তাক লাগে। যাক, ও যখন নিজেকে কাটিয়েছে, তখন আমারই বা আর মায়া বাড়িয়ে মরীচিকা লাভ করা কেন? আমিও কেটে পড়ি। অবশ্যি, আমি নেহাত একনিষ্ঠ লোক তা সত্যি। কিন্তু তাই বলে আমিও এই মায়া কাটাতে পারবো না? আমার একনিষ্ঠার জের কি এতটাই অকাট্য? এতদূর জেরবার হবার পরেও...অ্যাঁ?

'সত্যিই কি তুমি কোনদিন বিয়ে করবে না আর?' সে বলে বসল হঠাৎ।

'বিয়ে? বললাম তো, বিয়ে যদি কখনো করি তো কোনো বিধবাকেই করব।' দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে জানাই। —'বুঝেচ মায়া?'

'তুমি মায়া বলে আর ডেকো না আমায়। ও তো আমার নাম নয়—ডাক নাম। ছেলেবেলার নাম আমার।' সেও যেন ফোঁস করে উঠল আমার কথায়।

'কেন মায়া? মায়া নামটি তো মিষ্টি খুব।' আমি আওড়াই। মায়ার ডাকে বুঝি বা নতুন করে ভোলাতে চাই তাকে।

'আমার ভালো নাম কি নেই নাকি? আমার নাম তো নীলিমা। সে-নামটাই বা কী এমন খারাপ?'

'না, খারাপ নয়। তবে আমার...আমার তবু সেই তোমার আগের নামটিই মনে জাগে কেবল। যে নামে আমি ডাকতুম তোমায় সেকালে। যখন তোমার সঙ্গে আমার ভাব ছিল...'

'এটা পোষমাস না? বড়দিন না আজ?' অন্য প্রশ্নে মোড় ঘুরিয়ে প্রসঙ্গান্তরে আমার ভাবালুতাকে এড়িয়ে যেতে চায় সে।

'আমার জীবনে আর বড়দিন এলো কোথায়? আমার সব দিনই তো বাড়ন্ত। আমার সব মাসই উপোসের মাস। পোষমাস কি কোনদিন আর আসবে আমার এই জীবনে!'

আবার আমার দীর্ঘশ্বাস: 'তবে এক পোষেই কিছু বড়দিন ফুরোয় না। আমার জীবনেও বড়দিন নিয়ে পোষ মাস হয়তো আসতে পারে একদিন।'

আমার কথাটায় ও কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। কিছু বলে না।

নীলিমা আমার কাছে আজ শূন্যতাই। সেই ফাঁকা আকাশের অন্ধকারের দিকে তাকালে কোনো সুদূর নক্ষত্রের ক্ষীণ দীপ্তিটুকুই বুঝি চোখে পড়ে...যা নাকি কালের পারাবারে কবেই অস্তমিত হয়েছে!

তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আমি আর এক আশ্বাসে দুলে উঠি: 'চঞ্চল তো এখন অসুখ-শয্যায় শায়িত। জ্বরের ঘোরে অকাতরেই ঘুমুচ্ছে? এই ফাঁকে, এখানে এই কাশীপুরেও তো গঙ্গা কাছে,—আমরা একটু বেড়িয়ে আসতে পারতুম। সেই হারানো দিনগুলির পুরোনো স্বপ্ন ফিরে আসত আবার। বলতে বলতে আমার নজর পড়ল অদূরবর্তী দোতলার এক অলিন্দে। সেখানে ফুলের টবগুলোর আড়ালে কোনো অলি নয়, তার চেয়ে বলিষ্ঠতর হৃষ্টপুষ্ট বাহু আর কটমটে চোখ দেখা গেল যেন। কার যেন চাঞ্চল্য দেখলাম মনে হলো।

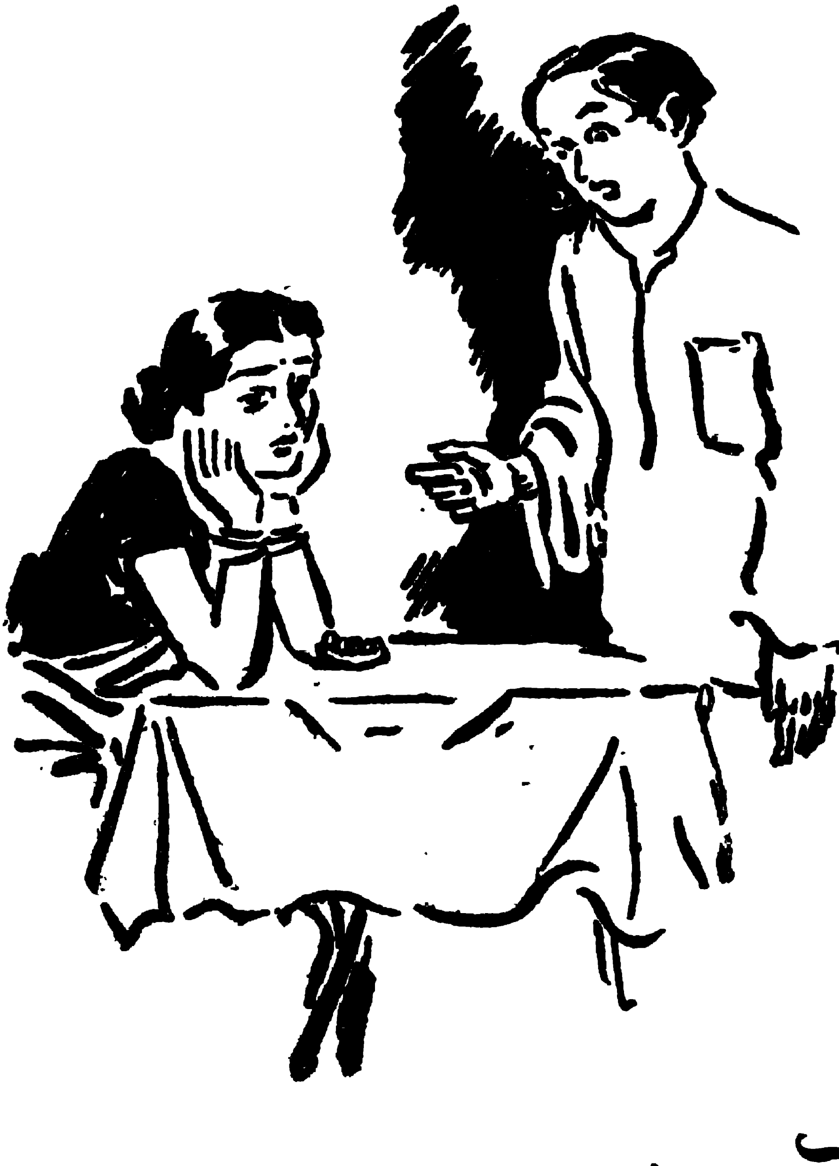
'আচ্ছা আজ থাক।' বলে উঠলাম আমি: 'অসুস্থ রুগীকে একলা ফেলে কোথাও যাওয়া হয়তো ঠিক হবে না। বেচারা জেগে উঠে তোমাকে দেখতে না পেয়ে যদি আরো চঞ্চল হয়ে ওঠে সেটা খুব খারাপ হবে। বন্ধুর অসুখ আর বাড়াতে চাইনে, ওর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতেও আমি নারাজ। আমি চলি আজ। চঞ্চল সেরে উঠলে একটা পোস্টকার্ডে আমাকে জানিও। নইলে খুব ভাবিত থাকব। বুঝেচো?' এই বলে আমি উঠলাম। বেঞ্চির মায়া কাটিয়ে, নীলিমা ওরফে আমার মায়াকে সেইখানে রেখে, চঞ্চললগ্ন অলিন্দের ধার ঘেঁষে আসবার সময় আড়চোখে উপর পানে তাকালাম—একটা ফুলের টব হাতে করে ও তাক্ করছে' ওর নজর ভারী নীচু বলতে আমি বাধ্য।

'এই শীতের রাত্রে এই বাগানে এসে অপেক্ষা করা—কিন্তু উপায় কী? কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে? রাধাও মেলে না।' আপনা হতেই আমার মুখ থেকে ফসকে গেল যেন স্বগতোক্তির মতই।

সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত থেকেও ফসকেছে। একটুর জন্যেই আমার মাথাটা ফসকে গেছে। আমিও একাগ্নী ছুঁড়েছি, ও-ও টবটা ছেড়েচে। সামান্যর জন্য আমার কাশীপুরপ্রাপ্তি ঘটলো না। কাশীমিত্রতা-ও কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল নেহাত।

ক'দিন বাদে মায়ার একটা পোস্টকার্ড পেলাম।

'আশ্চর্য, তুমি চলে যাবার পরই উনি চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। শুনে অবাক হবে, এই পৌষের ঠাণ্ডায় সারারাত উনি বাগানের হাওয়া খেয়ে কাটালেন হাতে লোহার মুগুর নিয়ে তার ওপরে। বললেন, অক্সিজেন নেয়ার সাথে সাথে ব্যায়াম করলে শরীর ভাল হয়। সারারাত আমার ঘুম হলো না—কেবল তোমার পৌষ মাস আর নিজের সর্বনাশের কথা ভাবলাম। যা হোক ফাঁড়াটা কেটেছে। সকালে দেখা গেল উনি দিব্যি আরাম। সর্দি কাশি জ্বরটর কিচ্ছু নেই, চেহারাও চক্‌চকে। নেচার-কিওর জিনিসটা দেখছি মিথ্যে নয় একেবারে, তুমি কী বলো? বলতে কি, এইটেই আমায় সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে আরো।'



মেয়েরা হারাবেই

মেয়েরা হারাবেই

সুমিতাও হারালো।

মহানবমীর দিনটিতেই সঙ্গিনীদের নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে হারিয়ে গেল সুমিতা। সন্ধ্যেবেলার সন্ধিক্ষণে।

সময়টাকে যেন হারানোর মৌসুমিই বলা যায়। কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা-র পরোয়ানা হাওয়ায় যেন। কোনো কিছু পরোয়া না করার। সেই বেপরোয়ানার ছোঁয়াচ সুমিতাকেও লেগেছিল বুঝি।

সবাই মিলে এক সঙ্গে যেতে যেতে কী করে যে দলছুট হয়ে গেল সে! ভিড়ের চাপে কি নিজের চাপল্যেই ছিটকে পড়ল হয়ত। প্রথম প্যাণ্ডালেই হারালো প্রথম প্রহরে।

হারানোর এই দুর্যোগে স্বেচ্ছাসেবকদের কারও সাহায্য নিতে হয় বোধ হয়?

কাকে বলে? কার সাহায্য চায়? পছন্দসই কাউকে পেলে তো। ভিড়ের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে সেই রকমের একজনকে পেয়ে গেল সে শেষটায়...

দেখে শুনে বুঝি একটু অবাক হল যুবকটি—'হারিয়ে গেছেন আপনি?'

'আমি কেন হারাবো? আমি কি খুকি নাকি যে হারিয়ে যাব? মাসিমারাই তো...'

'আপনার মাসিমাবাই হারিয়ে গেছেন তাহলে?'

'মাসিমা মাসতুত বোনরা সবই মিলে দল বেঁধে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম...ইস্, কী ভিড় যে এখানটায়...কোথায় যে ওঁরা ছটকে গেলেন ধরতেই পারলাম না।'

রূপসী মেয়ের মুখের এমন ধার, কি কথায় কি চাকচিক্যে, যেন তলোয়ারের মতই তা ঝলসে ওঠে। ধাবে কাটে, ধারে এলেই কেটে দেয়—আবার তলোয়ারের মতই খাপ খায় সহজে। তাই মেয়েটির বিবৃতি রূপকথার মতন শোনালেও ...মনটা যেন বেখাপ্পা ঠ্যাকে না জয়ন্তর।

মেয়েটি খাপ্-সুরত তা প্রথম দর্শনেই সে টের পেয়েছে।

তার কথায় সে সায় দেয়—'হ্যাঁ, আমাদের বাগবাজারের এই সার্বজনীনে সারা কলকাতা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন। ফি বছরই দেখছি এই। কত ছেলেমেয়ে যে এখানে এসে হারিয়ে যায়...কত দূর দূর থেকে তারা আসে...এমন কি, সেই চেতলার থেকেও দেখতে আসে কত-না লোক!'

'মাসিমারাই ত চেতলার থেকে এসেছিলেন।' জানায় মেয়েটি।

'শহরতলীর থেকেও আসে কত মানুষ তা জানেন? আপনি ক্যাম্পে এসে বসুন ততক্ষণ। আপনার হারানোর কথাটা আমি ঘোষণা করে দিচ্ছি সবাইকে। তার কথায় মেয়েটিকে খাপ্পা হতে দেখে তক্ষুনি সে কথাটা পালটে নেয়—'মানে, আপনার মাসিমাদেরই ডাক দিই আমাদের ক্যাম্পে আসার জন্যে...তাঁরাই তো হারিয়ে গেছেন, তাই বললেন না?'

'তাঁরাই কি আর এই প্যাণ্ডেলে আছেন এতক্ষণ?' সুমিতা বলেঃ 'অন্য কোনো প্যাণ্ডেলে চলে গেছেন কখন! ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছেন সবাই।'

'তাহলে? তাহলে তো...' নিরুপায়ের মতই তাকে বলতে হয়ঃ 'থানাতেই জমা করে দিতে হয় আপনাকে। তাই নিয়ম।'

'আমি কি বাচ্চা মেয়ে যে থানায় নিয়ে গিয়ে জমা করে দেবেন আমায়? রাস্তাঘাট চিনে যেতে পারব না আমি? আপনি একটা ট্যাক্সি ডেকে দিন বরং।'

'ট্যাক্সি! আজকের রাত্রে এই ভিড়ের ভেতর কি ট্যাক্সি পাওয়া যাবে? মিলবেই না, আর পেলেও তারা কেউ এই ভিড় ঠেলে যেতেই চাইবে না সেই চেতলায়। সেই ভোরের আগে ট্রাম বাস পাচ্ছেন না। সারারাত থাকবেন কোথায় এখন? থানাই আমার মতে আপনার পক্ষে একমাত্র নিরাপদ স্থান।'

'আপনাকে বলেছে! থানা কেমন জায়গা তা জানার আমার বাকী নেই। থানার খবর শুনেছি ঢের ঢের।'

'সেই থানা পুলিশ ত নেই আর' বলতে গিয়েও সামলে নিল সে। সম্মুখে দেখল যে, যুবতী মেয়ের পক্ষে এই রাত বিরেতে একা সে ছাড়া আর কোন নিরাপদ এলাকা নেই মনে হয় কোথাও।

'তাহলে চলুন, আমিই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি গিয়ে বাড়িতে।'

'সেই ভালো।'

'সারাপথ হেঁটে যেতে হবে কিন্তু সেই চেতলা পর্যন্ত?'

'তা হোক।' সুমিতার আপত্তি নেই। 'যাবার পথে আশেপাশেই যতো ঠাকুর দেখতে দেখতে যাব। প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে ঘুরে ঘুরে।'

'তাহলে তো বাড়ি পৌঁছতেই রাত কাবার হয়ে যাবে।'

'হোক গে। এমনিতেই তো ট্যাক্সি ফ্যাক্সি মিলছেই না, আর ট্রাম পেতে হলে তো সেই ভোর পর্যন্ত সবুর করতে হয়। তার চেয়ে এই বেড়াতে বেড়াতে দেখতে দেখতে যাওয়াটাই বেশ।... হাঁটতে আমি খুব পারি। আমার ভালো লাগে খুব।'

ভালো লাগে জয়ন্তরও—এমন মনের মতন-সঙ্গিনী মেলে যদি। তাহলে এক টানে অকুস্থানে না গিয়ে বরং মাকুর মতই টানা-পোড়েনে বুননটা জমাটি করে যায়। সোজাসুজি সটান না গিয়ে গজেন্দ্র-গমনে গজ-গজ করতে করতে (গল্পগুজনাও বলা চলে) দক্ষিণেশ্বর, বালি-উত্তরপাড়া, যাদবপুর, বজবজ হয়েও পৌঁছনো যায় চেতলায়।

ইস্, কী ভিড় যে সারা পথে! মানুষের ঠেলায় ফুটপাথ দিয়ে হাঁটাই দায়। পাশাপাশি যেতে যেতে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে যায়, রাস্তার ধারে নেমে পড়তে হয় প্রায়ই।

আর রাস্তাতেই কি ভিড় কম নাকি! সারি সারি মোটর চলেছে খালি,—চলেছে তো চলেছেই! ট্যাক্সিও দেখা দিচ্ছে মাঝে মাঝে—তবে তার খালি নেই একটাও, যাত্রী বোঝাই সব।

'পাশাপাশি থাকুন, ছিটকে পড়বেন না যেন।' সাবধান করে দেয় জয়ন্ত ঃ 'এই ভিড়ের ভেতর আবার যদি হারিয়ে যান তাহলে...'

'আমি হারাব না।'

'মানে, আমি যদি হারিয়ে যাই তাহলে আর আপনাকে খুঁজে পাব না—যা ভিড়! এজন্মে আর আমাদের দেখা হবে না তাহলে—বুঝলেন?'

সুমিতা কিছু বলে না। বুঝেছে কিনা বোঝা যায় না সঠিক। 'যখন রাস্তার এপাশে থাকবেন,' জয়ন্ত আরও জানায়, 'তখন থাকবেন আমার বাঁ ধারে, আর রাস্তার ওপাশে গেলে তখন থাকবেন আমার ডান ধারটিতে...'

'কেন?'

'গাড়ি চাপা পড়তে পারেন। দেখছেন না আশ-পাশ দিয়ে কী রকম হন্যে হয়ে ছুটেছে যতো মোটর! চাপা না পড়লেও ধাক্কা মেরে যেতে কতক্ষণ!'

'আর আপনি যদি চাপা পড়েন?'

'ক্ষতি নেই। আমি আপনার চেয়ে কিছু বড়ো তো? এই বাড়তি সময়টুকুতেই আপনার চেয়ে অনেক কিছু দেখে নিয়েছি চেখে নিয়েছি, অনেকটা স্বাদ পেয়ে গেছি জীবনের। আপনি তো তার কিছুই পাননি এখনও। তাই আপনার বেঁচে থাকার দরকার।'

সুমিতা কিছু বলল না। চুপ করে রইলো। জীবনের একটুখানি স্বাদ পাচ্ছে নাকি আজ?

তাহলেও রাস্তা পেরুনোর সময় ঝামেলা রয়েছেই। মেলাই মোটর এসে পড়ে মাঝখানে। সার বেঁধে যেতে থাকে, ফুরোতে চায় না কিছুতেই। একটুখানি ফাঁক পেতেই তার ভেতর দিয়ে কোনো গতিকে গলে গিয়ে একছুটে ওধারের পথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয়।

এই রকম এক পথসঙ্কটে জয়ন্ত ওধারে গিয়ে পৌঁছাল আর সুমিতা আটকে পড়ে রইল এধারে।

আবার বেশ খানিকক্ষণের অপেক্ষা। তারপর ফের একটু ফাঁক পেতেই অমনি আর এক রুদ্ধশ্বাস দৌড়ে ওধারে গিয়ে আছড়ে পড়ে সুমিতা।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে জয়ন্তর বুকের ওপরেই। পড়েই লাল হয়ে ওঠে।

'ও কিছু না, ও কিছু না। এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট।' নিজের মুখটা মুছে নিয়ে জয়ন্ত বলে ঃ 'রাস্তাঘাটে ভিড়ের মধ্যে এরকমটা হয়েই থাকে। এমন কিছু অঘটন নয়! এটাকে একটা পথ-দুর্ঘটনা বলে জ্ঞান করুন। এ নিয়ে কিছু মনে করবেন না।'

তারপর কিছুক্ষণ ওরা পাশাপাশি চলতে থাকে চুপচাপ।

'অনেকক্ষণ কিছু খাননি, না?' জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে আচম্কা।

'কেন বলুন তো?'

'ঠাণ্ডা ঠেকল কি না। বলছিলাম তাই।'

'কী ঠাণ্ডা?'

'অনেকক্ষণ ধরে পেটে কিছু না পড়লে রক্তের চাপ কমে যায় তখন। তাইতে দেহের প্রান্তসীমাগুলো সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। হাত পা আঙুল ঠোঁট সব। ...দেখি আপনার হাতটা।'

সুমিতার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সে বলল—'হ্যাঁ। ঠাণ্ডাই তো।'

'না খেলে যে রক্তের চাপ কমে যায় তা আপনি জানলেন কী করে?'

'আমি ডাক্তারির ছাত্র যে। ...আপনি লাস্ট খেয়েছেন কখন? কতক্ষণ আগে?'

'সেই দুপুরে ভাত খেয়েছি।'

'তারপর আর?'

'চা খেয়েছি বিকেলে। চা আর বিস্কুট।'

'শুধু চা বিস্কুট? প্রোটিন-টোটিন কিছু না? বিস্কুট কি টোস্টের সঙ্গে ডিমের একটা পোচ-টোচ খেতে হয় তো? তাহলে পোচের সঙ্গে খানিকটা মাখনও যায় পেটে, তাতে এনার্জি হয়।'

এতক্ষণ ধরে হেঁটে হেঁটে সুমিতার খিদে পেয়েছিল বেশ, সে চুপ করে রইল।

'চলুন কোথাও বসে কিছু খেয়ে নেয়া যাক এর মধ্যে। সারা রাত তো হাঁটতে হবে আজ। তাছাড়া আমারও খিদে পেয়েছে খুব—সেই কখন থেকে ডিউটি দিচ্ছি, খালি কয়েক কাপ চা খেয়েছি কেবল। আমিও।'

'প্রোটিন-টোটিন কিচ্ছু না?'

'অত ভলান্টিয়ারকে প্রোটিন খাওয়াতে গেলে আমাদের সার্বজনীন ডকে উঠবে। এই তো, সামনেই একটা পাঞ্জাবী রেস্তোরাঁ। চলুন, রাতের খাওয়াটা সারা যাক ওখানেই।'

ভরপেট মাংস পরোটা খাবার পর আবার ওরা রাস্তার ওপর।

'দেখি আপনার হাতটা এবার।' বলতেই হাত বাড়িয়ে দিল সুমিতা। 'দেখুন, কেমন গরম হয়েছে এখন। কিছু খেলেই রক্তের চাপ বেড়ে যায়, ব্লাড সার্কুলেশন বাড়ে, দেহের প্রান্তসীমা পর্যন্ত রক্ত চলাচল করতে থাকে। গা হাত পা সব গরম হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে।'

হাতের উলটো পিঠ অলক্ষ্যে নিজের ঠোঁটে ছুঁইয়ে দেখল সুমিতা, গরম কিনা।

'কখনো খালি পেটে থাকতে নেইকো। তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর কিছু কিছু খেতে হয়, নইলে পেটে অ্যাসিড জমে—পিত্তি পড়া যাকে বলে সোজা বাংলায়—অনেকদিন ধরে এমন ধারা হতে থাকলে পেটের ভেতর ঘা হয়ে ক্রমে আলসার হয়ে দাঁড়ায়। গ্যাসট্রিক আলসার যাকে বলে। সে ঘা সারতে চায় না সহজে।'

'তাই নাকি?'

'আমিই একথা বলছি তো, আবার ডাক্তার হয়ে প্র্যাকটিসে নামলে প্র্যাকটিস জমলে তখন কাজের ধান্দায় আমারই নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠে যাবে—কিছুর ঠিক থাকবে না। তিন ঘণ্টা বাদ খাওয়া আর হয়ে উঠবে না আমার। এই গ্যাসট্রাইটিসে যত ভারী ভারী ডাক্তার মারা যায় এমন আর কিছুতে না।'

'বলেন কী?'

'বলছি কী তবে? ডাঃ অমল রায়চৌধুরীর নাম শুনেছেন তো? কী বিরাট প্র্যাকটিস—নাবার খাবার সময় নেই—তিনি মারা গেলেন কিসে জানেন? এই ব্যারামে।'

'সারানো গেল না?'

'শিবের অসাধ্যি রোগ। শুধু দুধ ভাত খেয়ে কোনোরকমে বেঁচে থাকা যায় কিছুকাল—কিন্তু সেভাবে বেঁচে লাভ?' বলে সে আরও যোগ করে। 'ডাঃ বিধান রায় শুনেছি সকালে বাড়িতে রোগী দেখার পর যখন বাইরের কলে গাড়ি নিয়ে বেরুতেন, ফিরতেন তো সেই সন্ধ্যেয়, তাঁর পাশে টিফিন কেরিয়ারে খাবার-টাবার সব মজুদ থাকত, মাঝে মাঝেই একটু খেয়ে নিতেন। শরীর সম্বন্ধে এত হুঁশিয়ার ছিলেন বলেই অত বেশি বয়স পর্যন্ত অমন কর্মঠ ছিলেন।'

গল্প করতে করতে চলছিল তারা।

সরলরেখায় না গিয়ে ঘুরে ফিরে এঁকে বেঁকে মণ্ডপে মণ্ডপে ঠাকুর দেখে দেখে যাচ্ছিল। এমনি করে এগিয়ে হাজরার মোড়ে গিয়ে পৌঁছতেই রাত কাবার হয়ে গেল।

'চলুন, সামনের কেবিনে চাটা খেয়ে তারপর সটান আপনার বাড়ির দিকে পা বাড়াবো। কী বলেন?' বলল জয়ন্ত।

'কালীঘাটের এত কাছে এসে মাকে না দেখে যাব? আজ বিজয়া দশমীর দিন না? চলুন মাকে গিয়ে প্রণাম করি আগে। তাঁকে দর্শন করে আসি।'

পূজারী ঠাকুর যেন আগ বাড়িয়েছিলেন। মন্দিরে পৌঁছতেই, 'আসুন মা। আসুন। আসুন বাবু-মশাই। মার পূজো দিন—মাকে দর্শন করুন।' বলে কেবল দর্শন নয়, পূজা উপচারের আয়োজনও করে দিলেন তিনি।

প্রণাম সেরে গর্ভ-মন্দির থেকে উঠে চত্বরে পা দিয়েই প্রথম কথা জয়ন্তর—'চলুন, এবার চেতলা যাই, অনেকক্ষণ সকাল হয়েছে, বেলা বাড়ছে, বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি আপনাকে।'

'চেতলায় তো আমাদের বাড়ি নয় জয়ন্তবাবু। আমরা থাকি বাগবাজারে।' সুমিতা ব্যক্ত করে।

'সে কী! তবে যে বললেন চেতলায়?'

'চেতলায় আমার মাসিমারা থাকেন। চেতলার থেকে আমাদের বাড়ি এসেছিলেন কালকে ঠাকুর দেখতে, তাই বললাম না?'

'তাহলে বাগবাজারেই যাওয়া যাক। ট্রাম আছে, বাসও রয়েছে এখন! ট্যাক্সিও পাওয়া যাবে অঢেল।'

সুমিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, নড়ে না।

'দাঁড়িয়ে রইলেন যে?' জয়ন্ত শুধোয়।—'কী হোলো?'

'সারা রাত বাইরে কাটিয়ে বাড়ি গিয়ে কী বলব তাই আমি ভাবছি।' ভারি যেন ভাবিত দেখা যায় সুমিতাকে।

'তাহলে সেই থানাতেই যেতে হবে আমাদের শেষ পর্যন্ত। পুলিশের হেপাজতে পুলিশের গাড়িতে গেলে আর কোন কথা উঠবে না।'

ঠাকুরমশায় কিনারেই ছিলেন—কান খাড়া করে। এগিয়ে এসে যেন কিনারা করলেন—'থানা পুলিশ কিসের জন্যে বাবু? পুলিশের চেয়ে পুরুতই তো ভালো।'

'পুরুত?'

'হ্যাঁ, পুরুত। আজ ভোরের থেকে এর ভেতরেই তিন জোড়া পাত্রপাত্রীর বিয়ে দিয়েছি। রোজই দিই। সব ব্যবস্থা আমাদের তৈরি থাকে। চলুন, মার সামনে মালা বদল করে আপনাদের চার হাত এক করে দিই-গে। মার পায়ের সিঁদুর নিয়ে মায়ের সিঁথিতে পরিয়ে দিন। মার আশীর্বাদে সংসার বেঁধে আপনারা সুখী হোন।'

জয়ন্ত সুমিতার দিকে তাকায়। সুমিতা কোন কথা কয় না।

'এ বিয়েও বিয়ে। আসল বিয়ের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সে হল গো অগ্নিসাক্ষী, আর এ-হল সাক্ষাৎ জগন্মাতাকে সাক্ষী রেখে। তবে মনে করলে পরে একটা রেজিস্টারি করে নিতে পারেন। সানাই শাঁখ বাজিয়ে ঘটা করেও করে থাকে কেউ কেউ —যদিও সেটা বাহুল্য মাত্র। ...কী বলছেন? রাজি?'

সম্মতির লক্ষণ কিনা কে জানে, সুমিতা বেবাক্ মৌন।

'অগত্যা।' সুমিতার মৌনতাকেই যেন বাধ্য হয়ে সায় দেয় জয়ন্ত।

পাখি পড়ার মতন বিয়ের মন্ত্রগুলি আউড়ে যায় ওরা। মালা বদলের সময় সুমিতা একটু হাসে। সেই হাসিতে বুঝি উৎসাহ পায় জয়ন্ত। বলে :

'তখন সেই পথের দুর্বিপাকে যেটা ঘটেছিল, এখন মায়ের সামনে সেইটা হয়ে যাক? কেমন?' জয়ন্ত সাধে।

'না, পরে।...পরে খেয়ো।'

'না এখন। আমি এখন খাব। মাকে দেখিয়ে। ...একি, মুছলে কেন?'

'কোথায় মুছলাম?'

'আমাব চোখের সামনে মুছলে আবার বলছ কই মুছলাম! খেতে বুঝি আমার কষ্ট হয় না?'

'কষ্ট হয়?'

'হয় না? পরিশ্রম লাগে না খেতে? আমি আবার খাব।...'

সুমিতা আর মুছল না, শুধাল, 'গরম?'

'বেশ গরম। ব্লাড সার্কুলেশন বেড়ে গেল তো এখন। খেলেই বাড়ে বললাম না? এ খেলেও। ...এবার আমাদের বাড়ি চলো। কাছেই আমাদের বাড়ি। এই কালীঘাট রোডে—মন্দিরের পাশ দিয়ে রাস্তা গেছে, একটুখানি এগুলেই হাজরা রোড পেরিয়ে কালীঘাট রোড। কখানা বাড়ির পরেই আমাদের।'

'তবে যে বাগবাজারে...?'

'বাগবাজারে আমার মামার বাড়ি। ফি বছর দুর্গাপুজোর সময় যাই। সেখানকার সার্বজনীনের স্বেচ্ছাসেবকদের ক্যাপ্টেন কিনা আমি।'

'তাই নাকি? আহা, কাল রাত্তিরে বেচারাদের কাপ্তেন খোয়া গেছে!' দুঃখ করল সুমিতা।

'বেচারিরা জানে না তাদের ক্যাপ্টেনের ওপরে আরেকজন ক্যাপ্টেন এসে গেছে এতক্ষণে—এখন থেকে তার ওপর সেই কেবল কাপ্তেনি করবে।'

'যাও।'

'এক মাকে তো প্রণাম করা হল, এখন আমাদের আরেক মাকে প্রণাম করিগে চলো।'

'আচ্ছা, তোমার কি একটুও ভাবনা হচ্ছে না?' পাশাপাশি যেতে যেতে জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে: 'একটা একদম অজানা অচেনা ছেলের সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে তুমি কি একটুও ভাবিত নও?'

'তুমি বুঝি খুব ভাবিত?' পালটা প্রশ্ন করে সুমিতা—তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে।

'আমার আবার ভাবনা কিসের? আগে আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাতুম বটে, ভাবিষ্যতের খপ্পরে ছিলুম। এখন তোমাকে বিয়ে করার পর ভবিষ্যৎ তো আমার হাতের মুঠোয়। আগে আমি ভাবীকালে বাঁচছিলুম, আমার স্বপ্ন নিয়ে থাকতুম, এখন তো আমি বর্তমানে পৌঁছে গেছি। প্রতিমুহূর্ত আমার সামনে মূর্ত হচ্ছে এখন। কোনো মেয়েকে সম্পূর্ণ আপনার করে পাবার পরেই মানুষ বুঝি বাঁচতে শুরু করে। তাই এখন আমি বর্তমান। তোমাকে পেয়ে আমি বর্তে গেছি সুমিতা!'

সুমিতা কিছু বলে না, পাশাপাশি যেতে যেতে জয়ন্তর হাতটা নিজের মুঠোয় চেপে ধরে কেবল—গায় গায় ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে যায়।

'আমাদের দুজনকে আশীর্বাদ করো মা।' বলে গড় করে উঠতেই মা অবাক বিস্ময়ে ওদের দিকে তাকালেন।

দেখতে দেখতে সারা মুখ উদার প্রসন্নতায় আলো হয়ে উঠল তাঁর। সুমিতার চিবুকে হাত দিয়ে আদর করে বললেন—'দিব্যি বউ এনেছিস। আশীর্বাদ করি তোরা দীর্ঘজীবী হ, সুখী হ। তুই যে এমন একটি মেয়ে ঠিক করে রেখেছিস তা তো কোনোদিন ঘুণাক্ষরে আমায় জানাসনি বাবা।'

জয়ন্ত বিড়বিড় করে কী যেন বলতে চায়, কিন্তু তার বিড়ম্বনার কিছুই বুঝি ব্যক্ত হয় না।

'তোর মনের মত কনে ঠিক করা আছে তা আমায় অ্যাদ্দিন বলিসনি কেন তুই? আমি কি তাতে বাধা দিতুম? এতদিন ধরে তোকে কতো আমি সেধেছি, তুই কিছুতেই বিয়ে করতে চাসনি, তা যে এই জন্যেই তা কী করে জানব! যাক, মুখ তুলে চেয়েছেন মা, এতদিনে যে তোর সুমতি হয়েছে সেই আমার ভাগ্যি!'

'পাণিপথের প্রথম যুদ্ধেই হেরে গেলাম মা...পাণিগ্রহণ করতে হয়েছে, কী করব?' জয়ন্ত জানায়: 'তা সুমতিই বলো আর সুমিতাই বলো—যা হবার হলো।'

'ভালোই হলো। আমি চোখ বুজলে কে তোকে বেঁধে দেবে তাই আমার ভাবনা ছিল রাতদিন। অ্যাদ্দিন বাদ মা মুখ তুলে চেয়েছেন। আমায় নিশ্চিন্ত করেছিস তুই—আমি বাঁচলাম।'

সেখান থেকে সরে আসতেই উস্‌কে উঠল সুমিতা—'আমার কাছে তুমি হেরে গেছ বললে যে? আমার কাছে তোমার হার হয়েছে?'

'তোমার কাছে যে হার মানি সেই তো আমার জয়! জয় আবার ইংরিজি বানানেও হয়। তাছাড়া সত্যি কথা কী জানো? মেয়েদের সঙ্গে কেউ কখনো জিতে উঠতে পারে না, হার মানতে হয় সবাইকেই। তবে সেটা ভাগ্যের উপহার বলেই মেনে নেয় সকলে।'

হ্যাঁ, জানা কথা। মেয়েরা হারাবেই।

মরণবাঁচন প্রশ্ন

হাসির গল্প লেখকেরও এক এক সময় গোয়েন্দা-কাহিনী লেখার সখ হয়।

যার লেখায় পাঠকরা হেসে খুন হবে আশা করা যায় তাকে যদি কথায় কথায় খুন করতে হয় হাসতে হাসতে—হলই বা না-হয় কলমের ডগায়, সেটা যেন কেমনতরো।

কিন্তু সেই খুনোখুনি কাণ্ডও আমাকে করতে হয়েছে একবার। যদি কেউ আমার 'খুনীকে নিয়ে খুনোখুনি' বইটা পড়ে থাকেন তো সেকথা তাঁর অজানা নয় নিশ্চয়।

খুনীকে নিয়ে যতটা না হোক, খুনী কে তাই নিয়ে খুনোখুনি কাণ্ড ছিল বটে বইটায়। আর বলা বাহুল্য, আমার হাতে পড়ে যদ্দুর হাস্যকর হবার হয়েছিল ব্যাপারটা।

সে-প্রকাণ্ড কথা এখন থাক, আসলে তা তো আমার লেখা একটা উপাখ্যান ছাড়া কিছু না আর; কিন্তু না, গোয়েন্দাকাহিনী নয়, তার নায়ক হয়ে স্বয়ং আমাকেই যে একদা গোয়েন্দাগিরি করতে হবে এমন ধারণা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

'গোপেনের খবর জানো ভাই?' সঞ্জয় এসে আমায় শুধায়।

'শুনেছি বটে।' ঘাড় নাড়লাম আমি।

কদিন ধরেই বন্ধুমহলে গুণ গুণ করছিল, কথাটা আর কারও অজানা ছিল না।

'কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না।' আমি বললাম।

'ছেলেবেলাতেই নিরুদ্দেশ হয় জানি, পরীক্ষায় ফেল করলেও পালায়, কিন্তু এত বেশি বয়েসে পঞ্চাশ পেরিয়ে এসে নিরুদ্দেশ? আশ্চর্য বটে।' গোপেনের উদ্দেশ করে সে বলে।

'আশ্চর্য কিছুই নয় ভাই!' আমি গোপেনের সাফাই গাই। 'বিবাহিত লোকের পরীক্ষা তো পদে পদে—প্রায় প্রাত্যহিক ব্যাপার বলতে গেলে। একটা প্রশ্নপত্র তো সব সময়েই তাদের সামনে খোলা রয়েছে...।'

'কোন প্রশ্ন? কিসের কথা বলছ?'

'কেন, তার বৌ। সে-প্রশ্ন তো সবসময়ই বর্তমান। যার রহস্য কোনোদিন আর ভেদ হয় না। যে-প্রশ্নের কোনো জবাব দেওয়া যায় না—জবাব নেই।'

'হ্যাঁ, বৌ একটা অফুরন্ত জিজ্ঞাসা বটে', সায় দেয় সঞ্জয়—'কিন্তু তার মোক্ষম জবাব হচ্ছে নিরুত্তর থাকা। চুপ করে থাকলেই চুকে যায়। তার জন্যে কারো কখনো বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবার দরকার করে না।'

'প্রায় আমাদের বয়সীই, না গোপেন? তা ষাটের কাছাকাছি পৌঁছে অনেক মানুষের

স্বভাবতই কেমন একটা বৈরাগ্য জাগে—বৌয়ের ওপর ঠিক রাগ না হলেও। পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ—বলেছে না শাস্তরে? সেই বৌরাগ্যে বানপ্রস্থে যায়নি তো বেচারা?'

'এর ভেতর ওর মনের তেমন কোনো আঁচ পেয়েছিলে নাকি?' সে শুধোয়।

'বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাবার মতন বলছো?' আমি গোপেনের মনের রহস্য বাগাবার হদিশ পাই—'তবে একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছি বটে। ওর মনের আবহাওয়ার যে বদল হয়েছে তার একটা লক্ষণ দেখা গেছল বটে ইদানিং। ফি বছরে বন্ধুদের ওদের বিবাহ-তিথিতে আমন্ত্রণ করে সে। এবার করেনি সেটা খেয়াল করেছো?'

'বিবাহতিথি-ফিথি উদ্‌যাপন করতে আর ভালো লাগে না—এইরকম একটা কথা সে বলছিল যেন আমায়, একদিন রাস্তায় দেখা হলে।' সঞ্জয় জানাল।

'ভালো লাগে না? কিন্তু কেন ভালো লাগে না? বৌয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য? ঝগড়াঝাঁটি? অবনিবনা?' কারণটা ঠাওর পাবার আঁচ করি—'কী মনে হয় তোমার?'

'তারপরও তো তাদের বাড়ি গেছি, তেমনধারা কিছু তো কই নজরে পড়েনি আমার। আচ্ছা, ওকে কেউ গুম্ করেনি ত?' দুম্ করে কথাটা পাড়ল সঞ্জয়। —'কিংবা খুন?'

'খুন বলছ কেন? আত্মহত্যাও তো হতে পারে?'

'আত্মহত্যা করলে লাশ যাবে কোথায়? আত্মহত্যার লাশ তো লুকোবার দরকার করে না, সে প্রকাশ্যেই পড়ে থাকে, একখানা চিঠিও থাকে সঙ্গে—আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে ইত্যাদি।'

তা বটে। জীবনের সমরক্ষেত্রে নির্বিশেষ পরাজয় স্বীকার করে নিজের জীবন নিয়ে জীবনের ওপরে নিজের কর্তৃত্ব জাহির করার একটা উৎকট প্রয়াস প্রকট হয় বটে কারো কারো। কখনো কখনো কোনো না কোনো সময় প্রায় সবারই হয়ে থাকে বোধ হয়।

'এক্ষেত্রে লাশ পাওয়া যাচ্ছে না...' সঞ্জয় পুনশ্চ যোগ করে, 'খুন করলেই লাশ গুম করার দরকার পড়ে জানো নিশ্চয়?'

'তাহলে পুলিশে খবর দিতে হয় আমাদের।' বলে আমি নিজেই গুম হয়ে যাই এবার।

'পুলিশ ছাই-এর কিনারা করবে! এর রহস্যভেদে লাগতে হবে আমাদেরই। আমাকে কিংবা তোমাকে...'

'তাহলে আমাকেই লাগানো যাক।' আমি সোৎসাহে বলি। বাল্যকালের থেকে গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে পড়ে গোয়েন্দাগিরির ঝোঁক আমার অনেক দিনের। তাই সামনে এই মোকা পেতেই সেটাকে ফসকাতে চাইনে খামোকা।

'বেশ লেগে যাও তাহলে।' তার সবুজ ইসারা—'আজই...এখুনিই।'

'খুনোখুনি ব্যাপারে মহাজনদের উপদেশ কী জানো তো? সেই মেয়েটিকে খুঁজে বার করো সব আগে...'

'কোন মেয়েটিকে?'

'সেই মেয়েটিকে। মেয়ে না থাকলে কোনো খুনখারাপি কখনো হয় না। মেয়েদের জন্যেই যত খুনখারাপি, লঙ্কাকাণ্ড, লণ্ড ভণ্ড তাণ্ডব। এক্ষেত্রে সেই মেয়েটি কে?'

'নিশ্চয় তার বৌ নয়?' সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সে তাকায়।

'তার আধবুড়ি বৌয়ের জন্যে কে ওকে খুন করতে যাবে? সে নয়, অন্য কোনো মেয়ে আছে এর পেছনে...'

'তার স্বার্থ?'

'মেয়েটিকে পেলেই তা জানা যাবে। কিন্তু সে কোথায়?'

'তোমার মাথায়। পোকাদের সঙ্গে কিলবিল করছে। খুনটুন হলে মহাজন ছাড়াও অভাজনদের একটা উপদেশ আছে, গোড়াতেই অকুস্থানে যেতে হয়। সেখানে গেলেই হদিশ মেলে।'

গেলাম অকুস্থলে। গোপেনের বাড়ি। সেই মেয়েটিকে সেখানে না পেলেও একজন বর্ষিয়সী সেখানে ছিলেন বটে। স্বামী-বিরহবিধুরা গোপেনের স্ত্রী।

একটি বেতের চেয়ারে মুহ্যমানের মত বসেছিলেন। আমাকে দেখে না উঠেই আরেকটি চেয়ার এগিয়ে নিয়ে বসতে বললেন। নীরবে।

'গোপেন বাড়ি নেই, কোথায় গেছে যেন শুনছিলাম। তাই খবরটা নিতে এলাম ওর। চিঠিপত্র পেয়েছেন কিছু?' মহিলার ম্লান চেহারার পানে তাকিয়ে আমি শুধাই।

'না। কোনো খবব পাইনি এখনো।'

'অনেকদিন পর এলাম। কার্যগতিকে আজকাল নিয়মিত আসা আর হয়ে ওঠে না, কিন্তু একী দেখছি, আপনাদের বাডিটা এত খালি খালি কেন? সারা বাড়ি তো আসবাবপত্রে ঠাসা ছিল দেখেছিলাম, নানান ধরনের ফার্নিচারে সাজানো গোছানো...সেসব গেল কোথায়?'

'আসবাবপত্রের কথা বলছেন। ওঁর ফার্নিচারের দোকান ছিল জানতেন বোধহয়? বেশ কয়েক বছর আগেই সেটা তুলে দিয়েছিলেন, কারবার তেমন ভালো চলছিল না তো। সেই দোকানেরই বিক্রি না হওয়া বাড়তি যত মালপত্র...'

'বুঝেছি। দোকান উঠে যেতে সেখান থেকে সেইসব নিয়ে এসে নিজেব বাড়ি সাজিয়েছিলেন। তা সেসবই বা গেল কোথায়?'

'নতুন ফার্নিচারগুলো একটু কমে সমে দোকান থেকেই বেচে দিয়েছিলেন। পুরনো পড়ে-থাকা-গুলো যেগুলো আর কিছুতেই বিক্রি হবার নয় সেইগুলোই এনেছিলেন এই বাড়িতে...' বলতে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন হঠাৎ।

আমি সেকথার জের না টেনে অন্য কথা পাড়ি—'আপনি আছেন কেমন?'

'আছি একরকম। শরীর এমন কিছু খারাপ নয়, তবে মনটা...'

'মন তো খারাপ হবেই। গোপেন যে এমন ধারা খেয়ালী তা কোনোদিন আমরা সন্দেহ করিনি। কোনো কিছু না বলে এভাবে হুস্ করে বেপাত্তা হয়ে যাওয়া...এতদিনেও একটা খবর না দেওয়া...চিঠি ফিটি অন্তত...বাড়িতে বৌ ভাবছে...অন্তত বন্ধুদের কাউকেও তো লিখতে পারত সে! কিচ্ছু বিচার বিবেচনা নেই, বিলকুল বেহিসেবী।'

উনি চুপ করে থাকেন।

'আপনাদের ভেতর কোনো ঝগড়াঝাঁটি হয়নি ত?' আমার শরসন্ধান।

'না না। আমাদের মধ্যে অবনিবনার কোনো কারণ ঘটেনি কখনো। কোনোদিন কিছু

নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কোনো কলহ্ কচকচি হয়নি। না, সেসব কিছু নয়...' আমার সন্ধানী বাণ উনি এড়িয়ে যান।

'তাহলে ? হঠাৎ এমন বাড়ি ছেড়ে বিবাগী হয়ে যাওয়ার কারণ ?'

'ইদানিং কেমন ধারা যেন একটা খুঁতখুঁতেপনা দেখা দিয়েছিল তাঁর।' বলে আর তিনি এগোন না।

'খুঁতখুঁতে স্বভাব ? মানে, সন্দেহবাতিক বলছেন ? ঈর্ষা-পরায়ণতা ?' আমি যেন একটা ক্লু পাইঃ 'অবশ্য তা হওয়াটা এমন কিছু বিচিত্র না। প্রথম বিয়ের সময় আপনাকে যেমনটি দেখেছিলাম এতদিনেও এখনও আপনি প্রায় সেইরকমটিই রয়েছেন, আর, গোপেনেরও আপনার প্রতি টান বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি, ঠিক আগের মতনই, তাও আমরা সবাই জানি, কিন্তু তাই নিয়ে এই বয়সে...এখন যদি আমার বৌয়ের প্রেমে কেউ পড়েই, মানে, আমার বৌকে অন্য কেউ ভালোবাসলে তার জন্য রাগ না হয়ে আমি বরং গর্বিতই হবো। অবশ্যি আমার বৌ নেই যদিও...'

'কী যে আপনি বলেন !' দুঃখের মধ্যেও অতি কষ্টে একটুখানি তিনি হাসলেন—'সেসব কোনো কথাই নয়। কোন তৃতীয় ব্যক্তি আমার প্রতি আসক্ত হবে এমন সন্দেহ ঘুণাক্ষরেও কোনোদিন তাঁর মনে জাগেনি। জাগতেই পারে না।'

ওদের পারিবারিক ক্ষেত্রে কোনো ত্রিভুজ না পেয়ে আমার ভূজঙ্গপ্রয়াস ব্যর্থ হল। বললাম, 'আপনাদের দাম্পত্য সকলের আদর্শস্থল। সত্যি বলতে কি, আমাদের বন্ধুমহলেও একটা আলোচনার বিষয় ছিল একটা।'

'ছিল বুঝি ?'

'আমার কী মনে হয় জানেন ? দিনকতকের মধ্যেই ও ফিরে আসবে ফের। আপনি মোটেই ভাববেন না। মন খারাপ করার কোনো হেতু নেই। বাড়ির মায়া আপনার মায়া সে কাটাতে পারে না কিছুতেই। আসতেই হবে তাকে।'

'না। আর আসবে না।'

'অবশ্যি যদি আত্মহত্যা না করে থাকে।'

'আত্মহত্যা করতে যাবে কোন দুঃখে ?'

'দুঃখে নয়, এমনিই। মানুষ কোনো দুঃখে আত্মহত্যা করে না, অকারণ পুলকেও নয়। দুঃখ পুলক এসব তো উপভোগের বস্তু। তারিতে তারিয়ে চাখে মানুষে—কবিতা লেখে তাই নিয়ে আবার। কাগজপত্রে ছাপিয়ে নিজের দুঃখ চারিয়ে দেয় চারধারে। শুধু মানুষ যখন জীবনের কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না তখনই সে নিরুদ্দেশ হতে চায়—সংসার থেকে—সবার কাছ থেকে—এমনকি পৃথিবীর থেকেও।'

শ্রীমতী চুপ করে থাকেন।

'আপনাদের এবারের বিবাহতিথির আমন্ত্রণটা কিন্তু পাইনি আমরা। এবারকার বিবাহপার্বণটা ফস্‌কে গেছে আমাদের...'

'হল আর কই সেটা ? তার ক'দিন আগেই এই কাণ্ডটা ঘটল যে...'

'কী কাণ্ড ? ও, ওঁর পালিয়ে যাওয়ার কথাটা বলছেন ?'

'হ্যাঁ, পালিয়ে যাওয়াও বলতে পারেন।'

'আপনাদের বাথরুমটা কোন দিকে?' আমি জিজ্ঞেস করি। বাড়ির ভেতরে কোনো বৈলক্ষণ্য নজরে পড়ার মত রয়েছে কিনা নিজের চোখে খতিয়ে দেখতে চাই। কোনো কোণ থেকে কিনারা হবার মত কিছু হদিশ মিলে যায় যদি।

'চলুন দেখিয়ে দিই।'

ভেতরে ঢুকে চমকে যেতে হয়। হদিশ কিছু পাবো কি, কোনো ঘরের কোনো কোণাতেই কিচ্ছুটি নেই। ঘরগুলি ফাঁকা ফাঁকা।

'একী! আপনাদের এত ফার্নিচার ছিল যে, কত ঢংয়ের কত রকমের আসবাব। ঘরে ঘরে সাজানো থাকতে দেখেছি, সেসব গেল কোথায়?'

'পুরনো হয়ে গেল। আর, পুরনো জিনিস উনি একেবারে সইতে পারতেন না। পুরনো আসবাব ওঁর দু' চোখের বিষ ছিল।'

'তাই হয় বটে। জহুরি হলে তাই হয়ে থাকে। সোনা রূপো হীরে জহরতের ব্যাপারী যেমন গিল্‌টির গয়না বরদাস্ত করতে পারে না—তেমন কারবারে গেলে তার নিজেকেই কেমন গিল্‌টি মনে হয়—তেমনি অনেকদিন ধরে উঁচুদরের ফার্নিচারের কাজ করে করে তার নজরটা উঁচু হয়ে গেছল। আসবাবপত্রে গলদ দেখা দিলে তার দৃষ্টি এড়াত না। তা, কী গতি করলেন ফার্নিচারগুলোর?'

'বাড়ির বার করে দিলেন। আর কী করবেন?'

'বিলিয়ে দিলেন সবাইকে? সব?'

'না, বিলিয়ে নয়, ভেঙেচুরে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

'ভেঙে চুরে ফেলে দিলেন! ভেঙে চুরে কেন?' অবাক হতে হয় শুনে।

'ডাস্টবিনটায় ধরে না যে। আমাদের গলির মোড়ে, খান কয়েক বাড়ির পরেই ডাস্টবিনটা দেখেননি? যেতে আসতেই তো চোখে পড়ে। ফাঁকাই পড়ে থাকে সেটা। পাড়ার কেউ তাতে কোনো জঞ্জাল ফ্যালে না, আশপাশে ফেলে যায়, পাড়ার যত নোংরা তার চার ধারে জমা হয়ে থাকে। চোখে ঠ্যাকেনি আপনার?'

'ঠেকবে না কেন। চোখেও ঠেকেছে, নাকেও ঠেকেছে!' নাক টিপে বলি—'এখানে বসেও যেন গন্ধ পাওয়া যায় তার।'

'তাইতেই সব ফেলে দিয়ে আসা হয়েছে। বড় হলেও ওই ডাস্টবিনে কতো আর ধরে? ভেঙেচুরে একটু একটু করে রাতারাতি ফেলে এসেছি আমরা। ভোর রাতে জঞ্জাল ফেলা গাড়ি এসে তুলে নিয়ে যায় পরিষ্কার করে, তার আগেই পাচার করতে হয়েছে সব।'

'একবাড়ি আসবাব তো একদিনে যাবার নয়।'

'একদিনে গেছে নাকি? এক গাড়িতেও যায়নি। পুরো একটা বছর লেগেছে সবটা সরাতে।'

'ডাস্টবিনে বর্জন করলেন একেবারে? আসবাবগুলো সত্যিই কিন্তু আবর্জনা ছিল না। বন্ধুবান্ধবদের দিয়ে দিলে পারতেন। আমাদের অনেকেই ওসব জিনিস চোখে

দ্যাখেনি...চোখে দেখলেও ব্যবহার করার ভাগ্য হয়নি অনেকের। আমার কথাই ধরুন না ! আমার বাসায় আসবাব বলতে একখানি একানে চৌকি আর একটা মাত্র ডেকচেয়ার...'

'আপনি নিতেন ওসব ?'

'না, রাখতাম কোথায় ? বাড়ি তো নয়, একখানা ঘর মাত্র। আমাদের ওটা বাসা বাড়ি জানেন না ?' আমি জানাই—'কিন্তু খাসা আছি। আসবাবপত্তরের কোনো জঞ্জাল নেই কোনোখানে। বিলকুল ফাঁকা ঘর আমার।'

'কিন্তু লেখবার টেবিল তো আছে একখানা ?'

'শুধু একটা চৌকি বললাম না ? আর বারান্দায় সেই ডেক-চেয়ারটা—সেখানে বসে অনেকখানি আকাশ আর সামনের মাঠের সবুজ ঘাস দেখা যায় এন্‌তার। অফুরন্ত ঐশ্বর্য।'

'লেখেন কোথায় তাহলে ? এত এত লেখেন যে ?'

'ওই চৌকিতেই। ওতেই খাই, শুই আর লিখি। শুয়ে শুয়ে খাওয়া যায়, খেয়ে খেয়েই শুয়ে পড়া যায়—মস্ত সুবিধে...না, আমার কথা নয়, বন্ধুদের ভেতর যাদের বাড়িঘর আছে, ঘরদোর সাজাতে চায় তাদের কথাই বলছিলাম।'

'আমিও বলেছিলাম, কিন্তু উনি বললেন যে, না। তা হয় না। যে জিনিস নিজে খাব না, খাবার অযোগ্য, তা অপরকে খেতে দেওয়া যায় না। যে সব আসবাব আমরা ব্যবহার করছিনে, অব্যবহার্য মনে করি, যাদের নাকি খুঁত বেবিয়েছে...'

'ভারি খুঁতখুঁতে তো।'

'বেজায়। আর এই খুঁতখুঁতেপনার জন্যেই...।' বলতে গিয়ে কী যেন তিনি চেপে যান হঠাৎ।

'কী বলছিলেন ?'

'না, কিছু বলিনি।' প্রশ্নটা উনি এড়িয়ে যেতে চান। উড়িয়ে দিতে চান।

'না, কিছু একটা বলছিলেন যেন। বলুন না।'

'কিছু বলিনি। খুঁতখুঁতেপনায় মানুষের সর্বনাশ হয় অনেক সময়, এই কথাই বলছিলাম।'

'কী সর্বনাশ ?'

'ঐ আপনার বাথরুম।' আমার কথার জবাব না দিয়ে উনি হাত পা ধোবার ঘরট দেখিয়ে দেন আমায়।

চারখানা ঘর পার হয়ে বাথরুমে পৌঁছই। এবং সেখানে আমার জিজ্ঞাসার জবাবট খুঁজে পাই যেন। ঘুমের বড়ির একটা খালি শিশি সেখানে পড়ে। শিশিটা পকেটে পুে বেরিয়ে আসি আমি।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে।' শ্রীমতীকে শুধাই : 'আপনার স্বামী কি ঘুমে বড়ি খেতেন রাত্রে শোবার আগে ? রোজই খেতে হত ?'

'হ্যাঁ। কী করে জানলেন আপনি ?'

'আপনার আশঙ্কায় ঠিক। উনি আর ফিরবেন না। খুব সম্ভব উনি মারা গেছেন কিন্তু..!.'

কিন্তু খট্‌কা একটা ছিলই তখনো...মরলেন কী করে? আত্মহত্যায়, না, খুন হয়ে? কিন্তু খট্ করে কি কথাটা বলা যায়?

'কী করে মারা গেছেন জানতে চান?' আমি শুধাই। উনি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে একটিও কথা না বলে—

'আমার মনে হচ্ছে' আমি বলে যাই, 'ঘুমের বড়ি খেয়ে উনি আত্মহত্যা করেছেন। এই শিশিটা আমি বাথরুমের তাকে পেলাম। আত্মহত্যা যে, তা এর থেকেই বেশ বোঝা যায়।'

'হতেই পারে না। একটি বড়ি মাত্র উনি খেতেন রোজ, আর এক বড়ি ঐ ওষুধ খেলে কেউ মারা যায় না।'

'এক শিশি খেলে মবে। সে ঘুম আর ভাঙে না কোনোদিন। এই দেখুন, শিশি একদম্ খালি!

'কী করে হবে? আমি তো নিজের হাতে খাইয়ে দিতাম ওঁকে। গরম জলে গুলে শোবার আগে রাত্তিরে।'

'তাহলে আপনি...আপনিই কি...?' বেমক্কা বলে বসি ঃ 'কিন্তু কেন এ কাজ করলেন? এ কাজ করাটা কি উচিত হয়েছে? এমনটা করতে গেলেন কেন?'

উনি চুপ কবে থাকেন। একটি কথাও কন না।

'আমায় বন্ধু মনে করে আমাব কাছে আপনি সব প্রকাশ করতে পারেন—অকপটে বলুন, কোনো ভয় নেই, আমি কাউকে বলব না, বিপদে ফেলব না আপনাকে। বিশ্বাস করতে পারেন আপনি আমায়।'

'কী থেকে যে কী হযে যায়! এই বিবাহ-তিথির কথাটা নিয়েই একেবারে আচম্‌কা ঘটে গেল কাণ্ডটা...রাত তখন দশটা হবে। আমবা শুতে যাব। ঠিক তার আগেই ঘটল।'

আমি উৎকর্ণ হয়ে থাকি।

'আমি একটু ঘটা কবে এবারকার উৎসব করার কথাটা পেড়েছিলাম। তার কারণ...কারণটা শুনে উনি বললেন, অ্যাঁ? এর মধ্যেই পঁচিশ বছর কেটে গোল্‌ডেন জুবিলি? তাই নাকি? শুনে যেন আঁতকে উঠলেন কেমন! অ্যাঁ? এর মধ্যেই পঁচিশ বছর কেটে গেল? আর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস হয়ে গেল তোমার? সে কী কথা গো?'

'তারপর?'

'তারপর আমি মামুলি ধরনে বলতে গেছি, মেঘে মেঘে কি বেলা হয় না? উনি বললেন দাঁড়াও, একবার ভালো করে দেখি তোমাকে। বলে আপাদ মস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। আঃ, বিস্তর খুঁত দেখা যাচ্ছে। আসবাব হিসেবে তুমিও নেহাত পুরনো হয়ে পড়েছো দেখছি। ইস্, ওঁর কথায় মাথাটা আমার ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল কেমন। উনি বললেন—ঘুমের ওষুধটা দাও তো এবার। এখন আর ভাবতে পারি না। ঘুম থেকে উঠে কাল সকালে যা করার করা যাবে। তারপর আমি ওষুধের বড়িটা গরম জলে গুলে ওঁকে দিলাম, খেয়ে দেয়ে উনি শুয়ে পড়লেন—'

'সে ঘুম আর ভাঙলো না ? তাই না ?' আমি শুধাই : 'গোটা শিশির সব বড়িগুলোই তো গুলে খাইয়ে দিয়েছিলেন আপনি ?'

'আমারও মাথার ঠিক ছিল না তখন। ঝোঁকের মাথায়...'

'যাক। লাসটা পাচার করলেন কোথায় ? কিভাবে ?'

'দুর্ভাবনার ভেতরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ওঁর গায়ে হাত পড়তেই চট্‌কাটা ভেঙে গেল। বরফের মত ঠাণ্ডা গা। উঠে বসলাম ধড়মড় করে। রাত তখন চারটে। নাকে হাত দিয়ে দেখলাম, নিঃশ্বাস নেই। হৃৎস্পন্দন বন্ধ। নাড়ি টিপে দেখলাম, টিপ টিপ করছে না। না, আর দেরি করা চলে না, এখুনি ময়লা ফেলা গাড়িটা আসবে। একটা বস্তার মধ্যে ওঁকে পুরো কোনোরকমে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে সেই ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে দিয়ে এলাম। ...জনমনিষ্যি কেউ তখন রাস্তায় ছিল না।'

'অত বড় দেহটা আঁটল ডাস্টবিনে ?'

'ফাঁকাই পড়ে থাকে ওটা। ওর মধ্যে জঞ্জাল তো কেউ একটা ফ্যালে না বড়, আশপাশেই ফেলে দিয়ে যায়—লক্ষ্য করেননি ? বস্তাটা নামিয়ে তারপর চারপাশের জঞ্জাল সব আমি চাপিয়ে দিলাম তার ওপর। স্তূপাকার করে দিলাম সব। তারপর সকালবেলা তামাম সাফ।'

মার্ডার লাইক ট্রুথ্ মাস্ট আউট—বলে যে, তা মিথ্যে না। অপরাধ আপনার থেকেই প্রকাশ পায়।

আর তা যদি না হত তাহলে কোনো খুনের রহস্যেরই আর কিনারা হত না কোনোদিন।

আমার ধারণাটা দৃঢ় হল। নিজের থেকে ধরা না দিলে অপরাধীদের কেউ কক্ষনো ধরতে পারে না, তারা প্রায় ভগবানের ন্যায়। নিজগুণে ধরা না দিলে, নিজরূপে প্রকট না হলে কার সাধ্য তাকে পাকড়ায় !

তাঁরাই যেচে এসে নিজেকে ধরিয়ে দেন—মাঝখান থেকে বাহবা পায় যতো গোয়েন্দা। তারাই বাহাদুরি লোটে। অথচ তাদের কিছু করতে হয় না, করবার নেইও কিছু।

এখানেও, এই রহস্যভেদে আমার যা কারিকুরি তার সবখানিই শ্রীমতীর। তাঁরই সৌজন্যে তাঁকে ধরলাম। আমার এই কীর্তি রামপ্রসাদের সেই বিখ্যাত এক লাইনে ব্যক্ত করা যায়...তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি !

কিন্তু ধরবার পরই বা আমার কী করবার এখন ?

সেই কথাই ভাবি।

'সবটাই ঝোঁকের মাথায় করা। ভেবে চিন্তে করিনি। কিন্তু এছাড়া কী করবারই বা ছিল আমার। প্রশ্নটা দাঁড়িয়েছিল এই...হয় উনি নয় আমি এই বাড়িতে থাকব। আমি ওঁকে না সরালে উনিই আমায় সাবাড় করতেন। উনি যখন আমাকে আসবাব বলেই ধরেছেন আর এত এত খুঁত পেয়েছেন—আরে উনি এমন খুঁতখুঁতে তখন...তাতে এটা একটা মরণবাঁচন প্রশ্নই। তাই নিজেকে বাঁচাবার খাতিরেই..বলুন, আমি কি খুব অন্যায় করেছি ?'

'না। না। কোনো অন্যায় হয়নি। আত্মরক্ষার অধিকার আপনার আছে বইকি। আইনতই রয়েছে। আত্মরক্ষায় অক্লেশে খুন করা যায়।' মানতে হয় আমায়।

'এর জন্যে কি আমার ফাঁসি হবে? আপনি কি পুলিসকে বলে দেবেন সব?'

'ক্ষেপেছেন? আপনি বিশ্বাস করে আমায় বললেন আর আমি বিশ্বাসঘাতকতা করে আপনাকে ধরিয়ে দেব? কিছু আপনি ভাববেন না। গোপেনের লাশ চিরকাল গোপন থাকবে।'

শুনে ওঁর স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। আমিও হাঁফ ছাড়লাম।

'গোপেন তো আসবাব বলতে কিছু একটা রাখেনি।' প্রসঙ্গটা পালটে দিতে আমি অন্য কথায় যেতে চাই—'একটা কিছু থাকলে নিয়ে যেতাম সঙ্গে করে—ওর স্মৃতিরক্ষার জন্যে। পুরনো আসবাব টাসবাব আছে কিছু পড়ে টড়ে—ঝড়তি পড়তি?'

'পুরনো আসবাব বলতে এক আমিই শুধু পড়ে আছি কেবল...আমাকে হলে যদি চলে...' থেমে থেমে উনি বলেন—'শুনেছি আপনার বাসায় একলাই থাকেন আপনি, বে-থা করেননি জানি, আপনিও একলা, আমিও একলা, বড়ো একলা।'

শুনে আমি চমকাই। রামপ্রসাদীর পর অতুলপ্রসাদী। তুমিও একাকী আমিও একাকী-র—সুর ওঁর গলায় গুণ গুণ করে শুনতে পাই। শুনে আমার বুক দুর দুর করে।

না। তা হয় না। আমার ঘরণীহীনঘরে অগাধ শান্তি। কোনো ঝামেলা নেই। একটুখানি ঘরের একখানা চৌকিতেই শোয়া বসা খাওয়া সব। লেখাপত্তর তারই চত্বরে। মুক্তারামের মুক্ত আরাম। অবাধ আনন্দ।

আর এক ফালি বারন্দার ডেকচেয়ারে বসে বসে দেখবার মতন অঢেল আকাশ। অদূরের মাঠে সবুজ ঘাস। দক্ষিণের উন্মুক্ত বাতাস সব সময়। স্বর্গ যদি কোথাও থাকে এইখানেই!

সঙ্গসুখ মোক্ষম জানি। আসঙ্গসুখও মন্দ নয়। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ সুখের বুঝি আর তুলনা হয় না। যেমন সুখ তেমনি শান্তি। তেমনি কারো জন্য কোনো দুর্ভাবনা নাস্তি!

একাকীত্বের অতুলনীয় প্রসাদে সেই নিঃসঙ্গসুখের স্বর্গে আমি কোনো অন্তরায় আনতে চাই না, অন্তরের দিক থেকে তো নয়ই, বাইরের দিক থেকেও না।

'স্মৃতি-চিহ্নটা আমাদের ক্লাবের জন্যেই চাইছিলাম। গোপেন আমাদের পুরনো বন্ধু আর খুব পপুলার ছিল তো।' তাড়াতাড়ি বলে বিদাই নিই।

আমার পক্ষেও এটা একটা মরণ-বাঁচন-প্রশ্নই!

রাণীযোটক

মেয়ে চাকুরেদের হোস্টেলের দরজায় গিয়ে কলিংবেলটা টিপল কুশল—বার তিনেক পরম্পরায়।

ঠিক লোকটির সাড়া দেবার ইসারা পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছে মণিকা।

'আমি তৈরি হয়ে বসেছিলাম, কখন তুমি আসবে!' বলল সে, 'চলো বেরিয়ে পড়ি এখন।'

'চা?'

আপিস থেকে বেবিয়ে সোজা চলে এসেছে কুশল। একটু কোথাও বসে গল্প করতে চাইছিল বুঝি। —'চলো না তোমার ঘরে।' দরজায় দাঁড়ি হয়ে না থেকে ড্যাশ দিয়ে এগিয়ে সেমিকোলনের মধ্যে গিয়ে পড়তে চায় বুঝিবা।

'এই সন্ধ্যেবেলায় কি কেউ ঘরে বসে থাকি নাকি? বেরিয়ে পড়া যাক। রাস্তায় কোথাও কোনো রেস্তরাঁয় বসে চা-টা কিছু খেয়ে নিলেই হবে।'

'রেস্তরাঁর চা আর তোমার হাতেব চা এক হোলো?' তবুও হেসে বলতে গেল কুশল।

কথাটা যেন গায়েই মাখল না মণিকা। বলল, 'এমন আশ্চর্য বিকেল দেখেচ এর আগে? আকাশের দিকে তাকাও তো! কী সুন্দর শরতের আকাশ—উজ্জ্বল কেমন! এমন সময়ে ঘরের ঘুপচিতে বসে চা বানাতে ভালো লাগে কারো? চলো বেরিয়ে পড়ি।'

'চা না খেতে চাও তো কফি হোক্ না। কফি হাউসে যাই তাহলে?' কুশল বলতে যায়।

কুশলকথায় কান দেয় না মণিকা।

'না। বড্ডো ভিড় সেখানে। ভিড়ের মধ্যে নয় আজ। এমন কোথাও চলো যেখানে দুজনের কথা তৃতীয় জনা শুনবে না। তৃতীয় জনেব ছায়া পড়বে না দুজনের মাঝখানে। গঙ্গার ধারে গিয়ে বসিগে বরং।'

আজকের দিন যেন আর সব দিনের মতন নয়, এমনই কেবল মনে হচ্ছিল মণিকার। কালকের পর পৃথিবীটা কেমন যেন পালটে গেছে হঠাৎ। সব কিছুই বদলে গেছে কখন! এক রাত্তিরে যেন এক যুগ পেরিয়ে এসেছে সে।

'দেখেচ? এখনো আমি এটা পরে রয়েচি!' মণিকা তার বাঁ হাতের অনামিকা তুলে দেখালো—'এই দ্যাখো! যতদিন বাঁচব ততদিন এটা আমার হাতে থাকবে। এইখানে।'

কালকেব সন্ধিক্ষণে দেয়া কুশলের বাগ্‌দানের আংটিটা তার হাতে আজ প্রায়-সন্ধ্যের মেদুর আলোয় ঝকমক করে উঠলো।

'সস্তা রুবির আংটি তো।' বলল কুশল—'যদি হীরের আংটি দিতে পারতাম, আহা, ওই হাতে কী মানাত যে!'

মণিকা হাসল, কিছু বলল না।

'তোমার হাতে উঠে যেন দাম বেড়ে গেছে ওটার। হীরেকে ধিক্কার দিচ্ছে যেন।'

'হীরের চেয়ে দামী। আমার কাছে অন্তত:।' মিষ্টি হেসে বলল মণিকা: 'তোমার কথার দামে ওর দাম। আমাদের দুজনের কথার দামেই দামী।'

'তোমার হাতে, মানে, আমার ভাবী বন্থর হাতে উঠেই ওটা বহুমূল্য হয়েছে।' কুশলের পুনরুক্তি: 'তোমার হাতে পড়তে পেয়েই ওর দাম। বললাম না?'

'যেমন আমার...তোমার হাতে পড়তে পেয়েই না?' বলল মণিকা। —'তোমার হতে পেয়েই আমার মূল্য আমি বুঝলাম।'

'তোমার দাম কে জানে? আমিই জানি কেবল। তোমার দাম কি তুমি নিজে জানো?' কুশলপ্রশ্নটা বুঝি তার নিজের কাছেই...তার আপনমনে। কথায় সেটা প্রকাশ পায় না।

'দ্যাখো, আমি ভেবে সব ঠিক করেছি। সব দিক খতিয়ে দেখলাম। আর মাস ছয়েকের মধ্যেই আমাদের বিয়ে হতে পারে।'

'বাঃ!' বলে উঠল কুশল। 'কিন্তু কী খতালে? কেমন করে খতালে?'

'আমাদের বিয়ে হতে আরো মাস ছয় লাগবে। কয়েক হাজার টাকা না জমলে কি বিয়ে করা যায়? তুমিই বলো না?'

'কয়েক হাজার!' চোখ বড়ো বড়ো হোলো কুশলের: 'কয়েক শ টাকাও যে পড়ে নেই আমার অ্যাকাউণ্টে।'

'হয়ে যাবে। হয়ে যাবে এর ভেতর। আমাদের দুজনেব চেষ্টা থাকলে হতে কতক্ষণ?'

'কী করে?'

'জমাব আমরা। টাকা জমিয়ে যাব এখন থেকে। আমাদের দুজনের টাকাই জমবে—একটা জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্টে। আমার পাস বইয়ে তের শ টাকার মতন জমানো আছে দেখলাম।'

'আমাদের জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্টে জমাব টাকা?' কুশল-জিজ্ঞাসা।

'তাই ত হবে। তা না হলে কি টাকা জমবে নাকি? তোমার টাকা আমার টাকা এক জায়গায় জমা হবে—দুজনেই টাকা রাখব, রেখে যাব, কিন্তু তুলতে পারব না কেউ। দুজনের সই একসঙ্গে না হলে তো টাকা তোলা যাবে না...কেমন? ভালো হবে না?'

'কিন্তু এত ঝঞ্ঝাট এখন থেকে কিসের জন্যে? বিয়ের পরে টাকা জমানো যায় না কি? তখন টাকা জমালেই ত হয়।' কুশল বলে, 'বিয়ের পর এমনিতেই তো জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্ট। আমাদের দুজনের সব টাকাই তো তোমার হাতে জমবে।'

'তা জানি। কিন্তু বিয়ের আগেই টাকাটা যে চাই আমাদের। দ্যাখো, বিয়ের পরেও আমরা এইভাবে আলাদা আলাদা থাকবো সেটা কি ভালো দেখায়? তুমি থাকবে তোমার মেসে আর আমি উইমেন হোসটেলের ছোট্ট একটা খুপরিতে—না, তা হতে পারে না। বিয়ের পরে সেটা যেন কেমনতরো। নিউ আলিপুরের দিকে ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট নিয়ে, বেশ সাজানো গোছানো ছোট্ট একটি ফ্ল্যাটে—থাকব আমরা দুটিতে, কী বলো?'

'এর জন্যে যে টাকার দরকার সেটা আমি বুঝি, কিন্তু কয়েক মাসের ভেতর এই কয়েক হাজার টাকা কী করে জমবে আমাদের?'

'কেন হবে না? ইচ্ছে থাকলেই হয়। তোমার ইচ্ছে আমার ইচ্ছে দুজনের ইচ্ছে এক হলেই হবে। তখন টাকা জমতে কতক্ষণ?'

'ইচ্ছে করলেই টাকা হয়!' কুশল হাসে।

'হয় না? আমরা যদি ইচ্ছে করি...এখন থেকেই ইচ্ছে করি যদি যে, আমরা আর

বাজে খরচ করব না, বেশি খরচা করব না, তাহলে কি টাকা জমে না? আর যে টাকাটা বাঁচানো গেল এইভাবে, রোজই যদি সেটা ব্যাংকে গিয়ে জমা দিয়ে আসি...এই ভাবে তিলে তিলে জমেই তো তাল হয়, হয় না কি?'

'তিলোত্তমায় দাঁড়ায়!' কথাটার তাল সামলায় কুশল, 'যেমন তুমি।'

'না না। এইভাবে উড়িয়ে দেয়ার কথা নয়।' নিজের থিসিসকে বাতিল করতে চায় না সে ঃ 'আমাদের বর্তমানের উপায় আবো বাড়াবার চেষ্টা করতে হবে আমাদের। টাইপ শেখার সময় স্টেনোগ্রাফিও কিছুটা আমি রপ্ত করেছিলাম, সেইটা আরো ঝালিয়ে নিয়ে আপিসের বড় সাহেবের কাছে আর্জি করে আমার এখনকার এই টাইপিস্টের কাজ থেকে লিফট পেলে, স্টেনোর কাজটা পেয়ে গেলে ডবোল আয় হবে আমার। আর তুমি তোমার আপিসে অ্যাকাউন্টস্ ক্লার্কের কাজ করো তো, অনেকখানি এগিয়েই আছো, এখন যদি একটু কষ্ট করে কস্টিংটা পড়েশুনে পরীক্ষাটা দিয়ে নাও, তাতে যতদিনই লাগুক না, তাহলে ঐ আপিসেরই তুমি অ্যাকাউন্টসের বড়বাবু, চাইকি অ্যাকাউন্টান্টও হয়ে যেতে পারো, পারো না?'

কুশল তালিয়ে দ্যাখে কথাটা। কিছু বলে না। কিন্তু ওর চোখ জ্বল্ জ্বল্ করে ওঠে, তাতেই বুঝি উত্তরটা প্রকাশ পায়।

'তাহলে চলো, আজই তোমাকে কাস্টিং-এর কোচিং-এ ভর্তি করে দিয়ে আসি। সদর স্ট্রিটে ওদের আপিসটা, আমি খবর নিয়েছি।'

'জানি আমি, তবে আজ না।'

কিন্তু বলতে কি, মনে মনে সে উৎসাহ পায়। ঘরণী হবে, ঘরণীর সঙ্গে সাজানো গোছানো সুন্দর ছোট্টো একটা ফ্ল্যাটও। সোফা সেট আছে ড্রইংরুমে, ফ্রিজ আছে, গ্যাসকুকিংয়ের ব্যবস্থা, স্টেইনলেস স্টিলের আসবাবপত্তর। ...মনের মত ঘরে প্রাণের মত ঘরণীকে নিয়ে ঘর বাঁধার সুখ কতো!

মেয়েরাই ছেলেদের মানুষ করে থাকে, কে যেন তাকে—বলেছিল কবে, মনে পড়ে তার। কেবল মা হয়েই নয়, বোন হয়ে, বন্ধু হয়ে, জায়ারূপে তিলে তিলে একটু একটু করে, একেবারে নিজের অগোচরে, তারাই গড়ে তোলে তাদের। গোটা মানুষটাকে। দক্ষ শিল্পীর মতই তাদের সেই কারুকার্য—তাদের নৈপুণ্য।

জীবনযুদ্ধে ছেলেদের জিতিয়ে দেয় মেয়েরাই। তাতেই তাদের জিত। মেয়েদেরও।

কুশলের বেলাতেও তাদের একজনের সেই কুশলতা প্রকাশ পেয়েছে বুঝি। কুশল প্রেরণা পায়।

কুশল কিন্তু তখন পরিহাসের সুরে বলেছিল তার বন্ধুকে—'যা বলছো ভাই! মেয়েদের কাজ হচ্ছে ছেলে মানুষ করা আর ছেলেদের কাজ হচ্ছে মেয়েমানুষ...'

কথাটা সে শেষ করেনি। গুহ্য কথাটা উহ্যই রেখে দিয়েছে।

'না না, হাসির কথা নয় ভাই! মানুষ গড়ার কারিগর কাউকে যদি বলতে হয় তো ঐ মেয়েদেরই বলা যায় কেবল। এই সঙিন্ দুনিয়ায় সঙ্গিনী ওরা না থাকলে আমরা যেতাম কোথায়!

'গোল্লায়। নির্ঘাত। এবং ওরা থাকতেও ঠিক সেইখানেই যাচ্ছি আমরা—ওদের নিয়েই যাচ্ছি যদিও।'

'এর সত্য তুমি জানতে পারবে একদিন। যদি তোমার বরাতে তেমন কোনো মেয়ে আসে কখনো...মেয়ের মত মেয়ে...সেদিনই তুমি এটা টের পাবে।'

'মানুষ গড়ার কারিগর যে ওরাই—ওই মেয়েরাই, তা কি আমি অস্বীকার করছি ভাই?' তবুও বুঝি বলতে গেছে কুশল একটুখানি ব্যঙ্গচ্ছলেই...'দুবেলাই দেখতে পাচ্ছি তো, হাটে বাজারে, হাজারে হাজারে মাআ-নুউ-ষঅ...ওদের হাতে গড়াপেটা। টিকুতে টিকুতে চলা বাজার করতে চলা যতো কেরাণী—দেখিনি কি? গাধা পিটে ঘোড়া করতে আর ঘোড়া পিটিয়ে গাধা বানাতে ওদের আর জোড়া হয় না ভাই, সত্যি!'

কিন্তু না, আসল সত্যটা সে টের পেয়েছে এতদিনে...আজ...এই মুহূর্তেই। এতদিন যেন সে আধখানা মানুষ ছিল...এবার যথার্থ অর্ধাঙ্গিনী লাভের পর পুরো মানুষ হবার নিগূঢ় সম্ভাবনা তার চোখের সামনে উজ্জ্বল! সে দেখছে। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছে সে।

'তা বেশ। চলো, সদর স্ট্রিটের দিকেই এগোই তাহলে।'

সোজা রাস্তা—সদর রাস্তাই ধরবে সে আজ জীবনের। তার ভাবী—অবশ্যম্ভাবী বৌয়ের নির্দেশে।

রাস্তার মোড়ে এসে সে ট্যাক্সির জন্যে দাঁড়ায়।

'না না, ট্যাক্সি নয়, রিক্সা-টিক্সা কিছু নয়। ও সব বাজে খরচ আজ থেকে নয় আর। হেঁটে যাব আমরা। কেন, হাঁটাটা কি খারাপ?'

'না, খারাপ কিসের! সারা দুপুর আপিসের মাথার খাটুনির পর হাত-পা খেলানো একটু মন্দ কি! ভালোই তো বেশ। ফুর্তি লাগে কেমন! তবে কি না, সদর স্ট্রিটটা অদ্দূর...সেইজন্যেই...'

'সেইজন্যেই ট্যাক্সি চাই! তাহলেই তুমি টাকা জমিয়েছো। টাকা জমেছে আমাদের!'

'সদর স্ট্রিট পর্যন্ত হাঁটবে তুমি? পারবে? অদ্দূর?'

'অদ্দূর কী? হাঁটলে দেখবে মোটেই বেশি নয়। পাশাপাশি গল্প করতে করতে হাঁটলে মনে হবে যে এটুকুন পথ! ফুরিয়ে গেল এক্ষুণি! মনে হবে আরো একটু বেশি রাস্তা হলে ভালো হোতো আরো। হাঁটতে যে কী ভালো লাগে তুমি জানো না! মনের মত সঙ্গী পেলেই অবশ্যি।'

'তা, তুমি যদি চাও, তোমাকে আমি খিদিরপুর ঘুরিয়ে আলিপুর হয়ে চেতলা পেরিয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউ ধরে, লেকের পাশ দিয়ে গড়িয়াহাট মার্কেট গড়িয়ে, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড চক্কর দিয়ে, লোয়ার সার্কুলারে পাক খেয়ে, পার্ক স্ট্রিট পার হয়ে চৌরঙ্গী ধরে নিয়ে যেতে পারি সদর স্ট্রিটে।'

হাসলো মণিকা: 'নিয়ে চলো। তাহলেও মনে হবে এইটুকুন।'

'তুমি সঙ্গে থাকলে জাহান্নামে যাওয়াও আমার পক্ষে সোজা।' কুশল জানায়।

'ট্যাক্সি ফ্যাকসিতে আজে বাজে বেহিসেবি খরচ না করে যদি সেটা আমরা জমাই, জমিয়ে যাই, হপ্তায় বিশ পঁচিশ টাকা কি আর না জমে! রোজই কি কিছু কিছু বাঁচানো

যায় না? এমনি মাসে মাসে দু আড়াইশো টাকা...দুজনের মিলিয়ে যদি পাঁচশো টাকা পুরো বাঁচে তাহলে ছ মাসে কতো টাকা হয় খেয়াল আছে তার?'

'তিন হাজার।' কস্ট্ অ্যাকাউন্টেন্সির কোনো পরীক্ষা পাশ না করেই বলে দিতে পারে কুশল।

'তাহলে পথও যেমন দেখতে দেখতে ফুরোয়, বিয়ের দিনও তেমনি দেখতে দেখতে এগিয়ে আসবে।'

'দেখতে না দেখতেই।' সায় দেয় কুশল।

'তবে?'

'তবে মেট্রয় এ হপ্তায় একটা খুব ভালো ছবি এসেছিল জানো?' রাস্তাব মোড় না ঘুরতেই কথার মোড় ঘোরায় কুশল।

'জানি। ছবিটা দেখার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু সাহেব পাড়ার ওই সিনেমায় অত দামী টিকিট কেটে ছবি দেখাটা কি উচিত আমাদের? টাকা জমাতে হবে না? এখন দিনকতক আমরা কোনো থিয়েটার নয়, সিনেমা না, সার্কাস টার্কাস সব বাদ। বাড়ি বসে সন্ধ্যেবেলায় বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক গান এই সব শুনব। বেতারনাট্যও শুনতে পারি। খুব মজা হবে না?'

'খুব মজা।' একটু যেন ক্ষুব্ধ কণ্ঠই শোনা গেল কুশলের।

'উত্তর কলকাতাব একটা ছোট্ট থিয়েটারে শুনছিলাম অ্যানটনি ফিরিঙ্গির পালাটা নাকি ভারী জমেছে। সবিতাব্রতর অভিনয়, গান...!' ক্ষুব্ধ কণ্ঠ পেরিয়ে ক্ষুব্ধ গুঞ্জন শোনা যায় ওর।

'আমারও দেখবার ইচ্ছা খুব। কিন্তু এখন ওসব নয়। এখন আমাদের আত্মসংযম করতে হবে না?'

'আত্মসংযম? কিন্তু সে তো কেবল একটা বিষয়ে।' কুশল বলে।

'না। সব বিষয়েই। তা যদি না করি তো সংযমহানির কোনো সুযোগই আসবে না জীবনে—বিয়েই হবে না আমাদের।'

চৌরঙ্গীর কিনারে এসে পৌঁছতেই আকাশ ওদের সামনে প্রসারিত হল অকস্মাৎ। মণিকার চোখ টানল কুশল—'আকাশের চেহারাটা দেখেচ? ঐ কোণটা মেঘলা হয়ে এসেছে। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে এলো। বৃষ্টির আঁচ পাচ্ছি।'

'বুঝেছি, ট্যাক্সির জন্যে মন ছুঁক ছুঁক করছে তোমার। সারি সারি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে কিনা, বৃষ্টির আঁচ পাচ্ছো তাইতেই।' মণিকা এক ফুৎকারে আকাশের সব মেঘ উড়িয়ে দিতে চায়।

'না আঁচালে তোমার বিশ্বাস হবে না বুঝলাম।'

এবং বলতে না বলতেই আকাশের আচরণ কুশলের কথায় সায় দিল আচম্কা। বেশ বড়ো একটা ফোঁটা মণিকার কপালে এসে পড়ল টুপ করে। বিদ্যুৎচমকও দেখা দিল। নিজের কপালটা মুছে নিল মণিকা।

'কেমন? বলছিলাম না? কপালে তোমার বৃষ্টি আছে আজ। শাড়ি টাড়ি ভিজে সব একশা হবে।'

'তাহলেও তোমার ঐ ট্যাক্সি নয়। আমরা ততক্ষণ আশ-পাশের একটা চায়ের কেবিনে বসে কাটাব না হয়। বিকেলে তোমার চা খাওয়া হয়নি বলছিলে না তুমি, মনে আছে আমার।'

'কিন্তু বৃষ্টি? চায়ের পেয়ালা নিয়ে কতক্ষণ বসতে দেবে আমাদের?' কুশল জিজ্ঞাসা ঃ 'বৃষ্টি যদি চট করে না ছাড়ে?'

'শরৎকালের বৃষ্টি কতক্ষণ আর? শিশুর কান্নার মতই তা এই কাঁদছে এই হাসছে আকাশ।'

সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ল বৃষ্টিটা। আর তারাও এসে ঢুকল একটা রেস্তরাঁয়। চায়ের পেয়ালার মুখোমুখি বসল দুজনায়।

কিন্তু বৃষ্টির ছাড়বার নামটি নেই এদিকে। পড়ছে তো পড়ছেই। শরৎকালের বৃষ্টি হলেও দেখা গেল এ-শরৎ সে-শরৎ নয়। আদৌ চাটু নয় তেমন। রীতিমতই কড়া। একটু থেমেই না, ফিরে ফিরে আসছে ফের। বাজের আওয়াজের সাথে। দস্তুরমতই ফেরেব্বাজ।

'চায়ের পেয়ালা হাতে এমনি করে কি বসে থাকা যায়?' কুশল শুধায়।

'পেয়ালাও তো খালি এদিকে।'

'পেয়ালা যে খালি, শুধু আমরা নয়, সবাই দেখচে সেটা।'

'আরো দু পেয়ালা নেয়া যাক তাহলে?'

'খালি চা? সেটা কি ভালো দেখায়? বিশেষ করে এই চৌরঙ্গী পাড়ার রেস্তরাঁয় বসে...তা যতই ছোটখাট রেস্তরাঁ হোক না!'

'বেশ দুখানা মোগলাই পরোটার অর্ডার দাও তাহলে।'

'সঙ্গে?'

'সঙ্গে তরকারি দেবে'খন এমনি। দুখানা পরোটাই কেবল মাংস টাংস কিছু নয় কিন্তু।' প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে পরিরাও কতখানি বদ্ধপরিকর হয়, কুশলের সামনে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চায় মণিকা।

কিন্তু বৃষ্টির দেবতা প্রত্যক্ষে কাঁদলেও অলক্ষ্যে হাসেন বুঝি।

মোগলাই পরোটায় শানায় না। চপ কাটলেট আনাতে হয়। তাতেও থামানো গেল না বৃষ্টিকে। বিরিয়ানি আর শিককাবাব এলো। কিন্তু বৃষ্টি গেল না।

বাধ্য হয়ে মাটন গ্রেভি আর চিকেনকারি নিয়ে পড়ল ওরা। কিন্তু তাতেও দমলো না—না বৃষ্টি, না ওরা। পরোটার পর এটা ওটা নিয়ে পরখ করতে করতে পুরোপুরি ভূরিভোজই হয়ে গেল ওদের।

অঝোরে ঝরতে লাগল বৃষ্টি। একটা ট্যাক্সি এসে খাড়া হোলো সেই সময়—রেস্তরাঁটার ব্যালকনির তলায়, সামনেই।

'ট্যাক্সিটা ধরা যাক, কী বলো?' মনিকাই বলল এবার। 'খাবারের বিল মিটিয়ে কতো আছে আমাদের দ্যাখো তো?'

দুজনের পার্স কুড়িয়ে কয়েক টাকা কিছু রেজকি মিলল। 'এতেই বাড়ি ফেরা যাবে বেশ।' বলে কুশল ট্যাক্সিটাকে ধরল।

'কিন্তু এইটুকুর জন্য ট্যাক্সি!' কুশন্ সিটের আরামে কুশলে বসেও কেমন খুঁত খুঁত করে মণিকা।

'কী করা যাবে! ভিজে ভিজে তো আর যাওয়া যায় না।' কুশল সাফাই গায়। 'বৃষ্টিতে ভেজা মাঝে মাঝে মন্দ নয় জানি, মজাও লাগে বেশ, কিন্তু এই সিজন চেন্‌জের সময় ঠাণ্ডা লেগে শেষটায় যদি ব্রংকাইটিসে গড়ায় কি নিউমোনিয়া দাঁড়িয়ে যায় তো সে আবার অনেক টাকার ধাক্কা তখন।'

'তা বটে।' মণিকা হিসেবী মেয়ের মতই মুখখানা করে। ট্যাক্সি চেপে যেন অনেক টাকা বাঁচানো গেছে মনে মনে খতিয়ে সান্ত্বনা পায় সে।

বর্ষণমুখর পথে ট্যাক্সি চেপে যাওয়া একটা বিলাসিতাই। ট্যাকসির সার্সি বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছে, দুধারের পথ ঘাট লোক জন ঝাপসা ঝাপসা—ট্যাক্সির ছাদের ওপর টুপুর টাপুর—নূপুরের মতন মিষ্টি আওয়াজ।

'কাল থেকে আমরা জমাবো। কাল থেকে ঠিক। বুঝেচ?' গুঞ্জন করে মণিকা। কুশল সমঝদারের মতন মাথা নাড়ে।

নিজের হোসটেলের দ্বারদেশে এসে মণিকা একটু আদর করল কুশলকে। 'কাল সন্ধ্যেয় আর আমরা বাইরে বেরুব না, কাল থেকে আর নয়। ঘরে বসে গল্প করব দুজনে।' আদর করেই বলল কথাটা। '—বাইরে বেরুব না আর। এই ছ মাস নয় এখন।'

'হ্যাঁ। বাইরে বেরুলেই খর্চা।' কুশল ওর কথায় সায় দেয়—'কী করে যে কোথা দিয়ে টাকাগুলো যায় উড়ে জানাই যায় না।'

'নোট ভাঙ্গালেই ফর্সা। আর কাপড় ভাঙ্গলেই ময়লা। জানো তো?' মণিকা জানায়ঃ 'কাল থেকে—হ্যাঁ, কাল থেকেই আমরা জমাবো, কেমন তো?'

পড়শীর টান

ফ্ল্যাটে থাকার নানান অসুবিধা। পাড়ায় থেকে যদি বা প্রতিবেশীকে এড়ানো যায়, ফ্ল্যাটবাড়িতে বাস করে সেটা দায়।

পাড়ার সবাই আলাদা আলাদা বাসিন্দে কিন্তু এখনকার এই আটচালার আধুনিক সংস্করণ আট তালায় তোমার ওপরে নীচে আশেপাশে চার ধারেই ফ্ল্যাট—আর ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে বৈন্যস্ত পাড়াপড়শী।

এক বাড়ির মধ্যেই গোটা একটা পাড়া—এড়াবে কাকে? এই পাড়াটেদের সাঁড়াশী

আক্রমণ থেকে পালাবে কোথায়? পোড়োবাড়ির ঠিক উল্টো, আস্ত একটা পাড়া-বাড়ি—রীতিমত বাড়াবাড়ি এই ফ্ল্যাট সিসটেম।

পাড়াগাঁয় থাকা বেশ বাবা! দূরে দূরে বাস, আর গ্রামবাসীদের ভেতর আড়া-আড়ি। কাছাকাছি থেকেও সবাই সুদূরপরাহত। কিন্তু আমাদের ফ্ল্যাটমহল্লার এই বেয়াক্কেলে বসবাসের আওতায়, একমাত্র দুর্বাসারাই বোধহয় বাঁচতে পারে—ছোঁ-আঁচ বাঁচিয়ে। তিরিক্ষে মেজাজের না হলে বাঁচন নেই। ষাঁড়ের মতন একলষেঁড়ে হলে তবেই রক্ষে! তাহলে বাসাড়েরা কাছ ঘেঁসে না। কিন্তু আমার ন্যায় মাটির মানুষ যারা—দুর্বাসা নয়—বরং দূর্বার মতই অসার, তাদের তো এই আধুনিক হানাবাড়ির পড়শীরা দুর্বার বেগে দলে যায়—পায় পায় মাড়িয়ে চলে।

বিশেষতঃ, যে বিয়ে করেনি তার ঘরে তো অবাধ প্রবেশ সবাইকার। নেপথ্যে পর্দানশীন কেউ নেই বলে বেপরোয়া যে কেউ যখন খুশি সেখানে এসে হানা দিতে পারে, খেয়ালমাফিক আড্ডা জমাবার বাধা নেই কারো। আর, যার অন্দর বলে কিছু নেই তার অন্তর বলেও কিছু থাকতে নেই। তার ঘর তো বারোয়ারি মণ্ডপ—সকলের বেসরকারী বৈঠকখানা।

নিজের ফ্ল্যাটে, নিজের বিছানায় ফ্ল্যাট হয়ে একান্তে একাকী যে একটুখানি আয়েস করব, নিজের অন্ত পাবার প্রয়াস পাব, তার যো কই? অমনি পাশের ফ্ল্যাট থেকে শ্রীমান বৃন্দাবন এসে হাজির!

নবী পায়ে মুখ কালো করে এল। এসে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল ঠেসে। বসেই থাকল। বেশ গুম হয়ে থাকল—অনেকক্ষণ।

'বৃন্দাবন অন্ধকার যে! কী ব্যাপার?' আমি আর থাকতে পারলাম না।

'আর বল কেন দাদা?' বলল বৃন্দাবন—'ওপরের লোকগুলোই খেল আমায়। ডোবালো একেবারে।'

মজ্জমান ভুক্তভোগীর প্রতি আমার মজ্জাগত সহানুভূতি।—'কী রকম? কী রকম?' আমি উৎসুক হয়ে উঠি। উঠে বসি নিজের বিছানায় উৎসাহিত হয়ে।

'খালি ধাবে কাটছে আমায়।' জানাল সেঃ 'এ-ধারে ও-ধারে চার ধারেই কাটছে। এটা ওটা সেটা—একটা কিছু হাতাচ্ছেই আমার কাছে সব সময়।'

এই বলে বৃন্দাবন হাত বাড়িয়ে পাশের টেবিলের মাখনের কৌটোর থেকে চামচে করে খানিকটা খামচে নিয়ে নিজের মুখে পুরল।

মুখ মুছে বলল তারপরঃ 'বেশ খেতে। অস্ট্রেলিয়া না নিউজিল্যাণ্ড?'

'খাঁটি হরিণঘাটার। ক্যামিশ।' আমি ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললাম।

'কী করে শুরু হল বলি। প্রথম যখন এল ওরা ওপরতলায়—মাস তিনেক আগের কথা—সদ্যবিবাহিত দুটি তরুণ-তরুণী—কপোতকপোতী যথা উচ্চ গৃহচূড়ে—কী করে যেন আলাপ হয়ে গেল আমার সঙ্গে। সিঁড়ি ধরে উঠতে নামতে ধাক্কা লেগেই, না, কী করে ঠিক বলতে পারব না। গায়ে পড়া আলাপ মোটের ওপর। তা হোক, মেয়েটির মুখখানি বেশ মিষ্টি—দেখলেই কেমন মায়া করে।' বৃন্দাবন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে। এবং আরো খানিকটা মাখন মুখের মধ্যে পাচার করে দেয়।

'মায়ার কথা বাদ দাও।' আমি বলি ঃ 'তোমার মায়াবাদ রাখো। সার কথা কও শুনি।'

'তাই তো বলছি হে!' মুখ মুছে সে জানায় ঃ 'কিন্তু মায়ার কথা বাদ দিয়ে কি বলা যায়? মেয়েটির নামই যে মায়া।'

দৈর্ঘ্যহীন তার দ্বিতীয় প্রস্থ নিঃশ্বাস।

'তাহলে তো ওই মায়া ক্রমেই বাড়বে। বাড়বে ছাড়া কমবে না।'

'বেড়েওছে। প্রথম অবশ্যি এসেছিল ছেলেটিই—কয়লা ভাঙা হাতুড়িটা চাইতে। সেই থেকেই আরম্ভ। সে তো গেল গোড়ার কথা। সেদিনকার সকালের কথা। সন্ধ্যের পরেই সে দেখা দিল আবার—মশারি খাটাবার জন্য গোটা কয়েক পেরেক চাই তার। দিলাম পেরেক।'

'মশারি চায়নি তো?'

'না। তারপর থেকে মেয়েটিই শুরু করল আসতে। চায়ের জন্য এক ফোঁটা দুধ কিংবা চা-ই, মানে চায়ের গুঁড়ো, নয়তো একটুখানি মিলো কিংবা কয়েক চামচ চিনি...'

'চিনি? বল কি হে?' আমি বলি—'এ যে মিলো-নে মাধুর্য!'

'হ্যাঁ, চিনি।' ম্রিয়মলিন হাসি হাসলো বৃন্দাবন ঃ 'মাইলো কি ওভালটিন দেওয়া যায়, কফি কি কোকোমালটিন, এমন কি খালি টিনও দেয়া চলে কিন্তু চিনি দেয়া এই রেশনের বাজারে—'

বৃন্দাবন আর কিছু বলে না। বলতে পারে না। নিঃশ্বাস ছাড়ে।

ওর নিঃশ্বাস ছাড়ার অলক্ষ্যে আমি মাখনের কৌটোটা নেপথ্যে সরিয়ে রাখি। ওর নিঃশ্বাসের সঙ্গে মাখনের নিঃশেষ হওয়ার সম্পর্ক আছে। কিছু বিশ্বাস নেই।

'এই রেশনের বাজারে...' ওর অনুযোগটা আমাকেই সম্পূর্ণ করতে হয়, 'প্রায় অপারেশনের মতই। কিন্তু তোমার কাছে ধার চাইছে বইত না।'

'হ্যাঁ, ধার। ধার তো বটেই। তবে ধারটাই বড্ডো বেশি যে। দিব্য বড়দা পাতিয়ে মেয়েটি বড়ো দা দিয়েই কাটছে আমায়। বেশ ধারালো দা ভাই।'

'বড়ো দা-ও পেয়েছে। বড় দাঁও-ও পেয়েছে দেখছি।' আমি সায় দিই ওর কথায়।

'হুম্, বড়ো দা।' বলেই গুম হয়ে যায় বৃন্দাবন। টেবিলের ওপরে মাখনের কৌটোটা খোঁজে। দেখতে না পেয়ে কেমন যেন মনমরা হয়ে যায়।

'তোমার সম্বন্ধে উচ্চধারণা আছে মেয়েটির—মনে হচ্ছে।' ওঁকে উৎসাহিত করার প্রয়াস আমার।—'তোমাকে ব্যাঙ্ক অব বরোদা ঠাউরেছে হয়তো বা।'

'বলতে কি, সত্যিই একটু মায়া হয়েছিল গোড়ায় আমার। তরুণ দম্পতি, আনকোরা বিয়ে, কপোতকপোতীর মতই অসহায়। আনাড়ি, নতুন সংসার পাতছে, সংসারের কিছুই জানে না। কার না মায়া হয়?'

'তারপর মেয়েটি মায়া হলে তো কথাই নেই আর।' মাঝখান থেকে আমার ফোড়ন-কাটা।

'তাই ভেবেছিলাম একটু সাহায্য করা যাক ওদের। কিন্তু সেই গোড়াকার টান এখন আগায় এসে...'

বৃন্দাবন চুপ করে থাকে। তারপর আর আগাতে পারে না।

দুঃখ হয় আমার। গোড়ায় বিচার করে কাজ করেনি, মায়ায় জড়িয়ে পড়েছে, এখন কোথাও চারা-খুঁজে পাচ্ছে না। বেচারা!

'এমনটা হবে ভাবতে পারিনি গোড়াগুড়ি।' বলে বৃন্দাবন থামে। আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে কি না ভাবে।

তারপর মাখনের কৌটটা দেখতে না পেয়েই কিনা কে জানে, সংযত হয়।

'গোড়াতে শুধু গুঁড়িটাই ছিলো!' আমি বলি, 'এখন ক্রমে ক্রমে আগাতে আগাতে পত্রপল্লব শাখাপ্রশাখা বেরিয়ে আগাগোড়াই টানাটানি দাঁড়িয়েছে।'

'হ্যাঁ, ভাই।'

'অনেক ফ্যাকড়া।' আমার সহানুভূতি জানাই।—'টানায় কিছু রাখা যায় না এখন আর। কী বলো?'

বৃন্দাবন কোন জবাব না দিয়ে দৃষ্টান্ত দিল। টেবিলের তলার থেকে মাখনের কৌটোটা তুলল। তারপর দেরাজের টানা থেকে চিনি বার করে মাখনের সঙ্গে মাখিয়ে নিল.বেশ করে।

চিনির কথা তো আগেই উঠেছিল। এখন টানাটানির কথায় টানার কথাটা মনে পড়ে গেল তার। চিনল টানাটা, টানল চিনিটাও।

বৃন্দাবনকে চিনি তো। ননী মাখনের ওপর ওর এই রাহাজানি একান্তই বৃন্দাবন-সুলভ। দ্বাপর যুগ থেকেই চলে আসছে। বরাবর। আমি আর ওদিকে তাকাই না।

তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়ি: 'তারপর কী হল? কী দাঁড়িয়েছে তারপর এখন?'

মাখনের প্রতি বিমুখ করার জন্য ওর মুখ অন্যদিকে আকৃষ্ট করার আমার অপচেষ্টা। ওর জিভকে অন্য বিষয়ে উজ্জীবিত করা যায় কিনা দেখি। কাজের কথায় না হলেও কথার কাজে ব্যাপৃত রাখতে চাই।

'তারপর?' তারপর মাখনজড়িত মিঠে গলায় ও বলে: 'তারপর আজ এটা কাল সেটা—বলেছি তো। যেটা নেয় সেটা আর ফেরত দেয় না। এমন কি আমার মশাতাড়ানো ফ্লিট আর হ্যাণ্ড-স্প্রেটাও নিয়ে গেছে। তাইতেই আমায় কাহিল করে দিয়েছে আরো। মশার জ্বালায় রাত্তিরে ঘুমুতে পারিনে ভাই!' বৃন্দাবন ফোঁস করে ওঠে।

'ফ্লিট নিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাট করে দিয়েছে—বল কী হে?' সত্যি, মায়াদের অমায়িকতায় বিহ্বল হতে হয় বইকি!

'হ্যাঁ। কিন্তু সেইখানেই ইতি নয়। আজ সকালে আবার মেয়েটা এসে আমার টেলিফোনটা ইউজ করতে চেয়েছে। কাকে নাকি ফোন করবে বিকেলে।'

'সর্বনাশ করেছে!' কোন বান্ধবীর সঙ্গে টেলিফোনের ঘনিষ্ঠতা ঘটলে অনিষ্টতা কতদূর গড়াতে পারে আমার অভিজ্ঞতায় অজানা ছিল না। আমি আঁতকে উঠি।

'কী করা যায় এখন?' ও আমার পরামর্শ চায়। আর সেই ফাঁকে আরেক তাল মাখন মুকড়েনে পাচার করে দেয়।

'নাইদার এ বরোয়ার নর এ লেণ্ডার বি।' আমি শেক্সপিয়ার ধরে টান মারি। —'কাউকে কোন জিনিস কখনো লেণ্ড করো না।'

জুতসই একটা স্বদেশী বচন খুঁজেছিলাম, পেয়েছিলামও, কিন্তু আওড়াতে গিয়ে দেখলাম সেটা মজবুতসই হয় না। বিবেচনা করতে গেলে 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'-এর বয়েতটা বৃন্দাবনের বিপক্ষেই যায়। মায়াবাদের ওপরে ফের চার্বাক-বিস্তার করে কাটা ঘায় নূনের ছিটে নয়, ফাটা পায় ঘিয়ের মালিশ দিয়ে পালিশ চড়িয়ে আরো চটকদার করার মতই হবে বই তো নয়!

'ছোঁড়াটা আর আসে না আজকাল, ছুঁড়িটাকেই পাঠায়। ও যদি আসত আর ধার নেয়া হাতুড়িটা ফিরিয়ে দিত আমায়—একবারটির জন্যও অন্তত—তাহলে ওর মাথায় সেটা ঠুকে—ভাল করে ঠুকে ঠুকে—পরের ওপর নির্ভর করাটা যে কদ্দূর খারাপ তা বেশ করে সমঝে দিতাম ওকে। হাতে নাতে শিক্ষা যাকে বলে। কিন্তু মেয়েটাই আসে যে।'

'দরজা বন্ধ রাখো। কড়া নাড়লেও খুল না। কিছুতেই নয়।' আমি ওকে বেশ কড়া হতে বলি 'একটু কড়াকড়ি করলে হয় না?'

'তাই করেছিলাম ভাই একবার। কিছুতেই খুলিনি দরজা। পরে টের পেলাম, অনেক পরেই অবিশ্যি, একজনের কাছে আমি পাঁচ টাকা পেতাম, সে-ই নাকি টাকাটা ফিরিয়ে দিতে এসেছিল—এসে কড়া নেড়ে সাড়া না পেয়ে ফিরে গেছে। বলে মনের দুঃখ লাঘব করতে আরেক তাল মাখন এই তালে টাকরার তলায় তলিয়ে দিয়ে টাকার শোক ভুলতে লাগে।

'তাহলে 'না' বলতে চেষ্টা কর।' আমি বাতলাই, 'হাঁ করে সব সহ্য না করে 'না' বললেই পারো। দেব না—ফুরিয়ে গেল। না—না—না। একবার তাই বলেই দ্যাখো না। অন্ততঃ চেষ্টা করতে দোষ কী?' নাস্তিক্য-ধর্মে ওকে আমার দীক্ষাদান।

'না। কাউকে আমি না বলতে পারি না।' সে হাঁ করে বলে।

বলতে কি, সে হাঁ করেই ছিল যেন—এখানে এসেও। তার সেই হাঁ-কারের ভেতর দিয়ে আমার মাখনের ওপর তার আরেক হামলা যায়।

তারপরে বিমর্ষ হয়ে বলেঃ 'একবারে কারো মুখের ওপর ওকথা বলতে আমার বাধে। কেমন যেন কুণ্ঠা হয়। মুরোদ হয় না, বলতে পারো।'

'মরোদ নেই?' আমি বলিঃ 'তুমি তাহলে মরদ নও। মুর্দা।'

'যাই বলো। কাউকে 'না' বলতে আমি নিতান্ত কুণ্ঠিত!'

মায়াবাদী, তার ওপরে নাস্তিক না, এ হেন লোকের পরকালে বৈকুণ্ঠ থাকলেও ইহকাল যে ঝরঝরে সেকথাটা ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দিই। আজকের সংগ্রামী জীবনের এই তুফানে যে না-য় stickকরতে পারে না তার নির্ঘাত জলাঞ্জলি। ভরাডুবি।

'তুমিই বল না কোন মেয়েকে কখনো 'না' বলা যায়? কেউ পারে বলতে? অমন মিষ্টি মায়া নাম না হয়ে তার নাম না হয় মহামায়াই হল? আন্নাকালী কি কৈবল্যাদায়িনী হল নাহয়? 'না' কি বলা যায়? মায়া করে না বলতে?'

'তাহলে তোমার দয়ামায়া নিয়েই থাকো।' বিরক্ত হয়ে আমি বলি।

'থাকব কি, থাকতে হচ্ছে। তা আবার তুমি বলবে!'

'তাহলে এক কাজ করো, শত্রু পরিখায় গিয়ে চড়াও হও—লড়াই চালাও সেখানে।' আমি বুদ্ধি ধার দিই—ওর বুদ্ধিতে শান দিয়ে: 'অ্যাটাক হচ্ছে বেস্ট ডিফেন্স। আক্রমণই আত্মরক্ষার উপায়। ওদের শেখানো বিদ্যা ওদেরকে শেখাও গে। চলে যাও ওপরের ফ্লাটে—যখন তখন—কারণ অকারণে—নুন, চিনি, আলু, পেঁয়াজ, গরমমশলা চেয়ে আনো গিয়ে। আর হ্যাঁ, সেই সঙ্গে পাঁচফোড়ন চাইতেও দ্বিধা কোরো না।'

বৃন্দাবনের তপ্ত কটাহে—ওর মাথার খুলিতে—যেখানে ঘিলু থাকার কথা কিন্তু নেই, সেই খোলায় আমি খানিক ঘি ঢালি। তারপর ফোড়ন দিই। যদি একটু বুদ্ধি খোলে তার।

'যা বলেছো!' বলতে না বলতে সে চড়বড় করে ওঠে:_'হ্যাঁ, এটা মন্দ নয়। একটা কথার মত কথা। তোমার এ যুক্তিটা বেশ।'

'বেশ। তাহলে এইটেই পরীক্ষা করো গে।'

'করে দেখব। আচ্ছা, তোমার ঘরে কি রুটিফুটি কিচ্ছু নেই? খালি মাখন শুধু?' বলে সে উৎসুকনেত্রে চারিধারে চায়। কিন্তু কোন তাকে কোথাও তার তাক না পেয়ে মাখনের কৌটোয় চামচ বাড়ায়। '—খালি মাখন কি খাওয়া যায় খালি খালি?'

খালি মাখনের অখাদ্যতায় বুঝতে পারি মাখনেরও খালি হবার দেরি নেই আর। তাড়াতাড়ি বলে উঠি—'যাও না, এখুনি যাও। মায়াদের কাছ থেকে আধ পাউণ্ডের রুটি একখানা ধার করে আনো গে। নিয়ে এস না গিয়ে।'

'মন্দ বলোনি।' বলেই সে লাফিয়ে ওঠে—আরেকটা মাখনের ডেলা গালে পুরে দিয়ে গলে পড়ে।—'দাঁড়াও, এক্ষুনি জব্দ করছি ওদের।' বলে যায় সে। লাফাতে লাফাতে চলে যায়।

মিনিট কয়েক বাদেই লাফাতে লাফাতে ফিরে আসে। আস্ত এক পাউণ্ডের ফার্পো তার হাতে। যেমনি মোটা তেমনি গোটা একখানা। ওর মতই হৃষ্টপুষ্ট।

আমার ওষুধের হাতে হাতে ফল হয়েছে দেখে আমার উল্লাস হয়।

'দেখলে!' উৎফুল্ল হয়ে আমি বলি—'সুদ সুদ্ধ উশুল হয়ে গেল—দেখলে তো?'

'তোমার কথাটা গোড়ায় আমি তলিয়ে দেখিনি। কিন্তু ঘর থেকে বেরুতেই টের পেলাম। আসল রহস্যটা বুঝতে পারলাম তখন। বুঝলাম যে শুধু ওরাই আমার নয়, আমিও তো ওদের প্রতিবেশী। সবাই সবার প্রতিবেশী এখানে। বুঝেই না—'

বলতে গিয়ে বৃন্দাবন বুজে যায়—খানিকক্ষণের জন্য। মাখম মাখানো রুটির খণ্ডটা, গণ্ডে পিণ্ডে গিলে, বুজিয়ে দিয়েছিল ওকে।

তাহলেও বৃন্দাবন আমাদের বুঝদার। সবকিছু তলিয়ে বোঝার লোক সে। সে কথা আর বলতে হয় না। বুঝেই মুখ খোলে—

'হ্যাঁ, ভাই! তলিয়ে বুঝলাম তোমার কথাটা। বুঝেই না তলার ফ্ল্যাটের ভাড়াটেদের কাছ থেকে চেয়ে আনলাম রুটিখানা।' বৃন্দাবন আমায় জানালো—'তলাপাত্র না কি

যেন তারা। তল্পাপাত্র কি উপুড়পাত্র...তা সে যাই হোক, চমৎকার লোক ভাই! চাইতে না চাইতেই দিলো তারা।'

বিকল্প নায়ক

ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ আমার জীবনেও এসেছিল একবার। নায়কের ভূমিকায় নয়, তবে তাকে ঠিক সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট হীরোর সাইড পার্টও বলা যায় না হয়তো। যথাযথ বললে বিকল্প নায়কের ভূমিকাই বলতে হয় বরং।

বেশ কিছুদিন আগের কথাই। আমার লেখক বন্ধু গৌরাঙ্গ প্রসাদ অকস্মাৎ লেখার খেয়াল ছেড়ে দিয়ে ছবির এলাকায় গিয়ে পড়ল। কেন জানি না, সাহিত্যিকরা প্রায় সবাই এক এক সময় ছবি নিয়ে মশগুল হয়ে যায়। তবে গৌরাঙ্গ ঠিক রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর বা বনফুলের ন্যায় চিত্রশিল্পী না বনে সোজা একেবারে ছায়াচিত্রের অরণ্যে গিয়ে ঢুকল।

বেশ কয়েকটা নাম-করা ছবিও তুলেছিল সে, টাকাও কামিয়েছিল এনতার, কিন্তু এ লাইনে প্রায় যেমনটা হয়ে থাকে শেষটায়, সেই শ্বাপদসঙ্কুল অঞ্চল থেকে একেবারে অক্ষত দেহে বেরিয়ে আসতে পারেনি। (অরণ্য, কে না জানে, রোদনের পক্ষে প্রশস্ত হলেও রোঁদ-এর পক্ষে খুব সুবিধের জায়গা নয়।)

তবে অভিনয় করতে গিয়ে আমি অবিক্ষতই বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম....

হয়েছিল কী, তার একটা বইয়ের চিত্রকর্মে এমন একটা জায়গা ছিল যেখানে নায়ককে প্রচণ্ড মারামারির মধ্যে পড়তে হয় আর এদিকে ছবির নায়ক নিজের অঙ্গহানির ঝুঁকি নিয়ে এহেন বিপদের মুখে এগিয়ে যেতে বিশেষ নারাজ, এমত অবস্থায়...

এমন অবস্থায় এসব দারুণ সমস্যার সমাধান করা দস্তুর মতো মাথার কাজ। আর মাথার কাজে অকাতরে আর অযাচিত নিজের মাথা বাড়াতে আমার মতন বেকুব আর কে আছে?

যদিও আমি পরামাণিক নই, তবুও পরের মাথার কাজে পা বাড়াতে পেছপা হইনে কখনোই। ওদের হয়ে আমার মাথা ঘামাই।

নায়ক মারামারির মধ্যে মাথা গলাতে রাজি নন, এর কারণে আমার মস্তিষ্কের ঘুঁটের আগুনে মাথার ঘিলু গলতে থাকে।

নায়কের আপত্তিটা অযৌক্তিক নয়। আমার কৈশোরদশায় ময়দানের লিগ ম্যাচে কি শিল্ড খেলায় দেখেছি কুমার কোন কালেই কদাচ মারামারির ভেতর যেতেন না, এমনকি, নিজের মাথায় চোট খাওয়ার ভয়ে সমাসন্ন শিরোধার্য কোন বলকেও হেড করতে যেতেন না কখনো, এসব বলের তলায় আমাদের বলাই চাটুজ্যেমশাই, বলাই বাহুল্য, মাথা পেতে দিতে এগিয়ে যেতেন তখন।

আর ছায়াছবির নায়ক মাত্রই যখন কুমার, উত্তম বা মধ্যমকুমার যদিও না হন, তাহলেও তিনি গায়ে পড়ে কেন এই উত্তম-মধ্যমের মধ্যিখানে আত্মসমর্পণ করতে যাবেন?

'এরকমের ঝুঁকির অভিনয়ে শুনেছি', আমি বললাম, 'বিকল্প নায়ককে দিয়ে অভিনয় করানো হয়ে থাকে ওদেশে।'

'জানি।' ঘাড় নাড়লেন ডিরেক্টর : 'আর তার জন্য তাঁরা ভাল টাকাই পেয়ে থাকেন। এই বিকল্প নায়করা।'

'পান নাকি তাঁরা?' তা, সেই টাকাটা যদি আপনারা দয়া করে আমায় দেন তো আমিই এই ভূমিকায় নায়কের বদলি হয়ে নামতে পারি।' আমি জানাই।

আমার এক ছটাক ঘিলুর একটুখানি ছটা বার হয়। বিকল্প-রূপে আমি নিজেই দেখা দিতে চাই। যদি টাকা পাই, হ্যাঁ। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার প্রতি চিরদিনের লোভ আমার।... তা ছাড়াও পেটে খেলে পিঠে সয়, তা কে না জানে আর?

সম্মুখে বিকল্পতরু দেখতে পেয়েই কি না কে জানে, ডিরেক্টর কিন্তু আমার কথায় যারপরনাই বিস্মিত হন।

'ওর ভূমিকায় আপনাকে?'...সবিস্ময়ে তিনি বলেন—'কিন্তু আপনাদের দুজনের চেহারার মিলটা কোন্‌খানে?'

'ক্যামেরা-ট্রিক্‌স্ বলে কিছু নেই নাকি আপনাদের?' আমার ঘিলুর আরেকটুখানি ছিটে।

'ক্যামেরা ট্রিক্‌স-এর সাহায্যে আপনাদের দুজনকে এক চেহারার করে দেওয়া? কিন্তু সেটা কি...', বলতে গিয়ে তিনি চেপে যান। উত্তম, মধ্যম দূরে থাক, সিনেমা জগতে কোন অধমকুমারের সঙ্গেও যে এই অধমাধমের চেহারার কোন সাদৃশ্য নেই, সেই কঠোর সত্যটা বলতে গিয়েই বুঝিবা তিনি নিবৃত্ত হন। কিন্তু তাঁর সেই নিরুক্তির মধ্যেই তাঁর কথাটা নিঃশেষে উক্ত হতে থাকে।

'ওঁর সাজ-পোশাক পরে আমি পেছন ফিরে অভিনয় করব না হয়।' আমি বাতলাই : 'আর অভিনয় তো খালি আমার পড়ে পড়ে মার খাওয়ার? সে আমি পারব খুব।' আমি ঘাড় নাড়ি।

'ক্যামেরার দিকে পিঠ ফিরিয়ে অভিনয় করবেন বলছেন?'

'হ্যাঁ, আর পেছন থেকে সবাইকেই তো একরকমেরই দেখতে প্রায়। বোরখার ভেতরে সব মেয়েই যেমন রূপসী। আবার তার তলায়, আরো যদি তলিয়ে দেখেন, দেখতে পাবেন সকলেই এক চেহারার। সবাই আদিমাতা ইভ। একাকার সব।'

জিভ কাটল ইতু ইভের কথাটায়।

গৌরাঙ্গর বোন ইতু (সম্পর্কে আমার কাজিন্), সে-ও ছিল সেই সেটে, কোন ভূমিকার অভিনয়ে নয়, আমার মতই দর্শক হয়ে। সে বললে—'অত তলিয়ে দেখতে যাবার দরকার নেই তোমার শিব্রামদা। শেষটায় তোমার তলানিটুকুও থাকবে না। এই সব মার-প্যাঁচের মধ্যে—মানে, মার খাবার প্যাঁচে পড়লে প্রাণে তুমি মারা পড়তে পার, তা জান?' সে আমায় নিরুৎসাহ করতে চায়।

'কিন্তু পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা পেয়ে যাচ্ছি যে মুফত, তার কী?' আমার দৃষ্টিকোণ থেকে ওকে দেখাই।

'সে তো জীবনবীমা করলেও হয়। জীবনবীমা করো আর সাত তলার উপর থেকে লাফ মেরে পড়ো—তাহলেও তোমার পড়ে পাওয়ার চোদ্দ আনা হবে'খন। কিন্তু মারা যাবার পরে টাকা পাবার লাভ?'

'তুই লাইফ ইনসিওর করে নামতে বলছিস? দোতরফা পাওয়া যায় তাহলে? কিন্তু মারামারির মধ্যে গিয়েও যদি মারা না পড়ি? তাহলে তো মোটা টাকার প্রিমিয়ামটাই মাটি।'

'লাইফ না করে, অন্ততঃ তোমার দাঁতগুলো বীমা করিয়ে নাও। ওগুলো তোমার ভাঙবেই নির্ঘাত—গোটা কয়েক ঘুষি খেলেই । দাঁতের ওপর দিয়েই এই দাঁওটা মারো তোমার—এটা যেন না ফস্কায়, বুঝেছ?' ইতুর পরামর্শ শুনি: 'তাতেও তোমার পড়ে পাওয়া, মানে ঐ দাঁত পড়ে পাওয়ার আরও চোদ্দ আনার উপরন্তু আঠারো আনা লাভ দাঁড়াবে।'

'দাঁত আমার খোয়াবো না কিছুতেই।' আমি ওকে ভরসা দিই—'যতই আমার খোয়ার হোক না কেন, মারামারি ব্যাপারে আমি যেমন মাথা গলাতে পারি, তেমনি মাথা খেলাতেও পারি আবার তার মধ্যেই। দাঁত ঠিক বাঁচিয়ে নেব ওই মাথা খেলিয়ে। তবে নাকের কথা বলা যায় না নাকি! আমি একটু উন্নাসিক আবার—দেখছিস তো!'

'নাক যায় যাক।' ভরসা দিল ইতু, 'সেজন্যে তোমায় নাকাল হতে হবে না তেমন। তবে দাঁত গেলে মাংস চিবুবে কী করে? তুমি আবার যা পেটুক বাবা!'

যাক, মার খাবার পাত্র যখন পাওয়া গেল তার পরের কথা এসে পড়ল তখন। মারামারিটা বাধানো যায় কোথায় এবং কী করে।

'কোথায় না বাধানো যায়!' আমি বললাম—'যখন খুশি যেখানে খুশি বাধালেই হল। মারামারির জায়গা তো যত্রতত্র—সময় যখন তখন।'

'তা বটে।' সায় দিল গৌরাঙ্গ।

'সারা পৃথিবী তো মারোয়ারের রাজ্য এখন। মার আর war লেগেই রয়েছে সব জায়গায়।' আমার পুনরুক্তি করতে হয়।

'আমাদের গল্পটা হচ্ছে এই...' বোঝাতে লাগলেন ডিরেক্টার সাহেব: 'আমাদের ছবির নায়ক এক মারামারির মধ্যে গিয়ে পড়েছে কিংবা নিজেই সে বাধিয়েছে মারামারিটা...এখন কথা এই, কী করে বাধানো যায় এই মারামারি? আর কে বাধাবে?'

'নায়কই বাধাবে। মানে আমি... এই আমিই তো বাধাব গিয়ে।' কর্তব্যজ্ঞানে আমি বেশ টনটনে।

'কোথায় বাধাবেন?'

দোতলার খোলা বারান্দার (যেখানে বসে কথা হচ্ছিল আমাদের) কিনারায় গিয়ে আমি দাঁড়ালাম: 'সামনের রাস্তায় ট্রাম-স্টপেজের ওই খানটাতেই তো বাধানো যায়। অক্লেশে।'

'কী করে বাধাবেন?'

'ট্রাম-স্টপেজে ঐখানে সব সময়ই লোক জমছে। ট্রামের অপেক্ষায় বাসের অপেক্ষায়

বহুৎ ক্ষণ দাঁড়াতে হয়। স্বভাবতই তিতিবিরক্ত হয়ে থাকে সবাই। তখন যে-কোন ছুতোয়ই তো ঝগড়া লাগতে পারে—আর, মুখোমুখির থেকে তা হাতাহাতিতে গড়াতে কতক্ষণ?'

'তা বটে।' সায় দেন ডিরেক্টার: 'সেটা স্বাভাবিক ভাবেই হবে আর পরিবেশটাও বেশ স্বাভাবিক দেখাবে। কিন্তু কী করে বাধাবেন শুনি তো ঝগড়াটা?'

'ঐ যে, স্টপে এক মধ্যবয়সী দম্পতি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন ট্রামের জন্যে, আমি যদি ওই স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াই আর ওঁর স্ত্রীর প্রতি কটাক্ষ করি....'

ছটাকখানেক ঘিলুর আমার ছটা দেখা দেয় আবার।

'কিচ্ছু হবে না।' মাঝখান থেকে বাধা দিয়ে ইতু বলে: 'মেয়েটি কিছুই ভাববে না, মনে মনে খুশিই হবে বরং। আর তার বরেরও এ ব্যাপারে চটবার কোন কারণ নেইকো। সবাই সবার দিকে তাকায় আজকাল—আকচার। কেউ কিছু মনে করে না তাতে।'

'আহা, সে কটাক্ষ নয় রে! সে কটাক্ষর কথা হচ্ছে না, কথার কটাক্ষ আমি বলছিলাম। সবাই সবার দিকে নজর দেয় আমি জানি, তারই ফাঁকে কারো নজরানাও দেয়া হয়ে যায় তাও আমার জানা আছে বিলক্ষণ, কিন্তু এখানে কাটা কাটা কথায় আমি যদি ওঁর মুখের ওপর ওঁর বৌয়ের নিন্দে-মন্দ করি তাহলে ভদ্রলোক কি আমায় আস্ত রাখবেন তুই ভাবিস?'

'বেধড়ক মারামারি বেধে যাবে নির্ঘাত!' গৌরাঙ্গ বেশ খুশি হয়ে বলে।

'মারা আর হয়ে উঠবে না...' আমি ম্লান মুখে জানাই: 'আমার তেমন বাহুবল নেই ভাই! চোটটা বিলকুল একতরফাই হবে। তবে আমার ভয় এই, মারি-টা না শেষে মহামারী হয়ে দাঁড়ায় আবার!'

'মহামারী? তার মানে?'

'হ্যাঁ। স্টপেজে জমায়েত আর সব লোক ভদ্রমহিলার অবমাননায় শিভালরাস না হয়ে ওঠেন হঠাৎ! বেওয়ারিশ পকেটমারের মতন পেয়ে সবাই মিলে না চাঁটাতে লেগে যায় আমায়।'

'আহা, তাহলে তো খুব ভালোই হয়। সবটাই বেশ ন্যাচারাল হয়ে ওঠে।' ডিরেক্টার উল্লসিত হন।

আমি আমার শার্ট খুলে ফেলে নায়কের পাঞ্জাবি পরে নিই। পোশাক পালটে তৈরি হই। চুলগুলো ঠিকঠাক করে দেয়।

সত্যি বলতে, বুক একটু গুড় গুড় করে বইকি। জীবনে কোন অঘটন ঘটেনি এমন নয়, কালবোশেখীর ঘনঘটা অনেকবারই জমে এসেছে, কিন্তু মিশকালো মেঘরা এমন রূপালী রেখা নিয়ে দেখা দেয়নি কখনো। যদি এই অকাল বৈশাখী অর্থবহ হয়ে না আসে, শুধু মাত্র গর্জন করেই, কোন বর্ষণ না করেই চোখের উপর দিয়ে উপে যায়, তাহলে? তাহলে কি এভাবে এগুবার কোন মানে হয়? আনচেক্‌ড আমি এগিয়ে যাব ঠিকই, কিন্তু পকেটে চেক নিয়েই ফিরতে চাই যে।

'চুলগুলো ঠিকঠাক করে দিয়ে পেছন থেকে অবিকল নায়কের মতই দেখাচ্ছে বটে তোমায়।' বলল ইতু: 'কিন্তু শিব্রামদা, তুমি পিছন ফিরে তাকিয়ো না যেন। তাহলেই

ধরা পড়ে যাবে তক্ষুনি—সব মাটি তখন। না তাকিয়ে পারবে না তুমি?'

'তুই এখান থেকে সরে যা।' গৌরাঙ্গ বলল ইতুকে।

'কেন, ও যাবে কেন? ডিরেক্টার জানতে চান।

'ইতু এখানে থাকলেই শিবরামবাবু তাকাবেন। ইতুকে না দেখে থাকতে পারবেন না।'

'তাতে কী হয়েছে! কাট্ কাট্ করে দিলেই হবে।'

কথাটায় আমি ঘাবড়ালাম। মারামারির সম্মুখীন হতে চলেছি, তার ওপরে আবার এই কাটাকাটি কেন রে বাপু? সত্যি বলতে, আমার লেখার মতই নিজেকে আমার অকাট্য বলে একটা ধারণা ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে কলাবাগানের কিনারায় বাস করেও কাটা পড়িনি। মুসলমানরাও কোতল করেনি আমায়।

'মারের ওপর আবার এই কাট্ কাট্ কেন মশাই?' ঘুরে দাঁড়িয়ে আমি প্রতিবাদ করি।

'কোন রক্তারক্তি কাণ্ড নয় গো', ইতু আমায় আশ্বাস দেয়ঃ 'সিনেমার ভাষায় কাট্ কাট্ মানে হচ্ছে তমি যদি ফিরে তাকাও তাহলে ফিলমের সেই জায়গাগুলো ওঁরা কেটে বাদ দিয়ে দেবেন। আবার রিটেক্ হবে। এই আর কি।'

সিনেমার পরিভাষায় মানে পরীর মত ইতুর ভাষ্য থেকে জেনে অকুস্থলের দিকে অকুতোভয়ে এগুই। এদিকে বারান্দার উপরে ক্যামেরা ইত্যাদি সাজিয়ে ছবি তোলার তোজজোড় চলতে থাকে।

'আস্ত ফিরে এলে বাঁচি।' খুব আস্তে বললেও ইতুর কথাটা আমার কানে যায়।

'আস্ত না থাকলেও আস্তানায় আমায় ফিরিয়ে আনিস তোরা।' আমি জানাইঃ 'রাস্তায় ফেলে রাখিসনে যেন।'

' সে আর তোমার বলার ওয়াস্তা রাখে না।' গৌরাঙ্গ বলে।

ট্রাম-স্টপে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে আমি দাঁড়াই।

'ছি ছি!' একবার এঁর একবার ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আপনমনেই কথাটা আওড়াই। —'ছি ছি ছি! এমন বিশ্রী চেহারার মেয়েকে নিয়ে যে কী করে বেরয় মানুষ? বিয়েই বা করে কী করে!'

শুনে দুজনেই যেন কেমন হকচকিয়ে যান। কথাটায় আমি নিজেও যে একটু হতচকিত না হই তা নয়। মেয়েটি মোটেই তেমন বিশ্রী নন, দুনিয়ায় কোন মেয়েই কখনো বিশ্রী হয় না, তাছাড়া কথাটা বলতেই আমার কেমন বিশ্রী লাগে, যেমন কানে তেমনি প্রাণে লাগে আমার।

'কিন্তু কী করা? টাকার জন্যে নাকি খুন করে থাকে কেউ কেউ। মেয়েমানুষ খুন করতেও বাধে না নাকি কারো কারো। আমিও প্রায় সেই পর্যায় পড়ে যাই বলে ধরে নিন। সত্যি বললে, যদিও নিজেকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা পাই না।' সাফাইয়ের সুরে শুরু করেন ভদ্রলোক।

'না হয় বিয়ে করেছেনই, টাকার জন্যেই করেছেন মনে হচ্ছে।' ভদ্রলোককে আমি সম্বোধন করিঃ 'কিন্তু তাই বলে এমন কদাকার বৌকে সঙ্গে নিয়ে হাটে-বাজারে বের

হন কোন্ আক্কেলে? সুন্দরী স্ত্রীকে সাথী করেই রাস্তায় বেরোয় সবাই—নিজের বৌয়ের রূপগুণ একান্তে রেখে-ঢেকে একলা একলা না চেখে সবাইকে ডেকে দেখাতে সাধ যায় বৈ কি! কিন্তু এমন কুৎসিত বৌকে, তালাক যদি নাও দেন, বাড়িতে তালা দিয়ে রেখে আসতেও তো পারেন, বলুন, সেটাই কি বেশ ভালো হয় না?'

ভদ্রলোক নিরুত্তর। তাঁর বাগ হবারও কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ভদ্রমহিলাও চুপ। তিনি আর কী বলবেন?

'মাপ করবেন। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? আপনি কি মুসলমান?' জিজ্ঞেস করি ভদ্রলোককে।

তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে ঘাড় নেড়ে জানান যে না।

'হয়ে যান মশাই। মুসলমান হতে আর অসুবিধাটা কী এমন? মসজিদে গিয়ে কলমা পড়লেই হওয়া যায়। মুসলমান হলে এমন বৌকে তালাক দিতে পারবেন তাহলে। তিনবার তালাক তালাক বললেই লাক খুলে গেল আপনার।'

ভদ্রলোক কোন জবাব দেন না। মহিলাটিও চুপ করে থাকেন।

'আর তালাক যদি নাও দেন, রাস্তাঘাটে বেরুতে হলে বোরখা পরিয়ে বেরুতে পারবেন বৌকে নিয়ে তখন। এহেন স্ত্রী বোরখার মধ্যেই মানায়, বলতে কি।'

এতক্ষণ বাদে একটা কথা বললেন ভদ্রলোক। আমাকে নয়, বললেন ওঁর বৌকেই।

'শুনলে ওগো? কী বলছেন ভদ্রলোক?'

স্ত্রী কিছু বলেন না।

'কথাটা আমি নিজেও অনেকদিন ভেবেছি।' তিনি কন: 'বলব বলব ভেবেছি তোমায়। কিন্তু পাছে তুমি মনে কষ্ট পাও সেই কারণেই বলা হয়ে ওঠেনি। এখন শুনছ তো? কী বলছেন এই ভদ্রলোক?'

বলে ট্রামের জন্যে আর দাঁড়িয়ে না থেকে একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে গেলেন তাঁরা অকুস্থল ছেড়ে তক্ষুনি।

বহুরূপী

শ্রীমান গোবর্ধনেরও বিয়ে হল শেষটায়। অনেকটা ওর বৌদিরই চেষ্টায়।

উচ্ছ্বসিত হয়ে সম্বন্ধের খবরটা প্রায় দম-বন্ধ হয়ে এসে জানাল সে দাদাকে।

শুনে মুখ বাঁকালেন দাদা—'বিয়ে করিসনি বেশ আছিস! সুখে থাকতে ভূতের কিল খেতে চাস কেন?'

সুসংবাদবাহককে এককথায় একেবারে ভগ্নদূত বানিয়ে দিলেন।

গোবর্ধন ভাঙলো না, একটুখানি মচকালো কেবল—'কেন, আমি তো কোনো ভূতকে বিয়ে করতে যাচ্ছি না?'

'না হয়, কোন পেত্নীকেই করলি। একই কথা। পেত্নীর কিলও এমন কিছু মিঠে

নয়।' বলে তিনি আমাকে তাদের কথার পিঠে টানেন—'আপনি কী বলেন মশাই?'

'যা বলেছেন! সমান Killer—সবাই মারাত্মক।' এক কথায় আমার সায়।

'শুনলি তো?'

'তাহলে তুমি কেন বিয়ে করেছ শুনি?' গোবরা নতুন প্রশ্ন পাড়ে।

জবাব না দিয়ে হর্ষবর্ধন ওর প্রশ্নটা আমার দিকে ঘুরিয়ে দেন—'আপনি কেন বিয়ে করেননি মশাই?'

'বিয়ে করলে পদবৃদ্ধি হয়, নিজেব মর্যাদা বাড়ে আমি জানি।'

আমার বক্তব্য রাখি—'কিন্তু জীবনের এই সুদীর্ঘ পথ আমি পায়চারি করেই কাটাতে চেয়েছি। চারি পায়ে হাঁটতে চাইনি কখনো। মুক্তারামে আছি, মুক্ত আরামে থাকতে চাই। বিয়ে করলে চতুষ্পদ হতে হয় না? ঘোড়ার মত চারপায়ে দৌড়বার অত ক্ষমতা নেই আমার, কিংবা গাধাব মতন থপ থপ করে চলতেও আমি চাইনে—এই আর কি!'

'তার মানে'—ওর দাদাই করে দেন তখন—'তার মানে, বিয়েতে যেমন দুহাত এক হয়, তেমনি চার ঠ্যাংও তো এক হয়ে যায় আবার—হয় নাকি? অবিশ্যি সেটা বিয়ের পর! চারপেয়ে হয়ে চারপায়া নিয়ে পড়ে থাক তখন দিনরাত! কী করবে আর? জীবনের উড়তি গেল, ফুর্তি গেল, সব কিছু গেল—রাতদিন নিজের স্ত্রীমূর্তি শুয়ে বসে দ্যাখো কেবল।'

'কেন, বৌদি কি দেখতে কিছু খারাপ?' গোবর্ধনের বেমক্কা জিজ্ঞাসা।

'অ্যাঁ? তুই কি তোর বৌদিকেই বিয়ে কবতে যাচ্ছিস নাকি?'

'তা কেন? মেয়েটা দেখতে নাকি বৌদির মতই শুনেছি। বৌদির পছন্দ করা মেয়ে।'

'বটে? কে শুনি তো মেয়েটি?'

'বৌদির বোন তো।'

'হয়েছে। সেরেছে এইবার।' হর্ষবর্ধন রীতিমতন হতচকিত: 'বেঁচে আর সুখ রইল না! সবাই মিলে বাড়িতে টিকতে আর দেবে না আমায় দেখছি।'

'কেন কী হল মশাই?' আমি শুধাই।

'একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর। মন্দোদরির ওপর এলেন আবার শূর্পনখা—একেবারে রাজযোটক। কিংবা, রাণীযোটক—যাই বলুন!'

শালীর সম্পর্কে এমন মন্তব্য অশালীন বলেই আমার মনে হয়—কোন ভায়রাভায়ের মুখে কোনোদিন এরূপ কথা শোনা যায়নি। —'একথা কেন বলছেন? আপনারই তো পোয়া বারো হয়ে গেল মশাই!'

'পোয়া বারোই বটে। সব ঝক্কি আমাকেই পোয়াতে হবে তো।' তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে: 'চারপায়া তো ছিলই, এবার চার পোয়া হল!'

'কেন, ঝক্কিটা কিসের আবার?'

'শুনছেন না, ওর বৌদির বোন? কেমন বোন জানেন? আমার বৌয়ের যমজ!'

'হলই বা, মায়ের পেটের বোন যখন।'

'যমজ মানেই যমের দোসর। সেটা বুঝেছেন? সুগ্রীব দোসর কি সাধে বলেছি আমি?

আমার বৌয়ের মতই দেখতে হুবহু। এখনো তাকে চোখে দেখিনিকো—কানেই শোনা কেবল আমার।'

'সে কী! শালীকে না দেখেই বিয়ে করলেন! সে কি কেউ করে নাকি আবার? সে কেমন কথা?'

আমার অবাক হবার পালা। 'লোকে যে শালী দেখেই বিয়ে করে থাকে মশাই!'

'আমার বিয়ের সময় মেয়েটা তার মামার বাড়ি ছিল কিনা! তখন তাকে দেখবার যাও বা একটুখানি শখ ছিল এখন তো সে কথা ভাবতেই আমার বুক দুর দুর করছে!'

শালীকে দেখে কারো কারো হৃৎস্পন্দন স্বভাবতই একটু বেড়ে যায় বই কি, কিন্তু সেটাকে দূর দূর ভাব বলাটা কি ঠিক হবে? শালী তো দূরীভূত করার বস্তু নয়। শুনে আমি অবাক হয়ে যাই। আমাকে অবাক দেখে তিনি সবাক হন—

'আপনার বইয়ের পুনর্মুদ্রণ হয় না? মাঝে মাঝেই তো হয়। অবশ্য, তা দেখার আপনার আগ্রহ থাকে। তেমনি আমার বৌয়ের পুনর্মুদ্রণ দেখতে হবে আমায়—তাই ভেবেই আমার বুক গুড় গুড় করছে এখন থেকে।'

নিজের হৃদয়ের গূঢ় রহস্য তিনি ব্যক্ত করেন তখন।

'বউ দেখে দেখে হদ্দ হয়ে গেছি মশাই—তার দ্বিতীয় সংস্করণ—দেখবার আমার বাসনা নেই আর। বউ আর শালী অবিকল এক চেহারায় হুবহু একরূপে দেখা দেবে। তখন উঠতে বৌ বসতে বউ, ঘুরতে ফিরতে বৌ—চারধারে খালি ওই বৌ-ই দ্যাখো কেবল! চারধার থেকে বৌয়ের চাঁদ মুখ চাঁদা করে চাটাবে। ভাবুন একবার ফ্যাসাদ!'

'ভালোই তো! মহাপুরুষে কী বলে গেছেন জানেন? বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? আর, ঐ বউকেই শুদ্ধভাষায় বহু বলা হয়। ওই বহুরূপেই তিনি আপনাকে দেখা দিয়েছেন—দিচ্ছেন। এ জীবনে বউই তো সাক্ষাৎ ভগবান। কিংবা ভগবতী—যাই বলুন!'

আমার কথায় তিনি কোনো সান্ত্বনা পান না কিন্তু; মুহ্যমান হয়ে থাকেন।

'তাছাড়া আরো সমস্যা রয়েছে যে!' তিনি জানান—'শালী হলেও সে ভাদ্র বৌ হয়ে আসছে তো! ভাদ্র বৌ হলে, বলুন, আমি তার ভাসুর হলাম কি না? এখন কী হতে কী হয়ে যায় কে জানে! কালে ভদ্রে যদি আমি...না হয় অভদ্রা ভাদ্রমাসেই হল বা...যদি আমি তালগোল পাকিয়ে ভুল করে আমার বৌয়ের সাথে তাকে গুলিয়ে ফেলি...তাহলে সেটাও কিছু কম ভাবনার কথা হবে না।'

কথাটায় গোবর্ধনকেও বেশ ভাবিত দেখা যায়।

'না, না, তা কি কক্ষনও হতে পারে?' এক কথায় দুজনকেই আমি আশ্বস্ত করতে যাই: 'যমজ হলেও হুবহু কখনো এক রকমের হয় না। কোথাও না কোথাও ইতরবিশেষ থাকেই। চেহারার একটুখানি গরমিল থেকেই যায়। উনিশ বিশ রয়েছেই—আর, বিশেষ ইতর হবার পক্ষে সেইখানেই আপনি বাধা পাবেন।'

'উনিশ-বিশ আছে, তবে চেহারায় নয়, মিনিটে।'

'মিনিটের উনিশ বিশ? সেটা আবার কী?'

'শ্বশুর মশাই তো বলেছিলেন তাই। আমার বৌয়ের উনিশ কি বিশ মিনিট বাদেই নাকি ও জন্মায়! দুজনের ভেতর কে যে কোনটা ধরবার নাকি একটুও যো নেই। আর সেই জন্যেই নাকি শ্বশুরঠাকুর বিয়ের কালে আমার শালীটিকে তার মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—পাছে তিনি নিজেই ভুল করে গুলিয়ে কার বিয়ে দিতে কার বিয়ে দিয়ে বসেন। আগে বড় মেয়ের বিয়ে হবে তো? তাহলে বুঝুন, নিজের বাবাই যেকালে দুজনের মধ্যে বেছে বার করতে পারছেন না সেখানে আমি তো কোন্ ছার! নশ্বর জীব আমরা কোথায় আছি! তবে হ্যাঁ—' একটুখানি থেমে বলেন ঃ

'তবে হ্যাঁ, বছর তেরো বয়সে তো বিয়ে হয়েছিল আমাদের...'

'মাত্র তেরো বছর বয়সে আপনার বিয়ে হয়েছিল? বলেননি তো কখনো?' আমি বিস্ময় মানি।

'মানে, ওঁর বয়েস তখন বছর তের হবে বিয়ের সময়, তারপর বছর ছ'সাত কেটেছে, এতদিনে দুজনেরই বয়েস প্রায় উনিশ বিশই দাঁড়াবে মনে হয়—সেটাও আর একটা উনিশ-বিশ।'

'তাছাড়াও...তাহলেও উনিশ-বিশ আছে।' আমি বাতলাই ঃ 'উনিশ বছরের বিষ একটা রয়েছেই, যাবে কোথায়? সেই বিষময়ী নিজেই সব ঠাওর করে নেবেন, কিচ্ছু ভাববেন না! কে কোন জনা, আপনারা তার কোনো হদিশ না পেলেও, তাঁর ছোবল তিনি যথাস্থানেই দেবেন, যথোচিত পাত্রেই। আপনারা বাছতে না পারলেও, কোথায় যে বিষ ঢালবার তা তিনি বেছে নেবেন ঠিকই। বিশ্বাস করুন।'

ভালোয় ভালোয় বিয়েটা হয়ে গেল গোবরার, বেশ ঘটা করেই হল বলতে কি।

কিন্তু ঘটার পরে যেটা ঘন হয়ে ওঠার কথা ছিল তেমন ধারা কোন ঘনঘটা দেখা গেল না তারপর।

ঘনিষ্ঠ হয়ে আমিই তখন যেচে গিয়ে খবর নিতে তৎপর হলুম।

না, খবরটা নেহাত মিছে নয়। একবয়সী এক চেহারার দুটি মেয়ের একই ধারার চাল চলন, হাবভাব, কথাবার্তা। মুখের হাসি, চোখের চাউনি, কথার টানটা অব্দি একরকম। একরূপে দুজনের পার্থক্য কোথায়, খুঁজে বার করা বেশ দায়। লক্ষণে দুর্লক্ষণে হুবহু মিলে যায় তেমন করে খুব খুঁটিয়ে দেখলেও।

কিন্তু সেকারণে হর্ষবর্ধন যে কোনো দুর্ভাবনায় রয়েছেন এমন তো আমার বোধ হল না।

আমি ওঁর আগের সমস্যাটার জের টানবার চেষ্টা করলাম—'ঠিকই বলেছেন, দুজনের ভেতর তারতম্য, মানে, তর-তম খুঁজে বার করা সত্যিই মুস্কিল।'

'ওঁদের মধ্যেই একজন আছেন তর হয়ে যাবার মতই', ...বেশ তরিবত হয়ে তিনি বলেন—'কিন্তু কোনটি যে, তাই আমি ধরতে পারছিনে।'

'কাতর করে দেবার মতন একজন রয়েছেন বলছেন? আছেন বুঝি ওর ভেতর?' জিনিসটাকে একটু তরল করে প্রাঞ্জলরূপে জানতে চাই।

'হ্যাঁ, সেইটি হচ্ছেন আমার শালী, ওরফে ভাদ্রবৌ—কিন্তু কোনটি যে, তাইতো আমি ঠাওর পাচ্ছিনে আদৌ।'

'আপনার এতদিনকার অভ্যস্ত বৌটিকেও চিনতে পারছেন না একেব্যারে?' সবিস্ময়ে শুধাই।

'একদম না। আগে যদিবা কখনো সখনো শ্রীমতীর বিশ্রী মতি দেখা যেত, বোকা বোকা চাউনি লক্ষ্য করতাম, বাঁকা বাঁকা কথা শুনতে হত—এখন সে-সব একেবারেই নেই আর। শালী আসার পর, তার দৃষ্টান্তেই হবে বোধহয়—শুধরে গিয়ে বিলকুল বদলে গেছে মনে হচ্ছে। এখন দুজনের চোখেই এক কটাক্ষ, অধরে মধুর হাস্য, দুজনেই সমান পরিহাস-পটিয়সী—সমান আদরের পাত্র বলে মনে হয় যেন।'

'হল কী আপনার? বিয়ে হল গোবরার, আর কবি হয়ে গেলেন আপনি?'

কেবল শ্রীমতী নয়, শ্রীমৎ-এর পরিবর্তনও দেখছি অবাক হবার মতই।

আমার কথায় হর্ষবর্ধন ভারী হাসিখুশি—'তা, কবিরা এমন অবস্থায় কখনো পড়ে কিনা জানি না, কিন্তু এমন অবস্থায় পড়লে নিতান্ত অকবিও বোধহয় কবি হয়ে যায়!'

শালীর মধ্যে বৌ-কে হুবহু দেখে কিংবা বৌয়ের ভেতরে শালীনতা পেয়ে, কী কারণে কে জানে, ওঁকে বেশ মশগুল বলে মনে হয়। বোতলের ছিপি খুলে গেলে সোডাওয়াটার যেমন স্ফূর্তি পায় সেইরকম স্বতঃস্ফূর্ত দেখা যায় যেন হর্ষবর্ধনকে।

'তা, স্ত্রীরত্নটির সব সময় ঠাওর না পেলেও এক সময় নিজেই এসে তিনি বুঝিয়ে দেন তো!...আষ্টে-পৃষ্ঠে হাড়ে হাড়েই বুঝিয়ে দেন নিশ্চয়...তখন তাঁকে ধরতে পারেন ঠিকই—' আমি ধরা-ছোঁয়ার কথায় যাই—'যখন তিনি নিশীথে আপনার শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়ান। যিনি আসেন তিনিই হচ্ছেন আসলটি!'

'কিচ্ছু বলা যায় না। হলফ করে বলতে পারে না কেউ। সেখানেও আমার সন্দেহ আছে মশাই।' সন্দেহবাদী হর্ষবর্ধন ব্যক্ত হন, 'আপনি বলেছিলেন না সেদিন, বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা...কী সব বলেছিলেন না? তা, আপনার বহুরূপীই বটেন! এমনকি, ওই বৌ রূপে এলেও আসলে ওনারা সেই বউরূপী, সাদা কথায়।'

'কী যা তা বকছেন সব!'

'আমার কী মনে হয় জানেন? এই সুযোগে আমার বৌ বোধহয় একটু মুখ বদলে নিচ্ছে। এই আমার ধারণা। একঘেয়ে ব্যাপার কি কারো ভালো লাগে বারো মাস? তাই হয়তো আমার শ্রীমতী এই ফাঁকে...তা, তাতে কোন দোষ নেই, আমি অন্ততঃ ধরিনে...মহাভারতেও আছে...আর যাই হোক, গোবরা আমার মায়ের পেটের ভাই তো? তাছাড়া, মহাভারতেও আছে যখন!'

'মহাভারত! মহাভারত!!'

তাঁর কথায় আমার ঐ দ্বিরুক্তি মাত্র।

আমার জবাবে তিনি আরো বেশি মশগুল হয়ে—'এম্‌নি ভাবেই যায় যদি দিন যাক্ না!' ...হেঁড়ে গলায় বেতারে শোনা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুরু না করতেই, তাঁর সুরের পাখনা

মেলার আগেই বেতরিবতের মত, যেন বেত খেয়েই, সেখান থেকে আমি সরে পড়ি। তৎক্ষণাৎ।

গোল বাধছিল, গোবরার বেলায়।

নারী সম্পর্কে এমনিতেই সে আনাড়ি। দুটি গরু জীবনে সে কখনো আলাদা করতে পারেনি ; দুজনের জরুর...তাও আবার যমজ—পার্থক্য ঠাওর করা তার ধারণার বাইরে। তাছাড়া, দুজনের ঠাট ঠমক, এমন কি শাড়িপরার ধরনটা পর্যন্ত এমন অবিকল যে চমকের ওপর চমকের ভেতর দিয়ে চলতে হচ্ছিল তাকে।

এই শাড়ি পরাটাই ধরা যাক না ! মেয়েদের কী এক বিশ্রী বদভ্যেস, তারা স্বচ্ছন্দে পরস্পরের শাড়ি ব্লাউজ পরে থাকে, ছেলেরা কি ভুলেও কখনো তা করতে পারে ? কোনো ছেলে কি তার দাদার কি বন্ধুর জামা-কাপড়, প্যান্ট কি হাফ প্যান্ট ছোঁয় কখনো ? গোবর্ধন নিজে তো তা ভাবতেই পারে না। দাদার কোটের ভেতর মাথা গলালে তার একেবারে হারিয়ে যাবার কথাই, তার ভেতর তার মতন দুজনের দেহ গলে যাবে অবলীলায়। আর পাঞ্জাবি গায়ে চড়ালে তো মনে হবে একটা পেল্লায় বালিশের খোলে সে ঢুকেছে। অথচ মেয়েদের বেলায় দ্যাখো ! একজনের শাড়ি ব্লাউজ অপবের বরতনুতে কোনো মতেই বেমানান নয়। কী রকম বিচ্ছিরি ব্যাপার, ভেবে দ্যাখো একবার।

'বৌ ! একটু শুনবে এদিকে ?' বলে একজনকে যদি সে ডেকেছে, জবাব পেয়েছে অম্‌নি—'আমি তোমার বৌ নই ভাই !'

আবার রান্নাঘরে গিয়ে বলেছে যদি, 'বৌদি, খেতে দেবে আমায় ? খিদে পেয়েছিল খুব।'

অম্‌নি শুনেছে, 'আমি তোমার বৌদি নই গো !'

একই গলায় বলা, একই ধারার চলা, এক রকমের চাউনি আর ঘু কি হাসির সঙ্গে মিক্সচার করা সেই মেজাজি আওয়াজ।

পদে পদে এমনি ওর স্খলন হতে হতে, গোরার ধাবণা হয়, ক্রমেই সে অনিবার্য পদস্খলনের দিকে এগিয়ে চলেছে। দুজনের ইতর বিশেষ না পেয়ে এক পা, এমনকি এক হাত এগুতেও নিজেকে ওর বিশেষ ইতর বলে বোধ হতে থাকে।

অবশেষে থাকতে না পেরে দাদাকে গিয়ে সে শুধোয়, 'আচ্ছা দাদা, তুমিই বলো, বৌদি তো মায়ের মতই প্রায় ? তাই না ?'

'বটেই তো।' সায় দেন দাদা।

'মা না হলেও, মায়ের সমান বলে থাকে কথায়। বলে নাকি ?'

'বলেই তো ! আর আমিও, ঠিক তোর বাবা না হলেও, পিতৃতুল্য বলতে পারিস আমায়।' গর্বে ডগমগ হর্ষবর্ধন। 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমপিতা—সেকথাও বলে দিয়েছে শাস্তরে। কিন্তু একথা কেন হঠাৎ ?'

'মনে করো, মাতৃসমা বৌদির গায় যদি আমি গুলিয়ে ভুল করে হাত দিয়ে ফেলি তাতে কি আমার ঘোরতর পাতক হবে না ?'

'কেন, মার গায়ে তো হাত দেওয়া যায় রে?'

'তা যায়। কিন্তু বৌদি, মার মতন হলেও মা তো নয় আর!' কোথায় যেন গোবরার খটকা-টা থেকেই যায় কেমন।—'ওদের কে যে কোনজন, আমি তো তা ধরতেই পারছি না দাদা! এমনকি, রাত্তির বেলাতেও নয়...'

'ধরতে যাবার তোর দরকারটা কী এমন? যার ধরবার সে ঠিক ধরে নেবে।'

'না, দাদা, ধরে নিলেও না...ধরা দিলেও যেন মেয়েদের ধরা যায় না কখনো...ধরা ছোঁয়ার বাইরেই তারা থেকে যায় কেমন! ভারি গোলমেলে ব্যাপার দাদা।'

'ধুত্তোর! যা তার ধর্তব্যের বাইরে তাকে তুই ধরতে যাচ্ছিস কেন তবে? ও নিয়ে তোর মাথা ঘামাবার দরকার কী? মেয়েরা এক একটি পাহারোলা, তা জানিস? আর, পাহারা-ওয়ালাদের কাজ কী, বল দেখি?'

'পাহারা দেওয়া। আবার কী?'

'তোর মাথা। পাহারোলার কাজ হচ্ছে আসামী পাকড়ানো। কোনো একটা আসামী একবার ধরতে পারলেই নিশ্চিন্তি—তখন একেবারে তারা থানার ও-সি হয়ে গেল সটাং। খোদ অফিসার-ইন্-চার্জ। পাহারোলার থেকে পদোন্নতি হয়ে সে তখন দারোগায় দাঁড়িয়েছে।'

'আসামী পাকড়ানোই কাজ নাকি মেয়েদের? অ্যাঁ?' গোবরা হতবাক। —'আমি তো তা জানতাম না।'

'আসামী বা স্বামী—যা খুশি বলতে পারিস। বউরূপে এক একটি পাহারোলাই তো যতো। আর, জানিস তো, আসলে আমরা কী? আসামের লোক আমরা। আসামী হয়েই জন্মেছি এক কথায়।' সুষ্ঠু ভাষায় সহর্ষে মেয়েদের দুষ্টু প্রকৃতি প্রকাশ করতে থাকেন দাদা।

'আর পাহারোলা তার আসামীকে পাকড়াবেই নির্ঘাত! যথাসময়ে, যথাস্থানে, যথোচিত ভাবে ধরবেই ঠিক...আর ঠিক আসামীটিকেই ধরবে সে। তার জন্যে তোর কোনো ভাবনা নেই।'

'না দাদা! ঠিক ঠিক ধরলেও সবই আমার কাছে কেমন যেন বেঠিক হয়ে যাচ্ছে!'

অবশেষে নিজের শেষ প্রশ্নটি সে না পেড়ে পারে না আর—'আচ্ছা, দাদা, তুমি ওদের ভেতর থেকে বেঠিককে বাদ দিয়ে ঠিকটিকে কী করে বেছে নাও বলো তো?'

'বাছতেই যাইনে।' দাদার অম্লান হাসি: 'অতো বাছ বিচারের দরকার কী?'

গোলাপী প্রলাপ

'আপনার কাছে এলাম দাদা!' সাত সকালে শ্রীমান গোবর্ধন এসে কথা পাড়ল, 'বৌকে জন্মদিনে কী প্রেজেন্ট দেওয়া যায় বলুন তো?'

'আমি কী করে বলব! আমি কি সাতজন্মে বিয়ে করেছি যে...'

'বারে! বিয়ে না করলে কী হয়? প্রেজেন্ট দিতে হয় তা জানেন না?'

'কী করে জানব! মাথা নেই তো মাথাব্যথা। বৌ-ই নেই আসলে তো তাকে প্রেজেন্ট দেবার ভাবনা!'

'আহা, বৌকে না দিন, কাউকে না কাউকে কখনো না কখনো প্রেজেন্ট দিয়েছেনই। বোনের জন্মদিনে কি বান্ধবীর জন্মদিনে...দেননি কি?'

'প্রেজেন্ট আবার কী দেব? সে তো টাকাকড়ির ব্যাপার। কিনে-কেটে দিতে হয়। সেদিক দিয়ে আমি অকাট্য। তার মধ্যে আমি নেই ভাই! আমাকে তার করাতে কাটা যায় না, কেননা আসলে টাকাই নেইকো আমার। টাকা থাকলে তো তবেই উল্টে কাটার কথা।'

টাকাটাকে উলটে দেখে গোবর্ধন কথাটার মালুম পেল বোধহয়। বুঝে সুঝে তার পরে সে বলল—-

'তাহলে প্রেজেন্ট দিতে হলে করেন কী?'

'নিজেই প্রেজেন্ট হই। অভাবে স্বয়ং প্রেজেন্ট হয়ে যাই, অগত্যা?'

'নিজে প্রেজেন্ট হন?'

'কী কবব? তাই তো হচ্ছি—ইস্কুলের সেই পঠদ্দশা থেকেই। রোল-কলেব সময় সেই প্রেজেন্ট সার প্রেজেন্ট সার করতে করতেই—কেবল নিজেকেই নয়, অন্য ছেলের জন্যও প্রেজেন্ট দিতে দিতেই শিখলাম যে প্রেজেন্ট হিসেবে আমি নিজেও কিছু ফ্যালনা নই একেবারে।'

'কিন্তু আমার তাহলে হবে না।' গোবর্ধন জানায়ঃ 'আমাকে কিছু একটা দিতেই হবে বৌকে। বিশেষ করে এমন দিনটায়।'

'বৌকে দিতে হলে তো শাড়ি-টাড়ি গয়না-টয়না এই সবই দিতে হয় শুনেছি, তাতেই নাকি বৌরা হাসি-খুশি হয়ে থাকে।'

'বিস্তর আছে ওর। শাড়ি-গয়নার ওর অভাব নেই কোনো। অন্য কিছু নতুন কিছু দিতে হবে।'

'তাহলে সেদিন নিজেই কেন প্রেজেন্ট হয়ে যাও না বৌয়ের কাছে। বৌয়ের কাছাকাছি থাকো সব সময়। বৌয়ের পায় পায় ঘুরঘুর করো সারাদিন। বেড়ালের মতন বেড়াতে থাকো।'

'এটা আর নতুন কী হল? বৌয়ের কাছাকাছিই তো আছি, দিনরাত, এক বাড়িতেই আমাদের থাকা যখন। বললাম না যে নতুন কিছু দিতে চাই। আপনার কাছে এলাম তো তাই।'

'নতুন কিছু?' তখন মাথা ঘামাতে হল আমায়ঃ 'আচ্ছা, দুচার ছত্র কবিতা লিখে দিলে কেমন হয়? তাও আমি অবশ্যি দিয়েছি কোথাও কোথাও। ও লিখতে কোনো পয়সা লাগে না তো।'

'খাসা হয়, চমৎকার হয়!' আমার কথায় লাফিয়ে উঠল গোবরা। 'শাড়ি-গয়নার ছড়াছড়ি ওর, তা দিয়ে ওকে ভোলানো যাবে না, তার চেয়ে বরং দুচার ছত্রের ছড়া, ওর নাম জড়িয়ে, দেওয়া যায় যদি তো তার দাম হয় না।'

'তা ঠিক। কবিতার কোন দাম নেই, আমি জানি।'

'অমূল্য জিনিস দাদা, সত্যিই! অমন জিনিস আর হয় না। নেকলেসের ছড়ার চাইতেও আপনার ঐ ছড়ার দাম বেশি হবে। বেশ, আমার বউয়ের নাম দিয়ে বানিয়ে দিন একটা কবিতা। এক্ষুনি এক্ষুনি।'

'বৌয়ের নামটা কী?'

'গোলাপী।'

'গো-লা-পী!' আমি নাক সিট্‌কালাম। গন্ধটা কেমন লাগল যেন। —'এ আবার কেমনতরো নাম হে? ওর ডাক-নাম বোধহয়? ...না, ভাল নামটা বল।'

'ভাল নাম জানিনে। দাদা আদর করে এই নাম রেখেছেন তাঁর শালীর!'

'শালীর!' আবার আমার শালীনতাবোধ ক্ষুণ্ণ হয়—'শালী কি হে! তাঁর ভাদ্রবৌ তো! ভাদ্রবৌকে কি কেউ কখনো শালী বলে নাকি?'

'বৌ আমার বৌদির বোন না? যমজ বোন যে।'

'তাই বল, কিন্তু তাহলেও, বৌ-ঝির এমন নাম কেউ রাখে নাকি কখনো? তবে হ্যাঁ, ঝি-দের নাম গোলাপী হয় বটে। কিন্তু বৌয়ের নাম?'

আমার কেমন সন্দেহ হয়। হর্ষবর্ধনকে নিতান্ত স্ত্রৈণ বলেই জানতাম, তিনি যে আবার তলে তলে, তাঁব অবচেতনে, একটুখানি ঝৈনও রয়ে গেছেন, ঘুণাক্ষরেও তা আমার ধারণা ছিল না।

'যাক গে! গোলাপীই হল না হয়। তা এটা তোমার বৌয়ের কোন জন্মতিথি হে? মানে, গোলাপীর এখন বয়স কত হল—মানে এই জন্মতিথিতে কতয় পড়বে সে?'

'এই তো গত বছরে বিয়ে হয়েছে আমাদের—এক বছর হল।'

'সে তো তোমাদের দ্বিজত্বলাভের বয়েস এক বছর। আমি সেই দ্বিতীয় জন্মের কথা বলছি না, প্রথম জন্মের তারিখ ধরে হিসেব করলে কত হয়?'

'দাদা জানেন।'

'তোমার বৌয়ের বয়েস তোমার দাদা জানতে যাবেন? তার মানে?' আমি আশ্চর্য হই।

'দাদা বৌদির বয়স জানেন তো। বৌদি আর আমার বৌ যমজ বোন, বললাম না?'

'তাই বল। তা তোমার বৌদির বয়স কত?'

'সোজাসুজি তো দাদার মুখে শুনিনি কোনদিন। তবে দাদা বলেন বটে মাঝে মাঝে রাগ করেই—আমার হয়েছে যাঁড়াশী নিয়ে ঘর করা। বৌ তো নয় ষাঁড়াশী। টুঁ শব্দটি করার যো নেই আর আমার। ...তা দাদা, ষোল বছরের মেয়েকেই তো ষাঁড়াশী বলে থাকে, তাই না?'

'ষাঁড়াশী নয়, ষোড়শী। তা ঐ একই হোলো। তা, তোমার বৌ তাহলে ষোল বছরের খুকি একটা? তাই বল।'

'না না, অত কম হবে না। উনিশ-বিশ হবে।'

'একই কথা, উনিশ বছরের যত বিষ, ষোল বছরেও তারা চেয়ে কিছু কম নয়—জাতকেউটে হয় যদি। যাক্ গে, আমি ঐ ষোল বছরের ওপরেই দু এক লাইন লিখে দিচ্ছি, বুঝলে? মেয়েদের বয়েস কম করে ধরলে কোন ক্ষতি হয় না, তাতে তারা খুশিই হয় বরং।'

তারপরে আমার কাব্যসাধনায় লাগা গেল। বিস্তর মাথা ঘামিয়ে বহুৎ কষ্টে সৃষ্টে দুটি লাইন উৎরালাম—এক ছত্র পয়ারেঃ

জানাই তোমারে মোর প্রাণের প্রলাপ।
প্রতিটি বর্ষের লাগি একটি গোলাপ।।

দেখে নাক কোঁচকালো গোবরা—'মোটে দু লাইন?'

'কেন, দু লাইন কি কম হল? দু লাইনে আস্ত রেলগাড়ি চলে যায়, মায় মালগাড়ি সমেত তা জান? কত ভাবধারা বয়ে যাচ্ছে এই দুই লাইনে। তার খেয়াল আছে?'

'দু লাইন মাত্র!' তবুও গোবরা খুঁত খুঁত করে।

আমি বললামঃ 'আচ্ছা, চার লাইনে করে দিচ্ছি না হয়, তার কী হয়েছে!'

ভেবে দেখলাম বিয়ে একটা চতুষ্পদী ব্যাপার। যতই চতুর হোক, বিয়ের পর স্বভাবতই চতুষ্পদ হতে হয় সবাইকে। সামান্য চেষ্টাতেই অসামান্য পয়ারটিকে চতুষ্পদী বানিয়ে ছাড়লাম—

জানাই তোমারে মোর
প্রাণের প্রলাপ।
প্রতিটি বর্ষের লাগি
একটি গোলাপ।।

'হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে।' গোবরা খুশি হয়ে গেল। —'এইবার একজন আর্টিস্টকে দিয়ে ছাপার অক্ষরে এটা লিখিয়ে নিতে হবে।'

'আমি লিখে দিচ্ছি না হয়। ছাপার অক্ষরে লেখা এমন শক্ত কী! আর, তার জন্যে আবার আর্টিস্টকে গিয়ে সাধতে হবে কেন?'

চারটে লাইনকে একখানা কার্ডের ওপরে হরফের আখরে সাজিয়ে দিলাম। দেখে গোবরা বলল—'চমৎকার! খাসা হয়েছে।'

'চল এবার নিউ মার্কেটে যাই ফুল কিনতে। ষোলটা বাছাই করা সেরা গোলাপের তোড়ার সাথে এই কার্ডখান গেঁথে নিয়ে তোমার বৌকে গিয়ে দাও গে।'

বাজারে এক ফুলওয়ালার দোকানে গিয়ে হাজির হলাম দুজনে।

'ভাল গোলাপফুল আছে তোমার? দিতে পার আমাদের?'

'বসোরাই গোলাপ দেব বাবু?'

'বসোরাই গোলাপ!' ঠাট্টা করছে নাকি লোকটা? কলকাতায় বসে বসোরাই গোলাপ পাওয়া যায় নাকি!—'বসোরাই গোলাপ পাব কী করে এখানে? এই শহরে বসে?'

'কেন পাবেন না? কলকাতায় কী না মেলে!'

'রোজ এরোপ্লেনে আসে বুঝি বসোরার থেকে? আমদানি-করা গোলাপ তোমার? দাম খুব বেশি পড়বে বোধহয়?'

'এমন কিছু বেশি দাম নয়। আমাদের বাগানের আমদানি। বসোরার থেকে চারা এনে লাগানো হয়েছিল আমাদের বাগানে।'

'বটে!' শুনে তাজ্জব হই।

'না না, বসোরাই গোলাপ চাইনে।' গোবরা বলে : 'যদি তোমার মোগলসরাই গোলাপ থাকে তাই তুমি দাও আমায়। আছে?'

'কেন থাকবে না বাবু! তাও দিতে পারি।'

গোবরা বলল আমায়—'দেখুন দাদা, বসোরা-ফসোরা শুনিনি কোন কালে! মোগলসরাই আমাদের জানা জায়গা।'

'মোগলসরাই গোলাপও খুব ভাল হবে বাবু! মোগল সম্রাজ্ঞীরা যে গোলাপের জন্যে পাগল হতেন।'

'তাহলে সেই গোলাপেরই ষোলটা সেরা সাজিয়ে তুমি আমায় একটা তোড়া বেঁধে দাও—সেই সঙ্গে এই কার্ডখানা এঁটে দেবে, বুঝেছ? বাছাই করা গোলাপ দেবে সব।'

'বলতে হবে না বাবু! আমি আপনাদের ভালরকম জানি। আপনার দাদা তো প্রায়ই আমার দোকান থেকে ফুল কেনেন। আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখেছি কতবার।'

দোকানীর কথায় আমি গোবরার দিকে তাকালাম। গোবরা বললে—'হ্যাঁ। দাদা এই দোকান থেকে বৌদির পূজোর ফুল কিনে নিয়ে যান বটে।'

'বটে? দাদাও বৌদিকে পূজো করেন তাহলে? স্ত্রৈণও আছেন বেশ। তা...নিত্যি-পূজো নাকি?'

'না-না। বৌদির পূজো-আর্চা লেগেই আছে তো, তারই ফুল কেনেন দাদা।'

'আপনার দাদা দিলদরিয়া মানুষ বাবু। এমন লোক দেখিনি। দু-টাকার ফুল নিয়ে দশ টাকা দিয়ে যান—একালে এমন ভদ্রলোক দেখা যায় না প্রায়।'

'বেশ। তাহলে তুমি ষোলটা সেরা গোলাপ সাজিয়ে একটা তোড়া বানিয়ে রাখো, তার সঙ্গে এই কার্ডখানা আটকে দিয়ো, কেমন?'

'হাঁ বাবু। কাউকে দেবেন তো? আমি পাতলা ফিনফিনে দিল্‌বাহারী কাগজ দিয়ে মুড়ে দেব তার ওপর। যাকে দেবেন তিনি পেলে খুব খুশি হবেন।'

'বেশ বেশ। তুমি তোড়াটা বাঁধো ততক্ষণ। আমরা এই মার্কেটেই কিছু কেনা-কাটা সেরে আসছি এক্ষুনি।'

আধঘণ্টা পরে ঘুরে আসতেই ওটা পাওয়া গেল। বাহারী কাগজে মোড়া চমৎকার তোড়াটা।

মোগলসরাই গোলাপ কেমনধারা, দেখবার আমার কৌতূহল ছিল। গোবরা কিন্তু কাগজের মোড়কটা ছুঁতেই দিল না। বলল—'আপনি কেন দাদা, যার জন্যে নেয়া, সে-ই তো খুলবে সব আগে। আপনি আগে দেখলে এটা এঁটো হয়ে যাবে না? দেবতাকে কি কেউ কোনো এঁটো জিনিস দেয় কখনো?'

তাহলেও তোড়াটার ওপর ওপর দেখেই ঠাহর হল যে মোগলসরাই গোলাপ পেল্লায় চেহারার এক চীজ। আড়ে বহরে দস্তুরমতন মোগলাই সন্দেহ কি! ষোল ষোলটা গোলাপে মনে হচ্ছে কাগজের ঠোঙায় মোড়া প্রকাণ্ড একটা বাঁধাকপি যেন।

সন্ধ্যেবেলায় মুখ চুন করে গোবরা এল আবার।

'কী ছড়া কাটলেন দাদা, বৌ আমার কেটে পড়েছে। আপনার ছড়া পড়েই না বাপের বাড়ি চলে গেছে সটাং।' বলল সে।

'সে কি!' আমি অবাক হই: 'হয়েছিল কী শুনি?'

'প্রথমে তো ফুলের তোড়াটা পেয়েই না, খুব হাসি-খুশি হয়ে ভেতরে চলে গেল। তার একটু পরেই ফিরে এসে বললে, আমি যদি তোমার দিদিমার বয়েসী তবে আমায় বিয়ে করতে গেছলে কেন? খুব রেগেমেগেই বলল কথাটা।'

'তার মানে?'

'তার মানে আমি কী করে বলব! আমাকে একটি কথাও বলতে দিল নাকি তারপর? নিজেও একটি কথা কইল না। সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠল গোমড়া মুখে। গাড়ি ডাকিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল সেই দণ্ডে।'

বলেই গোবরা ততোধিক গোমড়া মুখে আমার ত্রিসীমা থেকে চলে গেল। বলে গেল, 'নাকে খত। আপনার কবিতার ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ। আর কখনো এখানে আসছি না দাদা।'

সন্ধ্যেবেলায় ফের মার্কেটের ভেতর দিয়ে ফেরার কালে কী খেয়াল হতে সেই দোকানীকে গিয়ে শুধালাম।

'হ্যাঁ হে, কী রকম ফুল দিয়েছিলে বল তো? ফুলগুলো তেমন ভাল ছিল না বোধহয়? শুকনো টুকনো ছিল বুঝি?'

'আজ ভোরের তোলা তাজা ফুল সব বাবু! যেমন রঙ, তেমনি খোসবাই। কী বলছেন আপনি!'

'তাহলে?'

'বাবুরা আমার প্রায় দিনের খদ্দের। যা দাম তার চারগুণ ধরে দেন আমায়, চারগুণ ফুল দিয়ে বেঁধে দিয়েছি তোড়াটা তাই আজ।'

'চারগুণ ফুল! তার মানে?'

'বাবু ষোলটা ফুল চেয়েছিলেন তো? আমি চৌষট্টিটা বাছাইকরা সেরা গোলাপের তোড়া বেঁধে দিয়েছি তাঁকে। কেন, বাবু কি খুশি হননি নাকি?'

'খুশি! সে কথা আর বলতে!' বলে আর কথা না বাড়িয়ে, ফুলওয়ালার ক্ষুরে দণ্ডবৎ করে—যে ক্ষুরে গোবরা নিজের মাথা মুড়িয়েছে আজ—আমি চলে এলাম সেখান থেকে।

আর বুঝলাম, 'অধিকন্তু ন দোষায়'—কথায় বললেও এক্ষেত্রে সেইটেই ভীষণ দোষাবহ হয়ে গেছে। চৌষট্টিটা গোলাপের বাহুল্য খোসামোদে গোবরার বৌ পঁয়ষট্টি দিয়েছে পত্রপাঠ।

যাঁহা চৌষট্টি তাঁহা পঁয়ষট্টি!

উল্টো উৎপত্তি

বাঙালীর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সেই আদ্যিকালেই উদ্ঘাটিত হয়েছিল—আলিপুরের বোমায়।

কিন্তু সেইখানেই যে উৎপাটিত হয়নি, তাব দৌড় আরো অনেক দূর গড়িয়েছে, আমার বন্ধু ব্যোমকেশ তার প্রমাণ।

আলিপুবের সেই বম্‌ব্‌কেস্‌-এর পর নিউ আলিপুরের এই ব্যোমকেশ! আমার বন্ধু বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীব্যোমকেশ দেবনাথ।

যখন সে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল, আমাদের সঙ্গেই পড়ত এক কলেজে তখন থেকেই যত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দিকে তাব ঝোঁক।

কিন্তু তখন কি জানি যে সেই ঝোঁকের অনেকখানি রোখ আমাদের ওপরেই পড়বে—তার ঝুঁকি সামলাতে হবে হতভাগ্য এই আমাদেরকেই...!

তখনই সে দুঃখ করেছে, আমাদের দেশে এডিসন সাহেবের মতন বৈজ্ঞানিক হল না...

'কেন, আচার্য জগদীশ বোস?' আমি বাধা দিযেছি তার কথায়।

'তিনি মহৎ বিজ্ঞানী হতে পারেন, কিন্তু নিত্য প্রয়োজনের হাজারো টুকিটাকি ঘরোয়া জিনিসের আবিষ্কর্তা এডিসনের মত চালু বৈজ্ঞানিক কই আমাদের? যিনি ইলেকট্রিক বাল্‌ব-এর থেকে গ্রামোফোনের রেকর্ড পর্যন্ত বানিযেছেন। তুচ্ছতম দরকারের জিনিসটিও যাঁব নজর এড়িযে যায়নি। তিনি না এলে, এত কিছু না করলে কি আজ এমন করে নিঃশ্বাস ফেলতে পারতুম আমরা?'

'নিঃশ্বাস ফেলাটা বোধহয় তাঁর আবিষ্কার নয়?' বলতে যাই আমি। —'অক্সিজেন কি তিনিই বাব করেছিলেন প্রথম?'

'থামো। এই যে মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে—ওটা ছাড়া কি সভ্য মানুষের জীবনযাত্রা কল্পনা করা যায় আজ? বিজ্ঞানের এই পাখা গজানোটা কার কাজ, বলো দেখি।'

'এই পাখা আবার আকাশেও ডানা মেলেছে ভাই!' আমি বলি, 'এরোপ্লেনের পাখার কথাই আমি বলছিলাম।'

'মেলেছেই ত! কোনদিন আবার মহাকাশেও তার মেলা দেখতে পাব।'

'তা, তুমি কি দ্বিতীয় এডিসন হতে চাও নাকি? মানে, তার দ্বিতীয় সংস্করণ?'

আমার কথায় সে রহস্যময় হাসি হেসেছিল।

ক্রমেই তার রহস্য উদ্ঘাটিত হতে লাগল। একদিন এসে বললে, 'একটা জিনিস উদ্ভাবন করেছি ভাই! সেটা তোমার ওপর পরীক্ষা করতে চাই।'

'সে কি! আমার ওপর কেন?' সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি।

'তোমার ওপরে নয় ঠিক, তোমার দরজার ওপরেই। নতুন ধরনের এক স্বয়ংক্রিয় তালা। চোর ডাকাত কারু সাধ্য নেই যে খুলবে! নিরাপদে থাকতে হলে এমন জিনিস না হলে চলে না। কিন্তু পেটেন্ট নেবার আগে বিধিমত এটার যাচাই হওয়ার দরকার।'

তালাটা সে আমার দরজায় লাগিয়ে দিয়ে গেল, কল-কৌশলটাও বাতলে দিয়ে গেল সেই সঙ্গে।

লাগাবার সময় কোনো ঝক্কি পোহাতে হয় না। মুখে মুখে লাগিয়ে দিলেই এঁটে যায়, কেবল খোলার সময়ই যা হাঙ্গামা—নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে খুলতে হয়। ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা, যেমন ইচ্ছে সাজিয়ে, তালাটা এঁটে দেবার পর তার গায়ের সংখ্যাগুলিকে এলোমেলো করে দাও। তারপর খোলার সময় সেই আঁটুনির কালের সংখ্যাগুলি মনে করে সারি বেঁধে সাজিয়ে দিলেই ঝটতি তালা খুলে যাবে, আর তা না হলে, মানে সাংখ্যতত্ত্বে ঠিক ঠিক না মেলাতে পারলে তার বজ্র আঁটুনি খোলে কার সাধ্যি!

তালা লাগিয়ে বেরিয়েছি, তারপর বাড়ি ফিরে যা আশঙ্কা করেছিলাম! আমার বিস্মরণ-শক্তির বাহাদুরি, কিছুতেই সেই সঠিক সংখ্যাটি মনে এল না। এক দুই তিন চার-দের কত রকমে চারিয়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উল্টে পাল্টে সারি সাজানো হোলো, সাজানোর দিক দিয়ে আমার সাজার চূড়ান্ত হোলো কিন্তু তালা আর খুলল না। শেষটায় নাচার হয়ে তালাকে (সেই সঙ্গে বাড়িটাকেও) তালাক দিয়ে অন্যত্র গিয়ে বাসা বাঁধলাম। কী করব?

সেই থেকে ভয়ে ভয়ে আছি! ভুলেও ব্যোমকেশের বাড়ি যাই না, ছায়া মাড়াইনে তার।

তবে বন্ধুবান্ধবদের কাছে তার খবর টবব পাই বটে।

'ব্যোমকেশের বাড়ি গেলে আর রক্ষে নেই ভাই! এমন সব মানুষমারা কল বানিয়ে রেখেছে যে'...শুনতে পাই তাদের মুখে—'তার ফাঁদে পা দিয়েছ কি গেছ!'

কিন্তু আমি আর তার মারপ্যাঁচের মধ্যে যাচ্ছিনে। তার বাড়ির ত্রিসীমায় আমি নেই—আমার বাড়ির সীমানাতেও তাকে দেখতে চাইনে। তার সেই স্বয়ংক্রিয় তালার কথা আমি ভুলিনি।

কিন্তু ভাগ্যও কখনো কখনো স্বয়ংক্রিয় হয় বোধহয়।

অকস্মাৎ একদিন পথের মধ্যে ব্যোমকেশের দেখা।

কোন এক কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েছে বললে। 'অধ্যাপকের চাকরিটা পাবার পরই বিয়ে করে ফেললাম ভাই।' সে জানায়, 'ভেবেছিলুম আমার বৌকে দেখতেও একদিন তুমি আসবে অন্ততঃ। তোমার রুচি প্রকৃতি সব পালটে গেছে দেখছি। বন্ধুদের তুমি পর বলে মনে করতে পারো, কিন্তু পরীদের তো তুমি বন্ধু বলে মনে করো চিরদিন। অন্ততঃ তাইতো আমি জানতাম।'

দম নেবার জন্যে সে থামে কিংবা পরীমুখাপেক্ষিতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে নবোদ্যম দেবার চেষ্টা করে আমায়।

'তোমার কি পরের বৌ দেখবারও সাধ হয় না বন্ধু?'

কথাটা আমি ভেবে দেখি। আমি পরস্ত্রীকাতর কোনদিনই নই, আর ভেবে থাকলে, ওই স্ত্রী-অংশটিই ওদের যথার্থ শ্রীভাগ। স্ত্রীভাগ্যেই ওদের শ্রীভাগ্য, স্ত্রীবান হয়েই তারা শ্রীমান।

তবুও আমি আগুপিছু করি—'আজ না ভাই, আরেকদিন। একটু জরুরি কাজ আছে আমার আজ। আর, বলতে কি, কারো জরু দেখার চেয়েও সেটা বেশি জরুরি...।'

আমি পাশ কাটাতে চাই, কিন্তু সে নাছোড়ঃ 'চলো, গিন্নীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব তোমার...'

কিন্তু গিন্নী দেখে এগুলে কী হবে, পেছনে যে ব্যোমকেশের কোৎকা! সেই বৈজ্ঞানিক মারপ্যাঁচ!

সে কিন্তু ছাড়তে চায় না কিছুতেই, পাকড়ে নিয়ে যায়।

বাড়ির দরজায় এসে সে বললে, 'আমার কোনো ডোরবেলটেল নেই ভাই! আনকোরা এই নতুন কায়দা। এরপর যখন আসবে, কোণের এই ছোট্ট বোতামটা টিপবে কেবল—টেপো, টিপে দ্যাখো। কোনো ভয় নেই। শকটক মারবে না।'

মনে মনে ভয় খেলেও, ওর কথামতন, দরজার যথাস্থানে আমার টিপ্‌পনি কাটি।

সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা হাট হয়ে খুলে যায় সটান।

ঘরের ভেতরে ঢুকতেই দরজাটা আপনার থেকেই বন্ধ হয়ে যায় আবার। বৈজ্ঞানিকের বাড়ির দোরগোড়া থেকেই বিজ্ঞানের বাড়াবাড়ি।

'এ সমস্তই রিমোট কন্ট্রোল। রিমোট কন্ট্রোল বোঝো?'

'মোটামুটি।'

ওর বসবার ঘরে এলাম আমরা।

'এই ফোল্‌ডিং চেয়ারটায় বোসো। ঘাবড়াচ্ছো কেন? ভয় কিসের? তোমায় গিলে ফেলবে না চেয়ারটা।'

আমি ইতস্ততঃ করি তবুও।

'না-না, কুঁকড়ে টুকরে যাবে না, বলছি আমি। আরাম করে বোসো।'

বসলাম সন্তর্পণে। বসে তাকালাম চারদিকে—

'ওমা! চারধারে এত রেল লাইন পাতা কেন হে? টয় রেলগাড়ি বানিয়েছো বুঝি? বাড়ির মধ্যেই গাড়ি চালিয়ে সস্ত্রীক রেলের পাড়ি জমাও নাকি?'

'না হে না! ব্যাপার আছে...এসো আমার শোবার ঘরে। দেখবে এস। সব বুঝিয়ে দেব তোমায়...'

লাইন ধরে ওর পিছু পিছু গেলাম। ওর বিছানার পাশ দিয়ে বরাবর চলে গেছে লাইন, পাশের ঘরের দিকে...

'ওদিকে বাথরুম। রান্নাঘর। খাবার ঘর ইত্যাদি যত। একেকদিন এমন আলিস্যি লাগে যে বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না, কোথাও যাবার ইচ্ছে করে না এমন কি এঘর ওঘর করতেও ভাল লাগে না, ইচ্ছে করে ঘরে বসে খাই দাই নাই...।'

'আমারও প্রায় তাই হয় ভাই। ইচ্ছে করে বিছানায় শুয়ে, শুয়েই শুয়েই সব কাজকর্ম সারি...'

'এটা হচ্ছে তারই ব্যবস্থা। একটা সুইচ টিপলেই, এই বেড সুইচটা...বেড সুইচ বোঝো ?'

'কেন বুঝব না ? টিপলে আলো জ্বলে নেভে—ওইটা টিপেই আলো জ্বালানো নেভানো যায়।'

'তাছাড়া আবও অনেক কিছু যায়। ওই বেড সুইচ টিপে এই বিছানাতে বসেই আমি রান্নাঘরের থেকে টয় ট্রেনে চাপিয়ে খাবার ট্রে-সব আমদানি করি। এই বিছানায় বসে খাই...রিমোট কন্ট্রোলে সব। ...রিমোট কন্ট্রোল বোঝো ?'

'মোটামুটি। তা, বেশ ভালো তো। আনাও তোমার খাবার দাবাব দেখি।' ওর কথায় আমি উৎসাহ বোধ করি।

'আনাব। যথাসময়ে। ব্যস্ত হও কেন হে ? বৌ দেখলে না কিছু না, আগেই খাবার ?'

'বৌ তো দেখবই। বৌ না দেখেই কি যাবো তুমি ভেবেছ ? তবে...' তবেটা উহ্যই থাকে। আমার ...র কথাটা এই যে বৌ তো আব খাদ্য নন, হাজার খাদ্যাখাদ্যের স্রষ্টয়িত্রী হলেও...আমার কাছে নন অন্ততঃ।

'এই ঘবে বসেই আমার খাওয়া। এইখানেই নাওয়া, তাও এই ঘরে বসেই হতে পারে।' সে জানায়, 'মানে, যদি ইচ্ছে করি।'

'তাই নাকি ? তাহলে তো খুবই ভালো হে !' আমি উচ্ছ্বসিত হই—'আমিও অবশ্যি বিছানায় বসেই খাই, সেখানেই শুই, শুয়ে শুয়েও খেতে পারি, খেয়েই আবার শুতে পারি। তবে বেডসুইচ টিপে নয়। বাসার ঠাকুর কৃপা করে এনে দিলেই তবে।' আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে—'আর নাইতে হলে আমায় সেই কলতলায় নামতে হয়।'

'তোমাব হচ্ছে সেই কলতলা আর আমার এই কলকৌশল। আমি সুইচ টিপে বাথরুমের থেকে এখানেই সব আনিয়ে নিতে পারি—দেখতে চাও... ?'

বলে সে বিছানার মাথায় লাগানো একটা বোতাম টিপে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যবর্তী একটা ঘরের দরজা খোলার আওয়াজ পাই। বাথরুমের দরজাই হবে বোধ হয়।

পাশের ঘর থেকে ঘর্ঘর ধ্বনির মতন ভেসে আসে। ঘড় ঘড় করে কী যেন একটা গড়িয়ে আসতে থাকে এদিকে...

গড় গড় করে গড়িয়ে আসে লাইনের ওপর দিয়ে...চলে আসে সটান আমাদের ঘরের ভেতর—সেই বিছানার পাশটিতেই...

প্রমাণ সাইজের জলভর্তি বাথটব। দেখে আমি চমকিত হই।

যেমন চমৎকার তেমনি চমক্‌দার...বলতে কি !

সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে খালি একটুখানি খুঁত ছিল কেবল। তবে তা নিয়ে এমন খুঁত খুঁত করার কিছু নেই। অন্ততঃ আমার দিক থেকে তো নয় নিশ্চয়। (বিশেষ করে তাই দেখাতেই ওর আমাকে নিয়ে আসা যখন !)

বরং আপাতদৃষ্টিতে আপাদমস্তক নিখুঁত বলেই মনে হয়...বিধাতার রিমোট কণ্ট্রোলের সৃষ্টি যদিও...

বাথটবে বসে বিবসনা নবযৌবনা ওর বৌ।

নূতন মুদ্রণ

আমার বন্ধু প্রদীপ দারুণ লিখিয়ে, পেল্লায় পেল্লায় বই লেখে যত! রহস্য রোমাঞ্চের বই সব।

সে এসে ধরলে আমায়—'একটা বাড়ি দেখে দিতে পারো ভাই? কলকাতার বাইরে কোথাও, এই মধুপুর কার্মাটার গিরিডি কি হাজারিবাগ...?'

'কলকাতার বাইরে কেন—হঠাৎ?'

'কলকাতায় ভারী গোলমাল ভাই! কাজ করার যো নেই। প্রকাশকদেব বিস্তব টাকা খেযে বসে আছি, পূজোর ছুটিতে কোথাও গিয়ে নিবিবিলি বসে খানকয়েক মোটাসোটা বই লিখে ফিবতে হবে আমায়।'

'শালুমাসিরই বাড়ি রয়েছে দেওঘরে। দেহাতের দিকটায়। খালিই পড়ে থাকে তো।'

'পাওয়া যাবে বাড়িটা?'

'খালিই পড়ে থাকে বাড়িটা মালীর হেফাজতে, বলছি না? মালীর নামে মাসির কাছ থেকে একটা চিঠি বার করে নেব না হয়। যদ্দিন খুশি গিয়ে থাকতে পারো সেখানে স্বচ্ছন্দে।'

'তোমার মাসি বা মাসতুত কেউ গিয়ে পড়বে না ত এর ভেতর আবার হুপ করে?'

'শম্পা সেখান থেকে হারিয়ে যাওয়ার পর সেখানে কেউ যেতে চায় না আর। কখনো যাবে কিনা সন্দেহ।'

'শম্পা কে?'

'শালুমাসির মেয়ে। তোমার মতই কলকাতার গোলমাল এড়িয়ে কোথাও নিরিবিলি কিছুদিন কাটাতে চেয়েছিল—ইকনমিক্‌সে বি-এ পাশ করেই। কিন্তু তারপর আর সে ফেরেনি। কোনো খবরই পাওয়া যায়নি তার আর। শম্পা নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে...কী, কোনো রহস্যের আমেজ পাচ্ছ নাকি হে?' আমি কটাক্ষ করলাম।

'এই নিখোঁজ হওয়ার রহস্য আমার জানা আছে বেশ।' জানাল সে আমায়।

'কী রহস্য শুনি?'

'আত্মানং বিদ্ধি।'

'তার মানে?' রহস্যবিদ্ধ হয়ে শুধাই।

'তার মানে, নিজের খোঁজ নাও, তাহলেই নিখোঁজ হওয়ার রহস্য টের পাবে। তোমার ভাষাতেই বললাম কথাটা।'

'আমার ভাষা কিনা জানিনে, তবে এর ভাষ্য করা আমাব সাধ্য নয়।'

'আমিও একবার নিখোঁজ হয়েছিলাম কিনা! তার থেকেই জানি। পনের ষোলো বছর বয়স তখন আমার। ক্লাস নাইন কি টেনে পড়তাম। প্রায় সমবয়সী একটি মেয়েকে একদিন পথে দেখে কেমন করে যে চোখে লেগে গেল, পিছু নিলাম তার। ফলো করে করে হাওড়া স্টেশন। মেয়েটি ট্রেনে চাপলো। আমিও। কোনই আমার হুঁশ নেই তখন, যেন নিশির ডাকে পাওয়ার মতই চলেছি। পরদিন ভোরে মুড়ি জংশনে গাড়ি বদল করে রাঁচি স্টেশনে গিয়ে নামলাম আমরা।...'

'কে মেয়েটা ?'

'আমি কী জানি! সারাটা পথ এক কামরায় কাটালেও আর আমার প্রায় সমবয়সী হলেও তার সঙ্গে একটা কথা কইবারও সাহস হয়নি আমার।' বললে প্রদীপঃ 'কী যে ছিলাম তখন! সেকথা ভাবলে এখন হাসি পায়।'

'তারপর ?'

'মন্ত্রমুগ্ধের মতই তার পিছু পিছু চলেছি এমন সময় এক বন্ধুর সঙ্গে পথে দেখা, সে আমায় বাধা দিল—কবে এলি রে এখানে ? তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে আমি শুধালাম—ঐ মেয়েটি কে বল্‌তো ? সে বললে, আমাদের হেড মাস্টারের মেয়ে। আলাপ করবি নাকি ? কিন্তু হেড মাস্টার শুনেই না আমি ঘাবড়ে গেছি।'

'ঘাবড়াবার ছিলো কী!' আমি বললামঃ 'অন্য ইস্কুলের হেড মাস্টারের ত ফুলবেঞ্চে তোমার বিচারের কোনো এক্তিয়ার ছিল না। সে কি তোমায় নিলডাউন করাতে পারত বেঞ্চের উপর ?'

'না পারুক। তখুনি আমি সটান্ স্টেশনে এসে ফিরতি ট্রেনে বাড়ি ফিরে এলুম।'

'ভালই করেছিলে! নইলে কে না কে-র অভিসারে বেরিয়ে কাঁকের এলাকায় গিয়ে পড়তে। রাঁচির মেয়েরা ভারী পাগলকরা ভাই! জানি আমি। রাঁচির লালপুরায় থাকতাম তো এককালে। কামিখ্যের মতন অতখানি না হলেও, মানে, একেবারে ভ্যাড়া না বানালেও, যাবা সেখানে হাওয়া বদলে যায় তাদের আদ্ধেককে তারা সেইখানেই রেখে দেয়। কাঁকের পাগলা গারদেই।'

'বাড়িতে ফিরে এসে বললুম, এক জন লোক আমায় একটা ফুল শুঁকিয়ে না ভুলিয়ে পুরুলিয়ায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল। তারপর অতিকষ্টে তার কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে না...ইত্যাদি ইত্যাদি! এখন বুঝলে ত, ছেলেমেয়েরা কেন যে নিরুদ্দেশ হয়, তার রহস্য আমার একেবারে অজানা নয়।'

'কিন্তু আমাদের মালীর ধারণা যে, মেয়েটাকে পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। তাছাড়া, লোকাল লোকেরাও বলে থাকে ওটা নাকি অনেক কালের ভূতুড়ে বাড়ি। ভূতপরীদের দৃষ্টি আছে ওর ওপর। ভূতপরী—এসব মানো তুমি ?'

'ভূতের কথা যদি বলো তো তোমাকে শরৎবাবুর সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিই। কী বলিয়েছিলেন তিনি সতীশের মুখ দিয়ে ? ভূতে বিশ্বাস করি—আর ভগবানে বিশ্বাস

করব না? আমার কথাটা অবশ্যি তার উল্টো। ভগবানে বিশ্বাস করি আর ভূতকে করব না?'

'ভূত বরং আরো বেশি জাগ্রত ভাই!' সায় দিই আমি: 'ভগবান কখনো ভয় দেখান না। কিন্তু ভূত দেখায়।...তাহলে পরীতেও তোমার বিশ্বাস আছে—বলো?'

'নিশ্চয়! পরকে আমার বিশ্বাস নেই একদম, কিন্তু পরীকে...আলবৎ!' সে গম্ভীর হয়ে বলে, 'পরীরা আছেন এ যুগেও... সশরীরী অশরীরী দুইই। এমন কি তোমার যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী কনান ডয়েলও ভূতপরীদের মানতেন। পরীদের তিনি দেখতেও পেতেন নাকি বলে থাকে।'

'পরীটরি হচ্ছে সে যুগের রূপকথার লেখকদের কল্পনাবিলাস।' আমি বলি। —'তুমি নিশ্চয় সিরিয়সলি একথা বলছ না?'

'সিরিয়াসলিই বলছি, ভূতপরী ডাইনিদের যুগ একেবারে চলে যায়নি ভাই! কেবল তাঁরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকেন এই যা! তাহলে বলি, তোমার ঐ পরিবার পরিকল্পনাটাই বা কী? নিজের পরিবারকে পরীরূপে কল্পনা করা বই ত নয়। পরীর মতই তাঁকে ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখা—তা ছাড়া কী?'

'বেশত, সেখানে গিয়ে যদি পরীটাকে পাকড়াতে পারো তো শম্পার রহস্যেরও একটা কিনারা হবে। মন্দ কী!' আমি বললাম—'আর তা যদি নাও পারো, পরীর রহস্য আর শম্পার রহস্য দুই-মিলিয়ে একাকার করে একখানা বই লিখে তো আনতে পারবে!'

মালীর নামে চিঠি নিয়ে চলে গেল প্রদীপ দেওঘরে। আর, ফিরে এল তিন মাস পরে—মোটা একটা বই লিখে আর বইয়ের সঙ্গে শম্পাকে সাথী করে—বৈশম্পায়নের নতুন সংস্করণ হয়ে।

তারপরে শম্পার অন্তর্ধান-বার্তা তার মুখে যেমনটি শুনেছিলাম আর শম্পার মুখে সে যা শুনেছিল—দুই মিলিয়ে সেই কাহিনী এখানে বলতে যাই যদি, আপনাদের কাছে তা সেকালের সেই রূপকথারই নতুন মুদ্রণ বলে মনে হবে হয়ত বা!...

শরতের আকাশে ছিন্নভিন্ন মেঘেরা জোট বেঁধে বিকেলের রোদে খেলা করছিল—কালিদাসের আমলে ঠিক যেমনটি দেখা যেত সেকালে। তাদের দেওঘরের বাড়ির ছাদের আলসেয় ঠেলান দিয়ে অগাধ আলস্যে তাকিয়েছিল শম্পা...

এমন সময় দেখা গেল একজনকে...কালিদাসের কালেই যারা দেখা দিত আকচার।

এক পরী হঠাৎ উড়ে এল আকাশ দিয়ে...দেখে অবাক হয়ে গেল শম্পা।

পরীই ত বটে! আশ্চয্যি!

এমন সময়ে পরীটা আঙুল বাড়িয়ে কী যেন দেখাতে চাইল, আর কী যেন বলল তাকে।

'লক্ষ্মী মেয়েটি, চেয়ে দেখ। সেই বিদঘুটে ডাইনিটা আসছে আবার। সাবধান!'

স্পষ্ট শুনতে পেল সে। আর সেই সঙ্গে দেখতে পেল পরিষ্কার—শ্যাওড়া গাছে চেপে বিচ্ছিরি চেহারার এক ডাইনি বুড়ি উড়ে আসছে আকাশপথে।

গাছ উড়িয়ে ডাইনিটা তাদের ছাদে এসেই নামল—উড়ে এসে জুড়ে বসল—তার গাছটিতেই একেবারে।

'তোমার নাম কী?' শুধালো তাকে ডাইনিটা।

'শম্পা।'

'শম্পা নয়, শম্পাবতী। আমাদের রাজকন্যা চম্পাবতীর বোন তুমি—যাকে আমি সেবার একটা টিয়াপাখি বানিয়ে দিয়েছিলাম।'

'একেও কি তুমি টিয়াপাখি বানিয়ে ছাড়বে নাকি?' পরীও তখন দাঁড়িয়েছিল সেই ছাদেই। বললে সে—'কিন্তু এতো তোমার কোনো রাজকন্যে নয়। নিতান্ত সাধারণ এক মেয়ে। একে তুমি দয়া করে ছেড়ে দাও বরং।'

'রাজকন্যে আর পাচ্ছি কোথায় বাপু! রাজা গজা কি আছে এখন আর এ যুগে। এদের নিয়েই কোনরকমে কাজ চালাতে হবে আমাদের। কিন্তু কী বানানো যায় একে?'

ভাবনায় পড়ে গেল ডাইনি। —'নাঃ, টিয়াপাখি বানিয়ে লাভ নেয়। রাজপুত্তুররা সব টের পেয়ে গেছে একালে। তারপর থেকেই তারা টিয়াপাখিদের বিয়ে করতে লেগেছে কিনা কে জানে! যদি সে একদিন ফের রাজকন্যে হয়ে দাঁড়ায় সেই ভরসাতেই। তার চেয়ে ওকে না হয় একটা ইনকম ট্যাকসোর টেবল বানিয়ে দিই, কী বলো? ইনকম ট্যাকসের চার্ট হয়ে পড়ে থাক এই ছাদে। সেই বেশ?'

এই বলে আবার নিজের গাছে চড়ে উড়ে গেল ডাইনিটা। আর শম্পা পড়ে রইল সেইখানে ইনকাম ট্যাকসের একখানা চটি বই হয়ে।

পরীরও তারপর করবার কিছু ছিল না আর। ডাইনির ঘোর কাটানোর মতন তেমন জোর ছিল না ওর। সেও উড়ে চলে গেল তারপরে।

দিন যায়। দিনের পর দিন যায়, বছরের পর বছর। ইনকম ট্যাকসের ছক হয়ে সেই ছাতে পড়ে থাকে শম্পা।

মালীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে প্রদীপ তালা খুলল। দোতালার একটা ঘর সে বেছে নিল নিজের থাকার জন্যে।

তারপর সে ভাবল—যাই, ছাদে যাই একবারটি। চার পাশের প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিগে।

'বাঃ বাঃ! বেশ ছাদটি তো!' ছাদে উঠে বলল সেঃ 'একটা আলসের মতও রয়েছে দেখছি এক ধারে। এখানে বসেই আমার লেখাটেখা চলবে বেশ। দিব্যি জায়গা!'

আলসেয় গিয়ে বসল সে অলসের মতই। —'বাঃ! এখানে একটা ইনকম ট্যাকসের টেবল পড়ে রয়েছে দেখছি। এটাতে আমার সুবিধেই হোলো। ইনকম ট্যাকসের হিসেবটা তৈরি করতে পারব। ...করে ফেলা যাক হিসেবটা...এবার পূজাসংখ্যায় তিনখানা উপন্যাসের দরুন আমার আয় হয়েছে সাড়ে চার হাজার। তার দুখানার চিত্রস্বত্ব বেচে দিয়ে পেয়েছি হাজার বারো। তিরিশখানা গল্প লেখার জন্যে নেট উপায়, গড়পড়তা পঁচাত্তর করে ধরলেও প্রায় দু-হাজারের কাছাকাছি! আর উপন্যাস তিনখানার প্রথম সংস্করণের

প্রকাশস্বত্ব বেচে...নাঃ, কোনই ফয়দা নেই এত টাকা কামিয়ে। ট্যাকসো গুণতেই বেরিয়ে যাবে সব।' ...বলে সে আপন মনেই আওড়ালো...

'বৃথাই তুমি লাভ কামাও মিথ্যে মায়ার ফেরে। আসতে যেতে ট্যাকসো দাও—করাত যেমন চেরে।'

এদিকে, তার ছন্দপতনের সাথে সাথেই এক অঘটন ঘটে গেছে ছাদের ওপর! তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এক রূপসী কন্যা।

কোথায় ছিল মেয়েটা? ছাতেরই অন্য ধারে কোথাও, নাকি, সিঁড়ি বেয়েই উঠে এসেছে এর ভেতর কখন! কই, নজরে পড়েনি ত তার।

'আপনি কে?' জিজ্ঞেস করেছে সে।

'আমি শম্পাবতী।' বলে একটু ঢোক গিলল মেয়েটা—'এক রাজকন্যে।'

একটু যেন সে হতচকিতই।

'অ্যাঁ? কী বললেন?'

'রাজকন্যে চম্পাবতীর নাম শুনেছেন ত? আমি তার বোন।' অনুযোগ করল মেয়েটি।

'বাঃ বেশতো!' উৎসাহিত হয়ে উঠল প্রদীপ—'কোথায় ছিলেন বলুন ত? এলেন কী করে এখানে?'

'এইখানেই ছিলুম ত! এইখানেই একটা ইনকম ট্যাকসের টেবিল হয়ে পড়েছিলাম এতদিন। এক ডাইনি আমাকে তাই বানিয়ে ফেলে রেখে গেছল কিনা! তারপর...আপনি ঐ ছড়া কাটলেন তো? তাতেই আমার ফাঁড়াটা কাটল। ডাইনির মায়া কেটে গেল তাইতেই।'

'তাই নাকি!...তা, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে! এমন ত হয়েই থাকে।' প্রদীপ সায় দিল ঘাড় নেড়ে—একটুও অবাক না হয়েই।

'আপনি কে?' মেয়েটি শুধায় এবার।

'আমি প্রদীপ।' তারপর একটু ভেবে নিয়ে—'প্রদীপকুমার'।

'আপনি কি কোনো রাজপুত্তুর?'

'বলতে পারেন। এ যুগে যারা সিনেমা স্টার, সাংবাদিক আর নবেল লেখে তাদের রাজপুত্র বলেই ধরা হয় বটে।'

'ভাগ্যিস আপনি এখানে এসেছিলেন!'

'আমারও ভাগ্য বলতে হয়! এখানে এসে একটা ইনকম ট্যাকসের টেবল পেয়ে গেছি, তার থেকে আমার হিসেবটা করতে পারব...ওমা! কোথায় গেল সেই ছকখানা?'

'উপে গেল যে সেটা। সেটা উপে গিয়েই না আমি এলাম।'

'তাই নাকি? ...তাহলে ত ভারী মুশকিল!'

'মুশকিল কিসের! আমি আপনাকে ট্যাকসের থেকে বাঁচিয়ে দেব। ...আপনি যেমন আমায় বাঁচালেন, তেমনি আমিও আপনাকে বাঁচাতে পারি, তা জানেন?'

'কী করে? আপনার বাবাকে বলে? কিন্তু আপনি ত সত্যিকারের কোনো রাজার মেয়ে নন যে আপনার কথায় মহারাজার ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত হবে। আপনি কে, তা আমি ভালই জানি।'

'আমি রাজকন্যে শম্পাবতী।'

'মোটেই না। আপনি হচ্ছেন শম্পা। আমাদের শিব্রামের কাজিন। আপনার পরিচয় আমার জানা আছে।' প্রদীপ জানালো : 'কোথাও উধাও হয়েছিলেন আর এইমাত্র ফিরলেন এখন। আর বলতে কি, আমিও কোন রাজকুমার নই। নিতান্ত সাধারণ একজন—সামান্য প্রদীপ মাত্র। পড়েছেন কিনা জানি না, গল্প-টল্প লিখে থাকি আমি।'

'তাহলেও আপনার ইনকম ট্যাকসো কমাতে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারব।'

'কী করে ?' সাহিত্যের ছাত্র ইকনমিকস্-এর ছাত্রীর কাছে কৌশলটা জানতে চায়।

'কেন, আপনাকে বিয়ে করে।'

শিক্ষার ষাঁড়ভাগ

প্রথম ভাগের থেকে আমাদের শিক্ষালাভ শুরু হলেও এবং জীবনের অন্তিমক্ষণ পর্যন্ত ধারাবাহিক চললেও—যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি, পরমহংসদেবের এই পরম বাক্য মেনে নিয়েও আমাদের অনেকেই শিক্ষার সারভাগে বঞ্চিত থেকে যাই বলে আমার ধারণা।

ষাঁড়ভাগই হচ্ছে তার সারভাগ। ধর্ম অর্থ কামের—মোক্ষম!

মোটামুটি আমি তাই বুঝতাম। কিন্তু আমি যে একেবারে ঠিক উল্টোটাই বুঝেছি। আমার ছ বছরের ভাগনে টিকলু আমায় সোজাসুজি সেটা সমঝে দিয়েছিল একদিন...

টিকলুর বয়স এখন বারো কি তের, ক্লাস এইট কি নাইনের ছাত্রই বোধ হয়, কিন্তু যখন সে মাত্র ছয় তখনই এই নয়ছয় কাণ্ডটা বাধিয়েছিল।

এই বারো বছরে দিগ্বিদিকের থেকে আর বন্ধুজনের সৌজন্যে তার শিক্ষালাভের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি আশা করি। যদিও সেই বাড়ন্ত জ্ঞানগম্যির কিঞ্চিৎ ভাগও আমাকে দেবার কোনো দায় তার নেই, কেননা ভাগ নেবার জন্যেই ভাগনে, বলে থাকে কথায়। কিন্তু তাহলেও ভাগনেরা মামার মতনই হয়ে থাকে সেটা হয়ত সত্যি হলেও তাকে আপনার ছাঁচে গড়ে পিটে নেবার দায়ভাগ মামার থেকেই যায়। আমার দিক থেকে তার কোনো অন্যথা হওয়া উচিত নয় বলেই আমি চিরকাল মনে করেছি...কিন্তু করলে কী হবে, সেই ছ বছর বয়সেই সে জ্ঞানসমুদ্রের উপকূলে বেড়াতে বেড়াতে যা ছয়লাপ কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল...তা ভাবতেও আমার হৃৎকম্প হয় এখন!

আমরা ভাইবোনে কথা কইছিলাম, মাঝখান থেকে টিকলু দুম্ করে আরেক কথা পেড়ে বসল—'আমরা কোত্থেকে এলাম মা ?'

প্রশ্ন শুনে আমি গুম হয়ে গেলাম। জবাও।

'কোথ্ থেকে আবার ? সবাই যেমন করে আসে।' গুমরে উঠল জবা খানিক বাদেই : 'পরীতে দিয়ে গেছে তোমাকে।'

'পরীতে!' জবাব পেয়ে টিকলু অবাক!

'পরীই তো দেবে। পরীরাই তো দেয়।' জবা বলল, 'একদিন ঠিক দুপুর বেলায় ছাদে রোদ পোহাচ্ছিলাম, এমন সময় দেখলাম কি, আকাশ দিয়ে একটা অপ্সরা উড়ে যাচ্ছে। আমি তাকে সাধলাম তখন—ওগো, আমাকে একটা খোকন দাও না! অমনি সে টুপ করে তোকে আমার কোলের ওপর ফেলে দিয়ে চলে গেল! ...সেই পরীটা। তুই তখন এই টুকুন।'

'তুই এসব কী শেখাচ্ছিস জবা?' বাধা না দিয়ে আমি পারি না।

'কী শেখালুম আবার?'

'এই ভূতপরীর কাহিনী যতো! এমন ভুল শিক্ষা দিচ্ছিস কেন ওকে?'

'কেন, ভুলটা কী হলো?'

'শিশুদের কাছে এই সব ভূতপরীর গল্প ফাঁদা। এটা ভুল পথ। তুই যে গুল মেরেছিলিস, সেটা দুদিন বাদেই সে টের পেয়ে যাবে। ওর সন্ধিৎসু মন যে করে হোক ব্যাপারটা জানবেই। জানতে চাইবেই। ওর বয়স্ক বন্ধুদের কাছ থেকে এই বস্তু বিকৃতভাবে লাভ করবে। তার ফলে দাঁড়াবে মনোবিকার—যার শিকার হয়ে ভুগতে হবে ওকে সারাজন্ম, জীবনটাই হয়ত ব্যর্থ হয়ে যাবে ওর।'

'কী যা তা বক্‌ছো দাদা?'

'যা তা নয়, নিছক সত্য। যতই শিশু হোক ওর ভেতরে পরিণত মানুষের অঙ্কুর রয়ে গেছে, সত্য পথে সহজ পথেই তার বাড় হওয়ার দরকার। জ্ঞানের রাস্তায় কোনো বাধা রাখতে নেই! রুখতে নেই। কারণ, জ্ঞানে কখনো ক্ষতি করে না, অজ্ঞানেই হয়ে থাকে।...'

'সত্যি সত্যি পরী আছে নাকি মামা?' কচকচির মাঝখানে টিকলু দেবযানীদের আমদানি করে: 'দেখতে পাওয়া যায় তাদের?'

'আছে বইকি সোনা। তবে তারা আকাশপথে আনাগোনা করে না, এই পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে। বেশির ভাগ পরের বাড়িতেই দেখা যায় তাদের, সেই জন্যেই তাদের ওই নাম। পরের বলেই পরী। কখনো সখনো নিজের বাড়িতেও দেখা যায় না যে তা নয়। (বলে জবার দিকে আমি কটাক্ষ করি) তবে পরের বাড়িরটিকেই আদর করে আমরা পরী বলে থাকি। এখন তুমি এসব কথা বুঝবে না, বড়ো হলে নিজের থেকেই টের পাবে সব।'

নরাণাং মাতুলক্রমের ধারা সত্য হলে, মনে মনেই বলি আমি, তোমার মধ্যেও পরিণত বুদ্ধির পরিচয় একদা পাওয়া যাবে, কালক্রমে তোমার পরিক্রমাও দেখতে পাব (বেঁচে থাকি যদি), তোমার পরাক্রমও না দেখে যাব না।

দেহি পদ পল্লব মুদারম্‌। পরীর কাছে নতি স্বীকারেই পরিপূর্ণ মানুষের পরিণতি...যথাস্থানে পরাস্ত হওয়াতেই পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা।

'তুমি একটা পরী আমায় এনে দেবে মামা?'

'আনতে হবে না, তুমি নিজেই নিয়ে আসবে। বড় হও তো, কত পরী তোমার সঙ্গে ঘুরঘুর করবে তোমার আশেপাশে, চাইকি তাদের একটার সঙ্গে তোমার বিয়েও হতে পারে।

'তা হোক, কিন্তু আমরা কোথ্থেকে এসেছি তা তো তুমি বললে না ?'

'নাও, কী বলবে বলো।' মুখ টিপে হাসল জবা।

'কিচ্ছুটি না রেখেঢেকে খোলাখুলিই বলতে হবে সব। এমন কি, বায়োলজির ঐ মোটা কথাটাও। কিন্তু কী ভাবে পাড়া যায় ভাবছি তাই! মনস্তত্ত্ববিদের মতে যৌনশিক্ষা ছাড়া কারো শিক্ষা যথার্থ সম্পূর্ণ হয় না—তা জানিস ? আর সেই শিক্ষা শৈশবের থেকেই শুরু হওয়ার দরকার। নইলে ছেলেমেয়েরা কৌতূহলের শিকার হয়ে বাঁকাচোরা পথে যায়, আজেবাজে লোকের কাছ থেকে ভুল শিক্ষা পায়, ফলে উত্তরকালে যৌনবিকৃতি আর মানসিক বিকারে ভোগে। যাতে এই ভুলবোঝাবুঝি না দাঁড়ায় সেই কারণে গোড়ার থেকেই তাদের সোজাসুজি সব বলা উচিত। ফ্রয়েড বলেন...'

'ফ্রয়েড তুমি পড়েছ ?'

'পড়তে হয় না। ফ্রয়েড, কার্ল মার্কস—এদের কথা প্রায় বেদবাক্যের ন্যায়। শ্রুতি-স্মৃতির পর্যায়ে পড়ে। এর ওর মুখে শোনা যায়, এ লেখায় সে লেখায় এক আধটু উদ্ধৃতি নজরে পড়ে—তাই থেকেই মনে গাঁথা হয়ে থাকে। শ্রুতি-স্মৃতির সনাতন সত্যের মতন সেকেণ্ডহ্যাণ্ড পাওয়া হলেও চিরন্তন সত্য এসব। মুখে মুখে রটে। কখনো এর এদিক ওদিক হবার কথা নয়। প্রয়োজন মত মনের থেকে পঙ্কোদ্ধার করলেই হলো। ফ্রয়েড বলেন...'

'ফ্রয়েডের কথা বোলো না। তোমার মতন এক ফ্রয়েডের দেখা পেয়েছিলাম একবার, চৌরঙ্গী পাড়ার বিরাট এক বিভাগীয় বিপণিতে। তাঁর কাছেই ফ্রয়েড কী বলেন তা টের পেয়ে গেছি।'

'কী হয়েছিল শুনি ?'

'এইত সেদিন। সেলের খবর পেয়ে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কেনাকাটা করতে গেছলাম, খেলনার বিভাগে গিয়ে টিকলু তো আর সেখান থেকে নড়তেই চায় না, একটা দমদেওয়া মোটরগাড়ি জবর দখল করে বসেছে, না নিয়ে ছাড়বে না কিছুতেই। কী তার বায়না গো! অথচ অতগুলো টাকা এই বাজারে বাজে খরচ করা যায় না—কিন্তু ও কি বুঝবার ছেলে? তখন রাগ করে ওকে ধরে ঠেঙাতে যাচ্ছি, এক ভদ্রলোক হাঁ হাঁ করে এসে বাধা দিলেন। শুনলাম উনি সেখানকার কর্মচারী—শিশুমনোবিদ এক ডাক্তার নাকি। তিনি বললেন, শিশুদের গায় কদাচ হাত তুলতে নেই দিদি! মেরে ধরে শিক্ষা দেওয়া যায় না। সেটা উচিতও নয়। তাতে শিশুরা মানসিক অবদমিত হয়, পরিণামের দিক দিয়ে যেটা ভয়ঙ্কর। ওদের মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বোঝাতে হয়। দাঁড়ান, ওকে আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে আসি—বলে ওকে আড়ালে নিয়ে গেলেন। এক মিনিট পরেই টিকলু সুড়সুড় করে এসে খেলনাটা আপনার থেকেই ফিরিয়ে দিল, ফিরেও চাইল না তারপর।'

'তবেই বোঝ—মনোবিজ্ঞানের বাহাদুরিটা কোথায়।' আমি উক্ত অনুপস্থিত মনস্তত্ত্ব-কুশলীকে সাধুবাদ না দিয়ে পারি না—'কিন্তু আমি ভাবছি এক মিনিটে সে এমন কী শেখালো যে টিকলুর শিক্ষা হয়ে গেল...'

'টিকলুর মত অমন দুষ্টু ছেলেকে এক কথায় শিক্ষা দিয়েছে সে। কী বলেছিল রে টিকলু, লোকটা তোকে? তোর মামাকে বল না! ওর মুখেই শোনো তুমি।'

'কী বলেছিল রে?'

বলতে গিয়ে ভাগনের অমন হাসিখুশি মুখ বেশ ভারভার হয়ে এল—'লোকটা আমায় বাইরে নিয়ে গিয়ে করল কি, মামা, কসে এক গাঁট্টা মারল আমার মাথায়। আর বলল যে ভালোয় ভালোয় যেখানকার জিনিস সেখানে যদি রেখে না দাও তো তোমাকে এর চেয়েও জোর আরেক গাঁট্টা লাগাব। ভারী খারাপ লোক মামা!'

ভাগনের হাস্যখুশির প্রচ্ছদ ধারাপাতেব নামতায় দাঁড়ায় আর কি!

'এই ত তোমার ফ্রয়েড?'

'মোটেই ফ্রয়েড নয়, আস্ত একটা ফ্রড্।' আমার দ্বিরুক্তি হয়ঃ 'ফ্রয়েড নয়, ফ্রড্।'

'ফ্রড্?'

'ফ্রএড-এর এ-কারটা নেই। ফ্রয়েডীয় শিক্ষা আর হাতুড়ে শিক্ষায় একাকার করে ফেলেছে লোকটা!'

'টিকলুর মত দুর্দান্ত ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া কারো একাব কর্ম নয়। হিমশিম খেতে হয়...'

'কই বললে না মামা, কোথ্থেকে...'

টিকলুব কথার মাঝখানে বাধা পড়ে, জবা বলে ওঠে—'কী বলে বোঝাবে বোঝাও এখন! নাকি, এনে দেব তোমায় একটা ফ্রযেডীয় হাতুড়ি? কয়লা ভাঙা সেইটা?'

'হাতুড়িব কাজ নয, ওকে খোলাখুলি পবিষ্কাব সব আমি বুঝিয়ে দিতে চাই। দিচ্ছি দাঁড়া, দ্যাখ্ না। কিন্তু কী করে আরম্ভ করা যায় সেই সমস্যা।'

'কথাটা বলতে তোমার আটকাচ্ছে বুঝি?' ঠোঁটে ওর হাসির টিপ্পনি।

'না-না, আটকাবে কেন? কোথাও আটকাচ্ছে না। কিন্তু কী ভাষায় বললে ও ধরতে পারবে ভাবছি তাই। কিচ্ছুটি না লুকিয়ে সব কিছু ওকে বোঝাতে হবে তো—fully বোঝাতে হবে—আচ্ছা, বেশ, ফুলের থেকেই শুরু করা যাক না! ফুলের মত ছেলের কাছে ফুলের দৃষ্টান্তই তো ভালো।...আচ্ছা টিকলু, তুই ফুলের ওপর প্রজাপতিদের বসতে দেখেছিস?'

'হ্যাঁ মামা।'

'কি জন্যে তারা বসে রে?'

'মধুপান করার জন্যে।' বলেই সে পদ্যপাঠের গুঞ্জন গান শুরু করে—'গুণ গুণ রবে ওরা মধুপান করে। আশায় হতাশ হলে আসিবে না আর। আর না করিবে সেই মধুর ঝঙ্কার...'

আমি ওর মধুর ঝঙ্কারে বাধা দিই—প্রজাপতি আর মৌমাছিতে সে গুলিয়ে ফেলেছে দেখেও সেই ভ্রমসংশোধনে না গিয়ে আসল কথায় এগিয়ে যাই—'এখন, ওই প্রজাপতি এক ফুলের থেকে আরেক ফুলের বুকের ওপর গিয়ে বসে—দেখেছিস ত?'

'দেখেছি মামা।'

'কেন বসে জানিস? আমাদের মধ্যে যেমন ছেলে আছে মেয়ে আছে—আছে না? তেমনি ফুলেদের মধ্যেও রয়েছে—ছেলে ফুল আর মেয়ে ফুল। আমাদের যেমন ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে হয়... হয় তো? তেমনি ফুলেদের বেলাও তা হয়ে থাকে। প্রজাপতির কাজ হচ্ছে তাদের সেই বিয়ের ঘটকালি করা। বুঝেছিস?'

টিকলু মাথা নাড়ে, বুঝেছে কিনা বোঝা যায় না, আপন মনে আওড়ায়—'ছেলে ফুল আর মেয়ে ফুল! ছেলে ফুল আর মেয়ে ফুল!!'

'হ্যাঁ। যেমন আমাদের মধ্যেও আছে না? তুই যেমন একটা ফুলের মতন ছেলে আর তোর দিদি টুম্পা একটু ফুলের মত মেয়ে—সেইরকম।'

'আমাদের ওপর কিন্তু কোনো প্রজাপতি বসে না মামা।' বাধা দিয়ে টিকলু জানায়।

'বসবে বসবে—সময় হলেই বসবে। যথা সময়ে তোরাও প্রজাপতির নজরে পড়বি বইকি! প্রজাপতির নির্বন্ধ যাবে কোথায়? এখন যা বলছিলাম...এখানে যেমন ছেলেরা ইচ্ছে করলেই মেয়ের কাছে যেতে পারে, মেয়েরা ইচ্ছে করলেই ছেলেদের কাছে আসতে পারে...আমাদের হাত পা সব আছে তো? কিন্তু ফুলেদের তো আর তা নেই, তাই তারা কেউ কারো কাছে যেতে পারে না...ইচ্ছে থাকলেও পারে না। কিন্তু তাদেরও বাঁচতে হবে, বাড়তে হবে তো?'

'বংশ মানে বাঁশ। বয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার আর তালব্য শ—বাঁ আ শ। ফুলের মধ্যে বাঁশ পাচ্ছ কোথায় মামা?' টিকলু শুধায়।

'বাঁশ নয়, বংশবৃদ্ধি। মানে, ফুলেদেরও নিজেদের ঝাড়গুষ্ঠি বাড়ানো দরকার—বাঁচবার তাগিদেই। নইলে তো ফুল গাছের বংশই লোপ পেয়ে যাবে পৃথিবীতে, একটাও আর জন্মাবে না এরপর। এখন, এই ফুল গাছ গজাবার বীজ থাকে গাছের ফুলের গর্ভে...বুঝলি তো? প্রজাপতি যখন ফুলের ওপর এসে বসে তখন তার পাঁপড়ির ভেতরের সেই বীজগুলো তার পায়ে লেপটে যায়, এইভাবে এক ছেলে ফুলের থেকে পায় পায় তার বীজ গিয়ে আবার সে যখন আরেক মেয়ে ফুলের বুকের ওপর গিয়ে বসে তখন সেই দুই বীজের মিলন হয়—একসঙ্গে তারা জড়িয়ে যায়। সেই বীজ-বীজে ফুলগুলো একসময় মাটিতে ঝরে পড়ে কখন। আর মাটিতে পড়লেই প্রজাপতির সৌজন্যে দুজনের জড়াজড়ি সেই দুই বীজের থেকে নতুন করে ফুল গাছ গজিয়ে ওঠে আবার।'

প্রজাপতির পাটিগণিতের থেকে ফুলেদের বীজগণিত পর্যন্ত শিক্ষাদানের চূড়ান্ত করে যারপরনাই পরিশ্রমে আমি হাঁপাই। ক্ষীণ কণ্ঠে শুধাই—'বুঝেছিস এবার?'

মুখখানা জ্যামিতির মতন বানিয়ে সে জানায়—'সব বুঝেচি মামা! ...কিন্তু তুমি সেই কথাটাই ত বলছ না, কোথথেকে যে আমবা এলাম!'

বুঝলাম, শিক্ষার সার কথা এত সোজায় ওকে বোঝানো যাবে না। সূক্ষ্ম-র থেকে স্থূলে যেতে হবে, ফুলের থেকে মুলে; সারাংশের আসলে পৌঁছুতে হবে, ষাঁড়াংশেই একেবারে। আমার ভাগনে যখন, বুদ্ধিশুদ্ধি আমার মতই হবে ত? সহজে কিছু ওর মগজে সেঁধুবে না। প্রজাপতির পাখনার ঢাকনায় মোড়া উপমা দিয়ে হবার নয়, ষট্‌পদের

থেকে চতুষ্পদে নামতে হয়। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার মত হুলুস্থুল দৃষ্টান্ত দিয়ে সেই পাশবিক ব্যাপারে গিয়ে পড়ি সরাসরি... '

'বলি, ষাঁড় দেখেছিস ত? রাস্তায় ষাঁড়ের দৌড় দেখিসনি? গোরুর পেছু পেছু তাড়া করে ষাঁড় দৌড়য় যে...?'

'দেখেছি মামা।' বলতে গিয়ে সে বেশ উৎসাহ পায়।

'কেন দৌড়য় বল দেখি?' ওর কাছে আমি জানতে চাই—'তোর কী মনে হয়?' হুলুস্থুল দৃষ্টান্তটা ওর চোখের সামনে এনে খাড়া করি।

'গুঁতোবার জন্যেই, আবার কী?' সে বলে—'ষাঁড়গুলো বেজায় পাজি মামা!'

'ষাঁড়গুলো যে পাজি তা কি আমি জানিনে—তুই আমায় বলবি! কিন্তু মোটেই গুঁতোবার জন্যে নয়...' ষাঁড়ালো তত্ত্বের ধারালো পথে আমার দ্রুত পদক্ষেপ, কিন্তু ষাঁড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ের গোড়াতেই আমার অগ্রগতিতে রাধা পড়ে।

'ধুত্তোর ষাঁড়!...' তাবত হুলুস্থুল সে এক লাফে পার হয়ে যায়—প্রকাণ্ড এক মাথা ঝাঁকিতে আমার ষাঁড়াশী আক্রমণ সে এড়ায়—'আমি বলছিলাম কি...আমাদের ক্লাসের বুবরি বলছিল যে তারা ফরিদপুর থেকে এসেছে...আমরা কোথথেকে এসেছি তা-ই আমি জানতে চাইছিলুম।'

কার্যকারণ

কাসিম যেন নিজেকে ফাঁসিয়ে দেবার জন্যে মরীয়া।

মহকুমার সেসন আদালতে বিচার চলছিল খুনের। হাকিমের কেমন যেন অনুকম্পা জাগছিল কাসিমের ওপর। চাষী বলেই কি না কে জানে!

অপরাধের কোনো সাক্ষী সাবুদ ছিল না। তবু সে নিজের থেকেই প্রায় কবুল করে বসে আছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো উকিলও দেয়নি সে। সরকারী খরচায় উকিল দেওয়া হয়েছিল একজন, কিন্তু তিনিও এ হেন মামলার কোনো কিনারা করে উঠতে পারছিলেন না। আসামীকে বাঁচাবার কোনো জুত পাচ্ছিলেন না যেন।

হাকিম নিজেই তখন আসামীর জবানবন্দী যাচাই করতে এগুলেন...

'সেখ কাসিম আলি, তোমার বিরুদ্ধে মামলাটা যে কী, তা তুমি জানো বোধহয়? তোমার শ্বশুর আরসাদ মিঞাকে টাঙির ঘায় তুমি খতম্ করেছো। খুন করবার মতলব নিয়েই তুমি টাঙি বসিয়েছিলে—তোমার এই অপরাধ তুমি কবুল করছো তো?'

'না হুজুর।' বিড়বিড় করলো কাসিম।

'তুমি তাহলে তাকে খুন করোনি বলছো?'

'করেছি।'

'তোমার দোষ স্বীকার করছো তাহলে?'

'না।'

'শোনো কাসিম, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তুমি এর আগেও তোমার শ্বশুরকে শেষ করতে চেয়েছিলে। তাকে বিষ খাইয়ে মারতে গেছলে, ইঁদুর-মারা বিষ, সত্যি কি না?'

'সত্যি।'

'তুমি যে অনেকদিন ধরেই তোমার শ্বশুরকে সরাবার মতলব আঁটছিলে, এই ঘটনাটা হচ্ছে তারই প্রমাণ। বুঝতে পাচ্ছ আমার কথা?'

'সেই জমিটার জন্যই ত হল' কাসিম উদ্‌ভ্রান্তের মতন মাথা নাড়ে—'না উনি জমিটা বেচতে যান না আমি...'

'জমির কথা এর মধ্যে আসছে কোথ্‌ থেকে?' বাধা দেন হাকিম।

'জমির কথাই ত আসছে হুজুর। আমি তাকে বললাম, বাবা, জমিটা যেমন আছে থাক, তুমি ওটা বেচে দিয়ো না, আমি কয়েকটা গোরু কিনব ভেবে রেখেছি...'

'দাঁড়াও,' আবার বাধা এল হাকিমের থেকে—'জমিটা কার? তোমার না, তোমার শ্বশুরের?'

'কেন, তার জমি।' জানালো আসামি। 'কিন্তু সে-জমিব তার কী দরকাব আর? বুড়ো মানুষ, সে কী করবে জমি নিযে? তাই আমি তাকে বললাম, জমিটা তুমি আমাকে দাও। তাতে সে বললে, আমি মরে গেলে সবই তো আমার আমিনা পাবে—আমিনা মানে আমার জরু—তখন তোমার যা খুশি তাই কোরো। নেমকহারাম পাজি কোথাকার! এই কথাই বল্ল সে।'

'তাই তুমি তাকে বিষ খাওয়াতে গেছলে?'

'হ্যাঁ সেইজন্যেই তো।'

'তোমাকে ওই গালমন্দ দিয়েছিল বলে?'

'না হুজুর সেজন্য নয়। ওই জমিটার জন্যই। জমিটা সে বেচে দিতে যাচ্ছিল কিনা। ওনার গালমন্দে আমি কিছু মনে করিনি।'

'কিন্তু বাপু জমিটা তো তার। তাই নয় কি? তাহলে কেন সে বেচবে না? বেচতে পারবে না কেন?'

'কেন, সেই জমির লাগাও আমার জমিতে আমি আলু বুনেছি যে। লাগাও জমিটা ঐ জন্যেই তো কিনলাম যাতে দুটুকরো জমি এক করে আলু ফলিয়ে ভালো ফসল ঘরে তুলতে পারি। আমার শ্বশুর আরসাদ মিঞাকে সব আমি খোলসা করে বললাম, তাতে তিনি কইলেন তোমার জমির আমি কী জানি! আমার জমিটা আমি আবদুলকে বেচে দেব।'

'তার পর থেকেই তোমাদের এই মনকষাকষি চলছিল?'

'হ্যাঁ। তারপর থেকেই।' বলতে গিয়ে কাসিম গুম্ হয়ে গেল—'এর ওপর ফের সেই ছাগলীটাও আছে আবার।'

'কোন ছাগলীটা?'

'আমার ছাগলীটার দুধ খেয়ে খেয়ে তিনি খতম্ করলেন। আমি বললাম, বাবা, ছাগলীটার

বাঁটে তুমি হাত দিয়ো না, আর যদি নেহাতই ছাগল দুধ না হলে তোমার না চলে তবে ছাগলীটার বদলে নদীর চরের জমিটা তুমি দাও আমায়। তা, তিনি জমিটার আধিয়ারি বেচে দিলেন আরেকজনকে...'

'আর তার টাকাটা নিয়ে কী করলেন?'

'জমিয়ে রাখলেন নিজের বাকসে। আর কী করবেন?' মুখ ভার করে বলল কাসিম।—'আর বললেন যে এ টাকা তো আমি সঙ্গে নিয়ে যাব না। মারা গেলে তোমরাই পাবে। কিন্তু তিনি মরবেন না কিছুতেই, সে বান্দাই নন। সত্তর বছর পার করেছেন, মরবার লক্ষণ নেই তবুও।'

'তাহলে তোমার বিবেচনায়, তোমাদের অবনিবনার মূল কারণ হচ্ছেন তোমার শ্বশুরমশাই?'

'হ্যাঁ হুজুর।' ঘাড় নেড়ে সায় দিল কাসিম।—'কিছুতেই তিনি এক কড়ার কিছু ছাড়বেন না। কেবল বলবেন যদ্দিন আমি বেঁচে আছি তদ্দিন আমার ইচ্ছেমত চলবে সব। অমি তখন বললাম বাবা, চর বিক্রির টাকাটা দিয়ে তুমি যদি একটা গোরু কেনো তাহলে আমি ঐ লাগাও জমিটা চাষ করি আর ঐ জমিটা তোমায় বেচতে হয় না। তাতে সে জবাব দিলে কি, আমি মরে গেলে পর তুমি দুটো গোরু কিনো বরং, কিন্তু এখন ঐ জমিটা আবদুলকে বেচতে যাচ্ছি।'

'শোনো কাসিম,' কড়া গলায় হাকিম বললেন, 'তুমি কি বাক্সর ঐ টাকাটার লোভেই তোমার শ্বশুরকে খুন করেছ? ঠিক করে বলো?'

'টাকার জন্যে নয়, ঐ টাকায় গোরু কিনব বলেই—'প্রকাশ করল কাসিম—'কারণ পরিষ্কার বোঝা গেল যে বেঁচে থাকতে তিনি কিছুই আর আমাদের দেবেন না। তিনি না গেলে আর আমাদের গোরু কেনা হবে না। আর গোরু ছাড়া কি চাষ-বাস চলে হুজুর? জমি-জমার কোনো মানে হয়? গোবর না হলে জমির সার পাবো কোথা থেকে বলুন?'

'কিন্তু গোরু নিয়ে তো এখানে কোনো কথা নয় আমাদের'—সরকারী কৌসুলী কথা পাড়লেন এবার—'মানুষের জীবনের প্রশ্ন এখানে। তোমার শ্বশুরকে তুমি খুন করতে গেলে কেন?'

'ওঁর জমি আমাদের লাগাও ছিল বলে।'

'ওটা কোনো জবাবই হল না।'

'উনি জমিটা বেচতে যাচ্ছিলেন—'

'কিন্তু তাহলেও, জমি বেচার টাকাটা তুমিই পেতে—তোমরাই পেতে—উনি মারা যাবার পরই না হয়।'

'কিন্তু তিনি তো মরবেন না কিছুতেই।' ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কাসিম জানাল, 'দেখুন হুজুর, কোনো হুজ্জত না করে, যদি তিনি চুপচাপ চোখ বুঝতেন আমিও ওঁর কোনো ক্ষেতি করতাম না। আমি তাঁকে ঠিক আমার নিজের বাবার মতই চিরকাল দেখেছি, সেইরকম

সম্মান করেছি, আপনি সবাইকে শুধান হুজুর, সারা গাঁ আমার কথায় সাক্ষী দেবে। বলো তোমরা ভাই সব, আমি তাই করিনি কি বলো?'

আদালত ঘরে গাঁয়ের আদ্ধেক লোক মজুদ ছিল, তারা সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ করে একবাক্যে কাসিমের কথায় সায় দিল।

'বুঝেচি। আর সেই জন্যেই তুমি তাকে বিষ খাইয়ে মারতে গেছলে?' বললেন হাকিম।

'বিষ!' কাসিম গুমরে উঠল হাকিমের কথায়—'সেই লাগাও জমিটা বেচতে যাওয়া কি তাঁর উচিত হয়েছিল? আপনি গাঁয়ের লোকেদের সব শুধান হুজুর। তারা সবাই এক বাক্যে বলবে, লাগাও জমিটা বেচা কখনো ওনার উচিত হয়নি। এক লপ্তের জমি কেউ কখনো বাইরের কাউকে বেচতে যায়? তাহলে তো আর চাষ-বাস হয় না।'

কাসিমের সমর্থনে আদালত কক্ষ গুঞ্জন করে উঠল।

'কাসিম, এদিকে তাকাও।' চেঁচিয়ে উঠলেন হাকিম—'তুমি যদি ফের তোমার গাঁয়ের বন্ধুদের দিকে তাকিয়েছ, কি তাদের উদ্দেশ করে কোন কথা বলেছে৷ তাহলে ওদের সবাইকে আমি আদালতের বার করে দেব, বুঝলে?'

'হ্যাঁ হুজুর।'

'তাহলে ঠিক ঠিক বলো দেখি খুনের দিন কী কী ঘটেছিল? কেমন করে ঘটল ঘটনাটা।'

'শুনুন তাহলে হুজুর! সেদিনটা ছিল রবিবার। আমাদের গাঁয়ের হাটবার সেদিন। সেদিন সকালে আবার আমি আবদুলের সাথে আমার শ্বশুরকে কথা কইতে দেখলাম। দেখে আমি বললাম, বাবা, এটা তোমার ভালো কাজ হচ্ছে না। তুমি যদি জমিটা ওকে বেচে দাও তাহলে কোনদিনই ওটা আমি আমার দখলে পাব না জেনো। তাতে উনি বললেন, এ নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই না। আমার সম্পত্তি—তা নিয়ে আমার যা খুশি তাই কবব। এই কথার পর আমি কুড়ুল নিয়ে কাঠ কাটতে বেরিয়ে গেলাম।'

'এই কুড়ুলটা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এই কুড়ুলটাই।'

'তারপর কী হল বলে যাও।'

'তারপর বিকালে ফিরে এসে আমিনাকে আমি বললাম, ছেলেমেয়েদের নিয়ে তোমার দিদি সেলিনার বাড়ি গিয়ে আজ রাতটা কাটাও গে! শুনেই না সে কাঁদতে শুরু করে দিল তক্ষুনি। আমি বললাম, কেঁদ না মিনা, আমি তোমার বাবাকে আগে বুঝিয়ে বলব, ভালো করে বোঝাব আগে, তাতে যদি তিনি বোঝেন তো ভালোই। আর না যদি বোঝেন তখন যা হয় করা যাবে বুঝে-সুঝে। এখনই কাঁদছ কেন? তারপর আমার বৌ তার বোনের বাড়ি চলে গেলে পর কুড়ুলটা রাখতে আমি দাওয়ায় উঠেছি, আমার শ্বশুরমশাই এসে বললেন, আমার কুড়ুলটা ধরেছ কেন? ওটা আমার কুড়ুল। জানো না? আমার হেফাজতে ওটা থাকবে। দাও আমার এক্ষুনি। আমি বললাম, আর তুমি যে দুধ খেয়ে খেয়ে শুষে ফাঁক করে দিলে আমার ছাগলীটাকে—তার কী? তাতে কুড়ুলখানা সে

আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে এল। তখন আমি ওর মাথায় বসিয়ে দিলাম ওটার এক চোট।'

'কুড়ুল দিয়ে খুন করে বসলে তোমার শ্বশুরকে? কিন্তু কেন?'

'ওই জমিটার জন্যেই হুজুর।'

'কিন্তু এক চোটে তো নয়—তিন বার কোপ বসিয়েছ তুমি—এক চোটে হয়ত সে মরত না। অত চোট বসাতে গেলে কেন?'

'আজ্ঞে আমরা খেত মজুররা পাকা কাজ করতে মজবুত, জানেন ত হুজুর!'

'তারপর আমি আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম।'

'ঘুমোলে তারপর?'

'না হুজুর। মনে মনে হিসেব করলুম শুয়ে শুয়ে—গোরুটা কিনতে আমার কত লাগবে, তারপর আলের এধারের জমি ত হল; এর ওপর ওধারের জমিটাও যদি আমি কিনে নিই তাহলে সব জমিটা জড়িয়ে এক করে বেশ বড় একটা খামার হবে আমার।'

' তোমার শ্বশুরকে খুন করার জন্য মনের ভেতর একটুখানি খুঁত খুঁত করল না তোমার, মনটা খচ্ খচ্ করল না একটুও?'

'না। আমি ভাবছিলাম, লাগালাগি হয়েও জমিগুলো এক জোট ছিল না, এইবার এক লপ্তে আসবে সব। সেই কথাটাই ভাবছিলাম কেবল। এইবার সব এক জোট করা যাবে। তারপর গোরু তো কিনবই, এদিকে গোরুর গোয়ালটা সারাতেও লাগবে এক কাঁড়ি টাকা। যাক্, টাকার কোনো ভাবনা রইল না আর...'

'এইসব ভাবছিলে?'

'হ্যাঁ হুজুর। বলব কি হুজুর, আমার শ্বশুর মশাই, অত টাকা থাকতেও একটা গোরুর গাড়ি করেননি। আমি কতোবার তাঁকে বলেছি, খোদা তোমার ভালো করুন, কিন্তু এভাবে ক্ষেত গেরস্তি করা পোষায় না। তোমার জমিটা আর আমার জমিটা, একেবারে লাগাও, ওরা এক লপ্তে হবার জন্যেই জন্মেছে, অথচ তুমি তাদের ফারাক করে রেখেছ—কিছুতেই এক হতে দিচ্ছ না। জমিদুটোকে জবাই করছ তুমি। কী আপ্সোস!'

'কিন্তু তুমি যে তোমার শ্বশুরকে জবাই করলে তার জন্যে তোমার মনে কোনো আপসোস হয়নি।'

'উনি আবদুলকে ওনার জমিটা বেচতে গেলেন কেন...' বিড় বিড় করে বলল কাসিম।

'তাই সেই জমিটা হাতাবার মতলবে তুমি ওঁকে খুন করে বসলে?'

'না। কক্ষনো না' প্রতিবাদ করল কাসিম—'জমিটা আমার জমির লাগাও ছিল যে! মাঝখানের আলটা ভেঙে দিলেই দুটো জমি এক হয়ে একটা জমি হয়ে যায়। আর তাই হওয়া উচিত বলেই...'

'তোমার দোষ তুমি কবুল করছ তাহলে?'

'এতে কী দোষটা হয়েছে হুজুর?'

'খুন করেছ যে—তা তুমি কবুল করছ?'

'না হুজুর।'

'একটা বুড়ো মানুষকে খুন করাটা তোমার কাছে বুঝি কিছুই নয়?'

'আমি বরাবর ওনাকে বলেছি যে জমি দুটো আমাদের লাগাও—একজোট হবার জন্যই হয়েছে...।' কাসিম কাঁদতে লাগল—'তা উনি কিছুতেই আমার কথায় কান দিলেন না! জমি দুটো লাগালাগি না হলে আমি ওনার সঙ্গে লাগতে যেতাম না। একে খুন বলে না হুজুর, কিছুতেই না। কেউ এর ভেতর কোনো দোষ পাবে না। আমাদের নিজেদের ঘরের ব্যাপার। অপর কেউ হলে আমি তার গায় হাত তুলতে যেতাম না। আমাদের আপনা-আপনির ভেতর। আমাদের নিজেদের জমি। সেই জমি তিনি অপরকে বেচে দিতে যাচ্ছেন...! আমি জীবনে কারো এক পয়সা মারিনি। কাউকে কখনো ঠকাইনি, কারো কোনো জিনিস চুরি করিনি কখনো। আপনি গাঁ শুদ্ধু লোককে জিজ্ঞাসা করুন, এখানে হাজির আছে সবাই, জিজ্ঞাসা করুন কাসিম কেমন লোক। কখনো কারো কোনো ক্ষেতি করিনি, গাঁ শুদ্ধু সবাই জানে, অথচ গাঁয়ের চৌকিদার চোরের মতন আমার কোমরে দড়ি বেধেঁ টেনে নিয়ে গেছে থানায়...।' দুঃখে ক্ষোভের হাপুস কান্না কাঁদতে লাগল কাসিম।

'না, তুমি চোর নও।' বললেন হাকিম—'কিন্তু তোমার শ্বশুরকে তুমি খুন করেছ। খুন করলে তার সাজা ফাঁসি, তা তুমি জানো বোধহয়?'

'আমার কোনো কসুর নেই হুজুর! আমি কোনো দোষ করিনি। আমাদের জমি দুটো লাগালাগি ছিল...' কাঁদতে লাগল কাসিম অবুঝের মতই।

বিচারপর্ব তার আপন ধারায় এগিয়ে চলল তারপর। সরকারী কৌঁসুলী তাঁর সওয়াল শেষ করলেন। আসামীর উকিলও, মামলায় তেমনটা জুত করতে না পেলেও, কোনোরকমে নিজের দায় সারলেন। হাকিম তারপর মামলাটা বোঝাতে বসলেন জুরিদের ঃ

'এ এক অদ্ভুত মামলা। আপাত-দৃষ্টিতে সরল মনে হলেও আসলে তেমন সহজ নয়। আমাদের বিচারবোধের দৃষ্টি দিয়ে এর বিচার করতে গেলে ঠিক ন্যায় বিচার হবে কি না আমি জানি না। এখানে দুটি মূল্যবোধের সংঘর্ষ—মূলতঃ দুটি মনোভঙ্গির বিরোধ দেখা যায়। কাসিম চাষী যে কোনো অপরাধ করেছে সে বিষয়ে আদৌ সচেতন নয়, জমিটা তার জমির লাগাও থাকার জন্য, জমির স্বার্থেই সে এই কাজ করেছে—সঠিক কাজ করেছে বলেই তার ধারণা। আমি নিজে চাষীর ঘরের ছেলে, আমার বাপ ঠাকুর্দা লাঙ্গল ঠেলতেন, চাষীর জমির ওপর যে কী দরদ, জমির ক্ষুধা যে তাদের কী রকম তা আমি অনুভব করতে পারি—আমার সাত পুরুষের রক্ত আমার ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে। জমির টুকরোটা কাসিমের কাছে মৃত এক টুকরো জমি মাত্র নয়, জীবন্ত জিনিস। মানুষের মতন জলজ্যান্ত কাউকে আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করার যে অধিকার, এমন কি, আততায়ীকে খুন জখম করেও আক্রান্তকে বাঁচাবার যে অধিকার আইন সবাইকে দিয়েছে, সেই অধিকারেই, মনে হয়, কাসিম জমির টুকরোটাকে আততায়ী তার শ্বশুরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য খুন করে বসেছে। আইনের এত সব ঘোরালো প্যাঁচ তার মনে কোনো কাজ না করলেও সে যে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই এটা করেছে, আর তা করে যে কোনো কসুর করেনি এই তার ধারণা।

'অবশ্যই আমাদের আইনের আদর্শ তার এই ধারণায় সায় দেবে না, সে কথা ঠিক। আসলে এইখানেই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য, দুরকমের মূল্যবোধের পার্থক্য। দুটি নীতির সংঘর্ষ। আমাদের বিচারে কাসিম অবশ্যই খুনী, এজন্য চরম দণ্ডই প্রাপ্য ওর। কিন্তু বিবেচনা করে দেখলে কাসিম যুবা, তার ভবিষ্যৎ আছে—তার স্ত্রী পুত্রেরও ভবিষ্যৎ আছে। আর জমি টুকরো দুটোরও ভবিষ্যৎ রয়েছে—সেই ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে কাসিম এই কাণ্ডটা করে বসেছে। কিন্তু আমাদের চোখে কাসিম অপরাধী, তবে আল্লার চোখে কী তা আমি বলতে পারব না। আল্লা মানুষের কাজ দ্যাখেন না, তার মন দ্যাখেন। তাঁর বিচারে কাসিমের কী সাজা পাওয়া উচিত, আদৌ কোনো সাজা পাওয়া উচিত কিনা তা তিনিই জানেন—তা আমার ধারণার বাইরে। সে বিষয়ে কিছু আমি বলতে পারব না। তবে আমার মনে হয়, এই কাণ্ডের জন্য কাসিম যতটা দায়ী তার চেয়ে বেশি দায়ী জমির ওই টুকরো দুটো। ওরা লাগাও না হলে কাসিম এই কাজ করত না মনে হয়। সাজা দিতে হলে ওই জমি দুটোকেই দিতে হয়—কাসিমের বদলে ওই জমি দুটোরই ফাঁসি হওয়া উচিত।...কিন্তু আমি এসব কী বলছি, আমার ধমনীতে চাষীর রক্তই এইসব বলাচ্ছে বোধ হয়, কিন্তু মাননীয় জুরিগণ, আপনারা আমার এ-কথায় কান দেবেন না। আইনমত এবং আপনাদের ন্যায় বিচারমতে যা সমুচিত মনে হয় সেইরকম সিদ্ধান্তই নেবেন আপনারা...এইটাই আমি আশা করি।'

জুরিরা পারস্পরিক পরামর্শের জন্য নিজেদের চেম্বারে গেলেন। হাকিম সাহেবও নিজের বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে ধড়াচূড়া ছেড়ে হাঁফ ছাড়লেন খানিকক্ষণের জন্য। আরাম সোফায় গা এলিয়ে আশা করতে লাগলেন, জুরির বিচারে বেচারী কাসিম যদি বেকসুর খালাস পায়...

সুন্দর মুখের Joy!

সর্বত্র। বঙ্কিমবাবু বলে গেছেন কথাটা। অবশ্যই অন্য বানানে, তাহলেও কথাটাকে রোমান হরফেও বানানো যায়, তাতে অর্থের কোনো ব্যত্যয় হয় না। একই রকমের রোমান্টিক।

যে বানানেই বানাই আর যেভাবেই আওড়াই শেষ পর্যন্ত সেই একই কথা। মানের কোনো হানি হয় না। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।

আর কীটস বলেছেন, এ থিং অব বিউটি ইজ জয় ফর এভার। কীটাণুকীট আমার মুখে শোভা না পেলেও আমারও ঠিক সেই কথাই।

বঙ্কিমদৃষ্টিতেই দেখি, বা আপনার আমার মত সাদাসিধে তাকাই, সুন্দরের সেই একই মহিমা দেখতে পাই।

গোলাপ যে নামে ডাকো গন্ধ বিতরে। আর সুন্দরও প্রায় সেইরকম। সূর্য যেমন সর্বত্র সমান আলো ছড়ায়, সুন্দরেরও তেমনি সর্বজীবে সমদৃষ্টি। সবাইকে নিজের মাধুরি দিয়ে জড়ায়। সবসময় সবাইকেই তার সমান আনন্দ বিতরণ।

সুন্দর আর গোলাপ সমগোত্র।

কিন্তু সুন্দরকে নিয়ে স্বস্তি নেই কারো কোথাও।

বিয়ের পর জয়ন্তীর সঙ্গে জড়িত হয়ে তড়িৎ সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল। বৌকে নিয়েই তার যত জ্বালা।

পরস্ত্রী মায়ের মতই—মাতৃবৎ পরদারেষু—

সেকালীন নৈতিক ব্যাকরণে এমন কথাই বলত বটে, কিন্তু একালের মুগ্ধবোধের সূত্র আলাদা। সে যুগের মুদ্গরে এখনকার মোহ দূর হবার নয়।

পরদারকে কেউ মা র মত ভাবে না আজকাল। কিন্তু তাই বলে বৌকে কিছু পর্দার আড়ালেও রাখা যায় না একালে।

পরস্ত্রী যদি পরমা হয় তাহলে মার মত সে বুঝি কখনই নয়, পরও নয় বোধ হয়। পরী কি কখনও পর হতে পারে

আর তড়িতের বৌ ছিল পরমা সুন্দরী। বসোরাই গোলাপের উপমাতেই তাকে বুঝি যথার্থ বোঝায়।

বৌয়ের প্রথম চিঠি পেয়ে সে একটুখানি স্বস্তি পেয়েছিল হয়ত।

বৌ লিখেছিল...না, তাকে নয়, কেননা বিয়ের পর তাদের ছাড়াছাড়িই বা হল কখন! বাপের বাড়ি যায়নি তো তার বৌ, তাই বৌয়ের চিঠি পাবার সুযোগই হয়নি তার।

বৌ তার বান্ধবীকে লেখা চিঠিখানা ডাকে ফেলতে দিয়েছিল তাকে। কৌতূহলের বশে খামখানা খুলে সুকৌশলে সে পড়ে নিয়েছিল চিঠিটা...বৌ লিখেছিল, ভাই রেখা...

অনেক কথাই লেখা ছিল তাতে, বিয়ের সানাই থেকে শুরু করে অনেক ধানাই পানাই, তার ভেতরে একটা কথাই একশ কথার এক কথা, সেই কথাটাই মনে বাঁশী বাজাচ্ছিল তার...

'ভাই রেখা, তুই আমার বরের বিষয়ে জানতে চেয়েছিস। একটা কথা তোকে আমি বলতে পারি, যে-ছেলেটিকে আমি বিয়ে করেছি সে হচ্ছে একশর মধ্যে একটা...'

তারপর সে ফুর্তির হাওয়ায় কদিন যেন উড়ল।

তারপর ফের তার বৌয়ের চিঠি পেতেই না, তার সেই রঙীন আকাশ থেকে ফুটো ফানুসের মতই আবার সে আছাড় খেয়ে পড়েছে কঠিন মাটিতেই।

তার বৌয়ের চিঠির জবাব দিয়েছিল তার বান্ধবী। এবারেও সে সুকৌশলে খাম খুলে চিঠিখানা বার করে পড়ে নিয়েছে।

রেখা লিখেছিল, তোর বর যে একশর মধ্যে একজন তা আমার অজানা না—তা না হয় বুঝলুম, কিন্তু বাকী নিরানব্বই জনার খবর কিরে?....

চিঠি পড়েই হয়ে গেছল তড়িতের। তারপর থেকেই তার সুখশান্তি সব গেছে। সন্দেহদোলায় দিনরাত দোদুল্যমান হয়ে রয়েছে সেই থেকেই।

আনাচে-কানাচে কাদের ছায়া যেন তার নজরে পড়ে। আশে পাশে কারা যেন ওৎ পেতে থাকে সব সময়। এধারে ওধারে ঘুরফির করছে কারা গো?... কারা আর? বর হতে যারা পারেনি—সেই বর্বররাই—আবার কে? তাছাড়া কে আবার?

সেই বর্বরতাই আড়াল থেকে নজর রেখেছে তার বৌয়ের ওপর। নজরানা দেবার ফিকিরে রয়েছে।

নিরানব্বইয়ের ধাক্কা সামলাতেই সে কাহিল হয়ে পড়ল।

সেদিন রাত্তিরে খুট করে শব্দ হতেই লাফিয়ে উঠেছে তড়িৎ। ধড়মড় করে উঠে বসেছে বিছানায়।

'ওগো দ্যাখো দ্যাখো, জানালার বাইরে কার যেন মুখের ছায়া দেখলাম মনে হলো।'

তড়িৎস্পৃষ্ট হয়ে ওর বৌও উঠে বসেছে—

'কী হয়েছে? কী?'

'চাঁদের ফিকে আলোয় কাকে যেন দেখলাম। জানালার ফাঁকে ভূতের মতই....' ফিসফিস করল সে।

'তাই নাকি? আমাদের জানা শোনা কেউ নয়তো—?'

'কী করে বলব? ভূতদের সঙ্গে তো আমার আলাপ পরিচয় হয়নি এখনো। তোমার বাপের বাড়ির এলাকার কেউ যদি হয় ত বলতে পারিনে।'

'শান্তিপুরের ভূতেরা মরতে আসবে এত দূরে? তোমার শান্তিভঙ্গ করতে এখানে?' ফোঁস করে উঠেছে ওর বৌ। কী যে পাগলের মতন তুমি বলো।'

'বাধা কী আসবার? এখন তো রেলগাড়ি হয়েছে—ভূতেরা স্বচ্ছন্দে এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়াতে পারে একালে। সেকালের মত পাড়ার গাছের ডালে চুপ করে বসে থাকতে হয় না। তাছাড়া তাদের তো টিকিট কাটতে হয় না গো! সে বালাই নেইকো।'

না, গাছের মগডালে আর তাদের বসে থাকতে হয় না বটে। তাদের মগের মুল্লুক—পরের মাগের এলাকায়—সর্বত্রই এখন!

'তোমার যেমন কথা!' বলে পাশ ফিরে শুয়েছে জয়ন্তী।

অবশ্যি, এই ভৌতিক লীলাখেলার রহস্য একেবারে তার অজানা ছিল না। সেও তো ভূতপূর্বদের একজন। উপোসী ছিল বলেই কিনা কে জানে, রূপসী কাউকে দেখলে সে নিজেও তো ছোঁক-ছোঁক করেছে এতদিন।

ক'মাস আগেকার কথাটাই মনে পড়ল তার। এই ত সেদিন।

আপিসের পক্ষ থেকে বিরাট একটা পার্টি দেওয়া হয়েছিল কলকাতার নামজাদা এক হোটেলে, সপরিবার সবাইকার আমন্ত্রণ ছিল সেখানে।

তড়িতের বিয়ে হয়নি তখনো, একলাই গিয়েছিল সে। প্রতিষ্ঠানের বড়কর্তা, মেজকর্তা, ছোটকর্তা থেকে শুরু করে কেরানীদের লঘু গুরু সকলেই সস্ত্রীক সকন্যা এসেছিলেন।

আপিসের তরুণ ক্যাশিয়ার তড়িৎ বেশ সেজেগুজেই গিয়েছিল সেই পার্টিতে।

টেবিলে টেবিলে খানা সাজানো ছিল। এক সুশ্রী তরুণীকে এক টেবিলে একলাটি বসে থাকতে দেখে সে গিয়ে তার পাশের চেয়ারটি দখল নিয়েছে।

'আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি', বলে সে ভাব জমাতে লেগেছে।

'কোথায় দেখবেন আর!' বলল মেয়েটি : 'ম্যানেজারের ঘরেই দেখে থাকবেন হয়ত।'

'ম্যানেজারের কথা আর বলবেন না। ভাগ্যিস লোকটা এখানে নেই এখন। এক নম্বরের ইডিয়েট যাকে বলে।'

'আপনি জানেন আমি কে?' চড়া গলায় জানতে চেয়েছিল মেয়েটি।

'আজ্ঞে না।'

'আমি ম্যানেজারের মেয়ে।'

'তাই নাকি? তা—তা—তা—আপনি জানেন আমি কে?' আমতা আমতা করে বলেছিল তড়িৎ।

'না তো।'

'জানেন না তাই রক্ষে!' বলে আর সেখানে না বসে সে উঠে পড়ল তক্ষুনি। হোটেলের ত্রিসীমানা থেকে কেটে পড়ল তড়িৎ গতিতে।

চন্দ্রগ্রহণের আগেই রাহু অস্তমিত। বাহুবিস্তারের আগেই তার তিরোধান।

কিন্তু রাহুর বরাতেও যে রাহু থাকে আবার, গ্রহ থাকে গ্রহের ওপরেও, সাত পাকের গেরো পরেও ... গেরোটা থেকেই যায়, সেটা সে টের পাচ্ছিল বেশ—বিয়ের পরে এখন।

সেদিন রাতে ভূত দেখার পর চোখের ঘুম তো তার ঘুচেছিলই, আহারের রুচিও যেন চলে গেল ক্রমে ক্রমে।

'কী ছাই রেঁধেছো?' খেতে বসে একদিন বলল সেঃ 'রাঁধতে বসে কোথায় মন পড়েছিল তোমার?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'এ কি মাংস রান্না হয়েছে? ইঁদুর ভাজার মতই লাগছে যেন আমার।'

'ইঁদুর ভাজা?' গালে হাত দিল জয়ন্তী।

'কিংবা বেড়ালসেদ্ধই হলো, একই কথা। কিন্তু এই কি রান্না?'

'ছি। বেড়ালসেদ্ধ, ইঁদুরভাজা—এসব কী বলছো তুমি গো?'

'কুকুর কোপ্তা, আর্শোলার চাট্নি এসব কি খাওয়া যায় নাকি! খেতে পারে মানুষ?'

'মা! বিয়ের আগে কত অখাদ্য কুখাদ্যই না তুমি গিলেছো' ভেবে ওর বৌ কূলকিনারা পায় না—'চীনে রেঁস্তোরাটেস্তরায় খেতে বুঝি তখন?'

ভয় চিন্তায় দিনকে দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিল সে। কী চেহারা দিনকের দিন! নেপথ্যে বীরোচিত সেই নিরনব্বইয়ের অলক্ষ্য শরে মুহুর্মুহু ঘায়েল হতে লাগল বুঝি!

বন্ধু শুধায়, 'দিন দিন এমন শুকিয়ে যাচ্ছ কেন হে?'

'শুকিয়ে যাচ্ছি? কই না তো!' শুনে সে অবাক।

'খাওয়া দাওয়া হচ্ছে না বুঝি জুতমতন?'

'খুব খাচ্ছি।'

'নতুন বৌ তেমন রাঁধতে পারে না বোধহয়?'

'রাঁধে।'

'তাহলে নিশ্চয় কোনো মনোবিকারে তুমি ভুগছ। নতুন বিয়ের পর এমন ত হবার নয় ভাই!'

'মন? মন আবার কী হে? মন বলে কিছু আছে নাকি কারো? আমি তো ভাই মনের কোনো পাত্তাই পাইনে! না নিজের না পরের, না কারো।'

'পরের না পাও, পরীর মনের পাত্তা পেয়েছ তো! তাহলেই হোলো, কিন্তু তাহলেও...না, শক্তরকম কিছু একটা হয়েছে তোমার নিশ্চয়, হয় শরীরে নয় মনে। না হয়ে যায় না।'

'তোমরা খাজে ভেবে মরছো। কিচ্ছু হয়নি আমার।'

'না, ঠাট্টা নয়। চলো তোমাকে ডাক্তার দেখিয়ে আনি।' বন্ধুরা ওকে ধবে বসল।

'ডাক্তার দেখাবো? কেন, কী হয়েছে আমার?'

'তা আমরা কী জানি! সে তো ডাক্তারেই বলবে।'

সবাই মিলে ধরে বেঁধে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল।

ডাক্তার তাকে দেখে বললেন: 'আগে আপনার মুখে রোগের বৃত্তান্তটা জেনে নি। সারাদিনে আপনি কী কী করেন বলে যান তো!'

'সারাদিনে?' সে জানায়: 'সকাল আটটায় উঠি, চা খাই, চান করি, কাপড় জা পরি, ভাত খাই, বমি করি, আপিস যাই....'

'য়্যাঁ, কী বললেন! কী করেন?' শুধালেন ডাক্তার: 'বলুন তো আবার?'

'সকাল আটটায় উঠি, চা খাই...' বলে যায় সে পরম্পরায়।— 'চান করি, বড় জামা পরি, ভাত খাই, বমি করি, আপিস যাই।'

'রোজই ভাত খাবার পর আপনি বমি করেন বলতে চাচ্ছেন?'

'নিশ্চয়।' অবাক হয়ে যায় তড়িৎ, 'কেন, বিয়ের পরে সবাই তো তাই করে। র না কি?'

'বিয়ের পরে বমি করে সবাই? কে বলেছে আপনাকে?'

'বিয়ের পর গা বমি বমি করে না ছেলেমেয়েদের? কেন করে কে জানে, তু বিয়ের পরেই তো করে থাকে বলে শুনেছিলাম।'

'সে মেয়েদের করে বটে। কারো কারো করে থাকে— বিবমিষার মতন হয়—ট ছেলেপুলে এলেই। কিন্তু ছেলেদের গা বমি বমি করতে যাবে কেন?'

'কী জানি মশাই! আমার তো সব সময়ই তাই করে। আমার কি পেটে ছেলে হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? তা কি হতে পারে কখনো?' বলে সে অনুা জানায়: 'তবে ছোটবেলায় আমার পেটে পিলে হয়েছিল বটে।'

'অম্বলে ধরেছে আপনাকে। ঠিক মতন হজম হচ্ছে না আপনার। বদহজমে ভুগ আপনি।' ডাক্তার বাতলান।

অম্বলে ধরেছে যে তার ভুল নেই। জীবনের প্রতি মুহূর্তই যেন তার অম্লাক্ত উঠেছে কেমন। আসলে বিয়েটাই তার হজম হয়নি যেন—হজম করতে পারছে না কিছু

ডাক্তার তাকে একটা হজমি ওষুধের ব্যবস্থা করে দিয়ে চেঞ্জে যাবার পরামর্শ দিলেন। বি..লে বা পশ্চিমের কোথাও যেতে বললেন তাকে।

স্বাস্থ্যের খাতিরে না হলেও শান্তিলাভের আশায় বৌকে নিয়ে পাড়ি দিল সে বিন্ধ্যাচল। এখানে বাসায় মন বসছিল না তার। বাড়ি ছেড়ে পালাতে পারলে সে বাঁচে। শান্তিপুরের কাছাকাছি—এই পুরো অশান্তি ত্রিসীমা থেকে, যতো ভৌতিক নাগালের বিলকুল বাইরে, তিনশো মাইলের চক্কর পেরিয়ে কোথাও গিয়ে একটুখানি স্বস্তি মেলে যদি বা।

কিন্তু বিন্ধ্যাচলের বাঙালী হোটেলে পা দিয়েই তার টনক নড়ল। না, সুন্দর মেয়েকে নিয়ে কোথাও শান্তি নেই যেন। সুন্দর মেয়েকে নিয়ে বিপদ পদে পদে। বিপাক পথে বিপথে।

তার স্ত্রীর পদক্ষেপের সাথে সাথেই ঘুমন্ত হোটেল যেন সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠল এক লহমায়। সজাগ হয়ে উঠল সবাই আচমকা।

শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে প্রস্তরীভূত অহল্যাই যদি সজীব হয়ে থাকে তো তার পরে সেই পাষাণীর পদক্ষেপে গোটা দণ্ডকারণ্যেই হল্লা পড়ে গেছল নির্ঘাত।

জয়ন্তীকে দেখে সারা হোটেলটাই যেন উসখুশ করতে লাগল। অনেকে ভাব জমাতে এসেছিল তাদের সাথে। গায়ে পড়ে আলাপ করতে এসেছিল। বেশির ভাগই তারা চেঞ্জার, বাংলাদেশের আমদানি। তড়িৎ কিন্তু একটুও না উৎসাহ দিয়ে এড়িয়ে গেছে তাদের। স্বস্তিতে থাকতে চায়, শান্তির পিয়াসী।

দুটি যুবকের কিন্তু শান্তি ছিল না। তারা চনমন করছিল তখন থেকেই। ছুটি নিয়ে তারা বেড়াতে এসেছিল বিন্ধ্যাচলে।

রাত্তিরে পাশের ঘরে শুয়ে ঘুম হচ্ছিল না তাদের।

'বৌটা যেন ডানাকাটা পরী রে! মাইরি!' বলছিল একজনা।

'দেখছিস না! ছেলেটা ঘেঁষ দিতে চাইছে না কাউকে। সবে বিয়ে করে বৌ নিয়ে টাট্‌কা হনিমুনে বেরিয়েছে মনে হয়।'

'কী বলাবলি করছে ওরা—এত রাত অব্দি জেগে জেগে এত কথা কইছে কী—শুনি গে চ। ওদের দরজায় আড়ি পাতা যাক।'

'নতুন বিয়ে হলে আবোল তাবোল যা বকে সেইসব। নতুন কী আছে আবার? কান পাতার মতন কিছু নেই। কী শুনবি?'

'চ না। তবুও....।' বন্ধু জানায়ঃ 'ভাব পাতাবার আগে আড়ি পাততে হয় জানিস নে?'

'আসছে বছর আমাদের বিয়ের তিথিতে আমরা জয়ন্তী উৎসব করব।' বলছিল তড়িৎঃ জয়ন্তীকে নিয়ে আমার জয়জয়ন্তী হবে।'

'এক বছরে জয়ন্তী হয় নাকি?' জবাব দিয়েছে বৌ— 'এমন কি বৌয়ের নাম জয়ন্তী হলেও তা হয় না। জয়ন্তী হতে হলে অন্তত পঁচিশ বছর লাগে—তা জানো?'

'পঁচিশ বছর! পঁচিশ বছর বাদে সে তো সিলভার জুবিলি? তখন কি তমি এরকমটি

থাকবে আর?' তড়িতের কথার সঙ্গে যেন দীর্ঘশ্বাস জড়িত। রৌপ্য জয়ন্তীর বছরে ত বৌয়ের এমন রূপটি থাকবে কি আর!

'কেন, বদলে যাব নাকি তখন?'

'যাবে না? পঁচিশ বছর বাদ এমন সোনার প্রতিমাটি থাকবে নাকি তোমার?

জয়ন্তী কোন জবাব দেয় না, সেই বিষয়েই চিন্তা করে বোধ হয়।

'ভাবছিলাম তোমার এই সোনার প্রতিমা গড়ে রাখব—রামচন্দ্র যেমন গড়িয়েছিলেন সীতার.....'

'লঙ্কায় সোনা সস্তা ছিল তখন। মিলত অঢেল। সোনার লঙ্কা বলত না? রামচন্দ্র লঙ্কা জয় করে সেখান থেকে তাল তাল সোনা নিয়ে এসেছিলেন। পৃথিবীতে এখন আর কোথাও সোনা সস্তা নেই, জানো?' বলে সে অন্য কথা পাড়ে—'তার বদলে তুমি আমায় সোনার একটা চিক গড়িয়ে দাও না?'

'সোনা না পাই, কেশনগর থেকে দুজন মূর্তিশিল্পী আনিয়ে তোমার এই সোনার মূর্তি বাঁধিয়ে রাখব না হয়'....বলতে বলতে সে সচকিত হয়ে ওঠে।—'দোর গোড়ায় কিসের যেন আওয়াজ পাওয়া গেল না? কিসের যেন খসখসানি শুনলাম!'

উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দ্যাখে দুই মূর্তিমান দাঁড়িয়ে।

'কে? কে তোমরা এখানে? এত রাত্তিরে এখন?' সে শুধায়।

'আজ্ঞে, কেশনগবেব দুজন মূর্তিশিল্পী।' জবাব মিলল মুখের ওপর। —'এখান দিয়েই যাচ্ছিলাম!'

পর্বতপ্রমাণ প্রেম

পর্বতই যদি প্রেমের প্রমাণ হয় তাহলে ভালোবাসার সেই পরাকাষ্ঠাকেই বুঝি পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়...পাহাড়েব সঙ্গে পায়ের হাড় দিয়ে পাল্লা যার।

মেয়েদের কাছে হাব আছেই, জানা কথা। মেয়েরা হারাবেই। কিন্তু তারা যে আবাব পাহাড়াবেও তা কে জানত!

মনের মতো মেয়ে পাওয়াই এক দুর্ঘট, তারপর যদিই বা মিললো, সেই মেয়েব ফের যদি মেয়ের মত মন না হয় তাহলে সে আবাব আর এক জ্বালা।

যখনই মায়ার কাছে মনের কথা পাড়তে যাই, বাধা পাই তখনই। 'ও কথা এখন থাক।' শুনতে হয় খালি।

প্রেমের কথার আবার এখন তখন আছে নাকি? লোকেরা কি পাঁজি পুঁথি দেখে তারপর ভালবাসায় পড়ে? ভালোবাসার কথা পাড়ে?

অবশেষে একদিন সে আমায় বললে, 'পূজোয় আমরা নৈনিতাল যাচ্ছি তো। তুমিও এসো না কেন আমাদের সঙ্গে বেড়াতে? কলকাতায় কি আর মন খুলে কথা কওয়া যায়? যা ভীড়!'

কিছুতেই তাল পাই না। তবু যা হোক, শেষ পর্যন্ত পেলাম। নৈনিতাল পাওয়া গেল।

আমি অবশ্য বলেছিলাম, 'নৈনিতাল কেন? মনে যদি আমেজ আসে তাহলে কলকাতাকেই কাশ্মীর বানানো যায়। তুমি পাশে থাকলে সব জায়গাই আমার ভূস্বর্গ। তুমি বেহাতে গেলে সবই আমার ভেস্তে গেল। আমার বেহেস্ত বিসর্গ হয়ে গেল।'

'তাহলে কি তুমি বলছো যে দেরাদুনই ভাল হবে?' মায়া বলেছে। কাউকে যদি একটুখানি সাধা যায় অমনি তার ল্যাজ মোটা হয়ে দেড়া কি দুনো হয়ে ওঠে—দুনিয়ার হাওয়াই এই! একটু দক্ষিণে দিলেই পৃথিবী অমনি ফুলে ফুলে তার উত্তর দিতে থাকে!

মায়া ঝানসী বাহিনীর মেয়ে। যুবতী। এবং বেশ জোয়ান। কিন্তু দেহে শক্তি ধরলেই যে মনকেও শক্ত করতে হবে তার কোন মানে আছে? সুলভ নারী নাই বা হলো, কিন্তু নারীসুলভ যা কিছু তার কিছু কি তার থাকতে নেই? তাহলেও মেয়েলী কিছু ছিল বুঝি মায়ার। অন্তত কথা রাখার ব্যাপারে!

মেয়েদের কথার ধারা বলতে গেলে প্রায় ঠিক ছেলেদের মতই। বালি যাবো বলে বেরুলে ছেলেরা বালিগঞ্জে যায়। আর মেয়েরা বেলুড় যাবো বললে বোধ হয় দক্ষিণেশ্বরেই উড়তে বেরোয়। কিংবা আকাশপথে বেলুনেই চেপে বসে হয়তো বা।

অতএব, নৈনিতাল যেতে মায়ারা আলমোড়া গেল।

আর আমি? আমার কথা বলাই বাহুল্য! যেখানে মায়া, মায়াবাদীরা সেইখানেই। মায়াজড়িত না হয়ে তারা থাকতে পারে না।

মহামায়ার এমনই লীলা!

'এধার দিয়েই যাত্রীরা মানস সরোবরে যায়। এই আলমোড়া দিয়েই তাদের যাবার পথ, তা জান?' মায়া বলে আমায়।

আমি জানতাম না। ভূগোল আমার কাছে মায়ার মতই গোলমেলে, তার ম্যাপ আর আমার মনের ম্যাপে একেবারেই খাপ খায় না।

'তুমি মনের কথা কী বলবে বলেছিলে না? তাই এই মানস সরোবরের পথে নিয়ে এলাম তোমায়।' ও জানালো।

মনের কথা আমার মনেই থাকে, কেমন খটকা লাগে এটা—অ্যাঁ, মহাপ্রস্থানের পথেও কি নয় তাহলে? এই দিক দিয়েই একদিন যুধিষ্ঠির ভীম এট্‌সেট্‌রা মহাপ্রস্থানের পথে এগিয়েছিলেন না?

এট্‌সেট্‌রা মানে, পাণ্ডবদের সেটে ঠিক না হলেও, প্রবোধ সান্যাল প্রমুখ আমার কোন কোন বন্ধু এ পথেই একদা গেছিলেন শোনা যায়। তবে যদ্দূর জানি তাঁরা সশরীরে ফেরত এসেছেন।

কিন্তু তাঁরা এলেও আমি কি আর ফিরতে পারবো? আমাদের মতো নশ্বর জীবের মনের কথার শেষে, বিয়ে কিংবা ইলোপমেন্ট একটা কিছু ঘটবেই—আর উক্ত বিলোপের কথা ধরলে তা মহাপ্রস্থান ছাড়া কী আর? আর ধরুন যদি বা শেষটায় প্রত্যাখানই জোটে, সেও তো এক রকমের মহাপ্রস্থানই বলতে হয়। মানস সরোবরে না গিয়েও

মনের 'সরো' যদি বাড়ন্ত দেখি তাহলে কোনদিক দিয়েই কিছু প্রবোধ মেলে না। জীবনের কল্লোলে প্রেম না এলে প্রবোধ কোথায়?

মায়া বললো: 'কালকেই তুমি এসো আমাদের হোটেলে, কেমন? সকালেই এসো, বেড়াতে যাওয়া যাবে কাল। তৈরি হয়ে থাকবো আমি, বেরিয়ে পড়বো—তুমি এলেই।'

সকালে আমার হোটেলের জলখাবার খেয়েই বেরুলাম, গিয়ে দেখি মায়া তাদের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। সাদা উলের পুলওভার ওর গায়ে—বরফের মতই ধবধবে। শাড়ির বদলে পরেছে মিনি স্কার্ট। এমন মানিয়েছিল! আর ঐ অনাবৃত পা। আজানুলম্বিত অমন শ্রীচরণ! নিছক লেগ্‌সাম মেয়েও কিছু কম হ্যাণ্ডসাম হয় না, আমি ভেবে দেখলাম। এবং দেখে আরও ভাবলাম। সত্যি বলতে বিলিতি মেয়েদের মতই সুশ্রী—সুগঠিত—সুষমাময় ওর শ্রীপাদপদ্ম! দেখলে চোখ জুড়োয়—সাধ হয় সে বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যাক।

পেল্লায় এক কিট্‌ব্যাগ নিয়েছে সঙ্গে, তাই দেখে তাক লাগল আরো। সত্যিই কি মহাপ্রস্থানের পথে যাবার মতলব নাকি ওর? পায়ে ভারী ভারী বুট—আমি লক্ষ্য করলাম। 'কী আছে ওতে?' থলিটার দিকে তাকিয়ে আমি শুধাই।

'দড়ি।'

'দড়ি কেন গো?'

'গলায় দেবার জন্যে। কেন আবাব?'

'বিস্কুটের টিন, থার্মোফ্লাস্ক—এসবও দেখছি যেন?' আমি উঁকি মারি থলির ভেতর।

'স্যাণ্ডউইচও আছে। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।'

বেরিয়ে পড়া গেল। ওর হাতের বোঝা আমার হাতে নিতে চাইলাম। ঘাড় নাড়লো ও: 'আমার ভার তুমি কেন বইবে বলো তো? আমি কি অবলা নাকি? আমি কি সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব?'

একটু তো বেড়ানো, তার জন্যে অত বড়ো থলে কেন? অবাক লাগে। কিন্তু ঐ একটিই নাকি ছিল ওর। এটা ওটা টুকিটাকি— পথে ঘাটে চলতে ফিরতে কখন কিসের দরকার পড়ে। পা কেটে গেলেও তো আইডিন চাই। তার সবই নাকি রয়েছে ওর ভেতর। খাবার দাবারও।

খাবারের কথায় আমার ক্ষিদে পেয়ে যায়। আধঘন্টা হাঁটবার পর আমি বলি— 'এসো, একটু বসা যাক এখন। চেখে দেখি তোমার দু'একখানা স্যাণ্ডউইচ।'

'এখনি? এর মধ্যেই কাহিল হয়ে পড়লে?' মায়া খিল খিল করে ওঠে।

'আমার কথা বলছিনে, তোমার জন্যেই।' আমি বলি। 'অনেকটা তো হাঁটা হলো, এবার তোমারও একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার নয় কি?'

'বিশ্রাম?' কথাটা ও হেসেই উড়িয়ে দেয়—'সারাদিন আমি হাঁটতে পারি এমনি, ঘুরে ঘুরে বেড়াতে অ্যাতো ভালো লাগে আমার।'

আমিও হাসি কথাটায়। কথাটা যেন ভয়ঙ্কর হাসির এবং আরো ঘন্টা দুই আমরা হাঁটি! তারপর—

তারপর ঘণ্টা দুয়েক হাঁটবার পর— মায়া ফিরে তাকায়। পিছন ফিরে তাকায় আমার দিকে। বলা বাহুল্য, আমি ঢের পিছিয়ে পড়েছিলাম তখন। —'এইবার একটু রেস্ট নেওয়া যেতে পারে, কী বলো?' হেঁকে বলল মায়া, 'কিছু খেয়ে নেওয়া যাক, কেমন?'

শোনবামাত্র আর আমি এগোই না। যেখানে ছিলাম, ল্যাং বোটের ভূমিকা ত্যাগ করে বসে পড়ি সেইখানেই। একা রামে রক্ষে নেই! রেস্ট এবং রেস্তোরাঁ—একসঙ্গে। রামের উপরে আরাম? তারপরে আর কোন্ হতভাগা এগোয়?

মায়াকেই পিছিয়ে আসতে হয়। হাসতে হাসতে সে আসে। এসে বসে আমার পাশে। খোলে তার থলে। বার করে তার পাঁউরুটি, স্যাণ্ডউইচ, কেক্, টফি, চক্লেট, স্যালাড আর পুডিং। থার্মোফ্লাস্ক—তার ভেতরে তপ্ত কফি।

জুতো খুলে পায়ে হাওয়া লাগাই। ফোস্কা পড়ে গেছল গোড়ালিতে, পা ছড়িয়ে হাত বাড়াই স্যাণ্ডউইচের দিকে।

যদিও পায়ের দরদ কম নয় তবু এতক্ষণ বাদে মায়াকে পাশে পেয়ে মনের ব্যথা জুড়োয়। তাকাই ওর মুখের দিকে। হাঁটার শ্রমে এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে! শুরু করব নাকি আমার মনের কথাটা? সেযুগের উপন্যাস প্রকৃতি-বর্ণনা দিয়ে আরম্ভ হত, আমি সেইভাবেই শুরু করি। আর, সত্যি বলতে, প্রেম যতই আধুনিক হোক না, এখনো সেই রূপকথার যুগেই রয়ে গেছে। চারিধারের দৃশ্য সৌন্দর্যের সুচারু বিবরণ দিয়ে শেষ ওর রূপ বর্ণনায় এলাম—এলোমেলো চুলগুলো আস্তে আস্তে ওর মুখের থেকে সরিয়ে নরম হাতটা নিলাম মুঠোয়—আর গরম কফির সঙ্গে ওর হাতেও একটা চুমুক দিয়ে—'মায়া, তোমার মত এমন অপরূপ মেয়ে আমি আর দেখিনি—'

শুরু করেছি মাত্র—প্রেমের কথা চিরকালই রূপকথা। উপকথাও। বর্ণে বর্ণে যদি বা মেলে অক্ষরে অক্ষরে মেলে না।

নিজের থলি গুটিয়ে মায়া উঠে দাঁড়ায়—'নাও, জুতো পরে নাও, চলো।'

'এক্ষুনি? এত শীগগির?' কথার মাঝখানে অন্য কথায় আমি বিচলিত হই। আমার ক্ষুণ্ণ কণ্ঠ শোনা যায়। কিন্তু শুনছে কে!

'এই একটুখানি হেঁটেই ঠেকে গেলে? একেবারেই বসে পড়লে? ভারী কুঁড়ে তো তুমি? এখন কি বসে বসে নষ্ট করার সময়?'

'মায়া, ভালবাসার মানে কি সময় বাজে নষ্ট করা?' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আমি বলতে যাই, কিন্তু মায়া ততক্ষণে বিশ গজ এগিয়ে গেছে। ঘাড় ফিরিয়ে সে বললে— 'ঐ যে ছোট্ট পাহাড়টা দেখছ, চলো আগে ওর চূড়ায় উঠিগে। তারপরে—তারপর সেখানে বসে বসে তোমার সব কথা শোনা যাবে। আমাদের ভালবাসার আলোচনা করা যাবে তখন। রোমান্সের চূড়ান্ত করা যাবে নাহয়।'

মায়া আর দাঁড়ায় না। নিজেকে বাড়ায়। আমি খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলি—ওর পিছনে পিছনে।

পাহাড় সম্বন্ধে এযাবত আমার ধারণা ছিল, দেখা গেল তা অমূলক। চোখে দেখে তাদের যেমনটা ভাবা যায়—আসলে তারা তা নয়। যতই এগোও মরীচিকার মত, মায়ার

মতই, আরো যেন এগিয়ে যাচ্ছে। পিছিয়ে যাচ্ছে আরো। আর যতটা ছোট-খাটো ভাবো তাও নয়। ম্যাপের পাহাড় দেখে পাহাড়ের পরিমাপ করা যায় না। পর্বত সম্বন্ধে হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞান না থাকা নিতান্ত শোচনীয়। দারুণ পরিতাপের। পায়ের হাড় আস্ত নিয়ে পাহাড়ে যাওয়া, বা সেখান থেকে ফেরত আসা, আর যার হোক, আমার পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার।

ঝাড়া আড়াই ঘণ্টা হাঁটার পর সেই পাহাড়ের তলায় আমরা পৌঁছলাম। মায়া থামল। পাহাড়তলি পার হয়ে। আর নামাল তার হাতের কিটব্যাগ।

স্যাণ্ডউইচের আশায় আমি একটু উল্লসিত হয়েছি, কিন্তু না, ভ্রম। রজ্জুতে সর্পভ্রম। ব্যাগের ভেতর থেকে বার করল একগাছা মোটা দড়া। সাপ না, রজ্জুই—আমি চোখ রোগড়ে দেখলাম ভাল করে। আমার বিস্ময় নিঃশেষ হবার আগেই সে দড়ার একটা দিক আমার কোমরের সঙ্গে বাঁধল—বেশ কড়া করে—অন্যধারটা জড়াল তার নিজের কটিতে। তারপর সে তাকালো পাহাড়ের দিকে।

আমিও তাকালাম। কিন্তু তাকিয়ে তার কূল-কিনারা কী পাব? পাহাড়কে কোন কালেই চেনা যায় না, চিনতে গেলে চিহ্ন থাকে না পরিচয়প্রার্থীর। সামনেই রয়েছে পঞ্চপাণ্ডব এট্‌সেটরার, সঙ্গী কুকুরটিকে ধরে, সমুজ্জ্বল ছটি দৃষ্টান্ত! সেই উদাহরণের ছটা সামনে রেখে আর এই পাহাড়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমার বুক গুড়-গুড় করে। হাত পা কাঁপে।

'আমি বার তিনেক দড়ি ধরে নাড়া দেব—টান পেলেই তারপর তুমি আমায় ফলো করবে, কেমন?' মায়া পাহাড়ের গায়ে পা রাখে। সামনের এই খাড়াই আর কোমরের এই দড়া—আমার এমন খারাপ লাগে! ঝুঁকি নেব কিনা ভাবছি, ইতিমধ্যে তিনটি ঝাঁকি পাই! তারপরে ভাল করে টের পেতে না পেতেই, মুটেরা যেমন করে ঝাঁকা তোলে ঠিক তেমনি করেই মায়া, আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেই অসহায় আমায় টেনে নেয় এক হ্যাঁচকায়—আমি তার উচ্চাটনে একেবারে চড়াইয়ের কিনারায় গিয়ে পড়ি।

পাথরের খোঁচ-খাঁচ সামলে খাড়াইয়ের গা বেয়ে উঠবার চেষ্টা করি—পারা যায় না। পা-ই রাখা দায়, দাঁড়ানোই মুস্কিল। খাড়া হবার জায়গা নেই কোথাও, পারব কি?

প্রেম নিপাতনে সিদ্ধ, জানি। কিন্তু এতটা যে, তা আমার জানা ছিল না। তবে প্রেম আবার তদ্ধিত-প্রকরণেও!....

আমার পদস্খলন হয়—পদে পদে। হবেই, জানা কথা। মেয়েরা চিরদিনই পদস্খলনের হেতু। পা হড়কে যায় আমার— বারংবার, কিন্তু পড়িনে আমি। ঝুলতে থাকি ত্রিশূন্যে। কোমরের শক্ত দড়া আমাকে টানতে থাকে ওপরে। আমার পড়া হয় না, পড়ি পড়ি করেও উপনীত হই—উঠতে থাকি ঊর্ধ্বে। মিস্ কোটেশনের মতই সমুধৃত হতে থাকি।

সাতটা খাড়া পাথরের চাঙড় পার হই পরম্পরায়। ওই করেই। সাত-সাতবার আমি পড়ো পড়ো হই। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, অন্ধকার দেখি, কান ভোঁ ভোঁ করে। সাতবারই প্রাণপণে সেই সেই পেল্লায় চাঙড় বেয়ে উঠতে যাই, উঠতে চাই, আর আমার হাত পা ফসকায়। সাত সাতবার ঝোলুল্যমান আমি —আমার নিজ ভারে পাহাড়ের তলায় পড়ে ছাতু হয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হই। সশরীরে মর্ত্যভূমে অবতীর্ণ হবার অপেক্ষায়

থাকি। আর মায়া আমায় ছেঁচড়ে তোলে। আমার অবতারণা আর হয় না। জামা-কাপড় ছিঁড়ে যায়, সারা গা ছড়ে যায়, কোথায় যে যাই জানি না!

এমনি করে মায়ার দুর্নিবার আকর্ষণে আমি উঠি। এই ঝাড়া দশস্টোন বারো পাউণ্ডকে খাড়া অতগুলি স্টোনের ওপর দিয়ে সে কী করে যে টেনে তোলে—একলা, কারো সাহায্য না নিয়েই—সে-ই এক রহস্য। কোন কৌশলে এই অসাধ্য সাধন করে, ভেবে পাই না।

পরিশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত উৎপাটিত আমি ছিন্নভিন্ন হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উত্তীর্ণ হই। পর্যবসিত হই— চূড়ান্তে গিয়ে। মায়া আমার পিঠ চাপড়ে সাধুবাদ দেয়—'বাঃ বেশ শক্ত ছেলে! বাহাদুর বলতে হয় তোমায়। সাবাস!'

আবার আমি পা ছড়াই। আবার ওর পুঁজিপাটা ছড়িয়ে পড়ে। পুঞ্জীভূত স্যাণ্ডউইচ ইত্যাদিরা বেরোয়। ওর মুখে কথা ফোটে ফের —'হ্যাঁ, কী বলছিলে না তুমি? মনের কথা কী বলছিলে যে তখন? ভালবাসার কথা কী যেন কইতে চাইছিলে?'

আমি কিছু বলি না; যা বলে আমার ফুসফুসরাই বলে। ফিসফিস করে নয়— হাঁস ফাস করেই। ঘন ঘন আমার নিঃশ্বাস পড়ে! দীর্ঘনিঃশ্বাস নয়।

'শোনাও তোমার মনের কথা বন্ধু' মায়ার অনুরোধ শুনি। ঠাট্টার সুর নয়, মনের ছন্দই বাজে বুঝি ওর আওয়াজে, কিন্তু আমি —শ্রীমান অমুক চন্দ্র তমুক—এই এত কথার চুপড়ি—তখন একেবারে মূক। বেবাক চুপ।

কইতে চেষ্টা করিনি যে তা নয়, কিন্তু কথাটা আমার গোঙানির মত শোনাতেই চেপে গেছি। অবশেষে ও ছোট্ট একটু নিঃশ্বাস ফেলে বলে—'চলো এবার তাহলে ওঠা যাক। ফেরা যাক তাহলে।'

কথার তুবড়ি— আমার পেটে ডুব মারলেও একটা কথার খই ফোটে না তখন। থই মেলে না মনের। বোবা মেরে গেছি বিলকুল। কী বলব? মনের 'সরো' আমার বড় হয়ে উঠেছে তখন। আমার মন থই থই করছে মনের দুঃখে। টলটল করছে মানস সরোবরের অথই জল। মন আমার টইটম্বুর।

আর মানস সরোবরে যাবার পথ এই ধার দিয়েই ছিল না? হোটেলে ফিরে আমাদের ম্যানেজারকে বলে দিই, আমার খাবার দাবার শোবার ঘরে পাঠাতে—যতোদিন না আমি খেতে নামছি নীচেয়। আর বলে দিই কেউ যেন আমায় বিরক্ত না করে। কেউ আমার খোঁজে এলে, দিন সাতেকের তরে আমি বাইরে গেছি তাকে যেন জানিয়ে দেয়া হয়, ব্যাস্!

সাতদিন পরে আমি বিছানা ছাড়ি।

ম্যানেজার এসে জানান, একটি মেয়ে এই ক'দিন ধরেই রোজ নাকি আমার খোঁজ করেছে। বলে গেছে, আমি এখানে ফিরলেই যেন তাকে খবর দেওয়া হয়। কোন পাহাড়ে কোথায় যেন কী আউটিংয়ে যাওয়া ঠিক করা রয়েছে, মায়া মিত্র, না কী যেন মেয়েটার নাম।

মায়ার মিত্রতায় আর কাজ নেই বাবা, কী হবে এই মায়া বাড়িয়ে? বৃথাই মায়াবদ্ধ হওয়া। প্রাণের মায়া রাখলে প্রাণের মায়াকে রাখা যায় না—মনে মনে আমি বলি। বলি আর আমার আড়ামোড়া ভাঙি। আর, সেইদিনই ভাগি—আলমোড়ার থেকে।

পাহাড়ে মেয়ে আর পাহাড়ের মায়া—একচোটে কাটাই।